থিসিস
গবেষণা পদ্ধতি

পি. এইচ. ডি. করার কলাকৌশল

ড. মো. ফখরুল ইসলাম
মোহাম্মদ ইপ্তেখার রাসুল
নাসরিন সুলতানা
সম্পা দাস

Scientist ESHAD

Gono Bishwabidyalay Library
Accession No. ২৬৯৫০
Class No ৩৭৮.২৪২/ইশি
Price ২২৮/=
Date ২০/০৬/২০১৭

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৭

প্রকাশক
মুহাম্মদ আলমগীর রহমান
কালিকলম প্রকাশনা সংস্থা
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
মাতৃভূমি প্রকাশনী

অক্ষর বিন্যাস
কালিকলম কম্পিউটার সিস্টেম

স্বত্ব
লেখক

মুদ্রণ
জনপ্রিয় প্রিন্টিং প্রেস

প্রচ্ছদ
হাবিব খান

আমেরিকা পরিবেশক
মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
মূল্য : ৩৫০ টাকা

Scientist ESHAD

Thisis Gobesona Poddhoti by 3 Writers, Published by Kalikolom Prokashana Songstta, 11/1 Islami Tower (2nd floor) Banglabazar, Dhaka-1100. Price : 350 Taka
ISBN : 978-984-9211-7-7

ঘরে বসে কালিকলম প্রকাশনা এর সকল বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/kalikolom
www. kalikolom.com. e-mail : kalikolomprokashona@gmail.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : গবেষণা ৭
দ্বিতীয় অধ্যায় : পিএইচ. ডি. ২৬
তৃতীয় অধ্যায় : গবেষণা ৬১
চতুর্থ অধ্যায় : গবেষণা পরিচিতি ৬৬
পঞ্চম অধ্যায় : সামাজিক গবেষণা ৯৩
ষষ্ঠ অধ্যায় : উদ্ধৃতির ব্যবহার ১০৭
সপ্তম অধ্যায় : সামাজিক গবেষণা ১১৫
অষ্টম অধ্যায় : বর্ণনামূলক অনুসন্ধান ১৪৫
নবম অধ্যায় : সামাজিক জরিপ ১৪৭
দশম অধ্যায় : সামাজিক গবেষণার পর্যায় ১৫১
একাদশ অধ্যায় : গবেষণার বিষয় চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণ ১৫৩
দ্বাদশ অধ্যায় : প্রাসঙ্গিক বই-পত্রের পর্যালোচনা ১৫৬
ত্রয়োদশ অধ্যায় : গবেষণা নক্‌শা ১৬১
চতুর্দশ অধ্যায় : গবেষণা প্রতিবেদন ১৭০
পঞ্চদশ অধ্যায় : নমুনায়ন ১৮০
ষোড়ষ অধ্যায় : পরিমাপ পদ্ধতি ১৮৯
সপ্তদশ অধ্যায় : সামাজিক গবেষণায় গ্রন্থাগারের ব্যবহার ১৯৬
অষ্টাদশ অধ্যায় : থিসিস গবেষণা নিবন্ধে ব্যবহৃত ২০০
পরিশিষ্ট-১ : প্রুফ দেখার নিয়ম ও পদ্ধতি ২০৩
তথ্যসূত্র : ২০৫

থিসিস

গবেষণা পদ্ধতি

[পিএইচ ডি. করার কলাকৌশল]

দ্বিতীয় পাঠ

ড. মো. ফখরুল ইসলাম
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ ইপ্তেখার রাসুল
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
সৈয়দ ফজলুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
পাথরঘাটা, বরগুনা

নাসরিন সুলতানা
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা

শম্পা দাস
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
লালমাটিয়া কলেজ

Library
Gono Bishwabidyalay Library
Nolam, Savar, Dhaka-1344.

কালিকলম প্রকাশনা সংস্থা

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা

RESEARCH

গবেষণা কী এবং কেন?

বর্তমান বিশ্বে, এমনকি আমাদের সমাজেও গবেষণা একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। 'গবেষণা' এর আর একটি বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'অনুসন্ধান' কে গ্রহণ করা যায়। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Investigation। ইংরেজিতে গবেষণাকে research, Investigation বা study বলা হয়। তবে বাংলায় অনুসন্ধানের চেয়ে গবেষণা শব্দটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা গবেষণা শব্দটি অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, গবেষণা বলতে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেই বুঝায় না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অন্যান্য ধরনের গবেষণার মধ্যে অবশ্যই সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন, আমরা জানি বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা এক রকম নয়। আবার জীব বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণার রয়েছে প্রচুর পার্থক্য। এছাড়া সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা এবং আচরণ বিজ্ঞানের গবেষণার মধ্যেও রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তবে, এসব পার্থক্য মূলত গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের ধরন ও বৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। এভাবে দেখা যায় যে, গবেষণা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। বিষয় ও কলাকৌশলের পার্থক্যের জন্য এদের মধ্যে পার্থক্য থাকে।

এখানে লক্ষণীয় যে, গবেষণা কথাটির সাথে কতগুলো শব্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। এগুলো হলো কী, কেন এবং কিভাবে (what, why & how)। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার সময় থেকেই এসব শব্দকে দার্শনিকরা গবেষণার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করে আসছিলেন। প্রাচীন সভ্যতায় বেশির ভাগ গ্রিক দার্শনিক চিন্তা করতেন 'কেন' (why) শব্দটি নিয়ে। সে সময় তারা গবেষণা করতেন মূলত চিন্তানির্ভর, যুক্তিনির্ভর ও অভিজ্ঞতা নির্ভর (thinking based, rational based & experience based)। কিন্তু স্মর্তব্য যে, এগুলোকে বর্তমান কালের প্রচলিত পদ্ধতিগত অনুসন্ধান (systematic Investigation) বলা যায় না।

গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের প্রশ্ন ছিল, 'আগুনের ধোঁয়া কেন উপরে ওঠে, কেন তা নিচে বা পার্শ্বে যায় না'? তার এই প্রশ্নটি ছিল 'কেন' (why)র মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি

চিন্তা করলেন, যুক্তি দিলেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে বললেন যে, "প্রকৃতিগতভাবেই ধোঁয়ার স্থান আকশে, তাই সে আকাশে চলে যায়।" এরিস্টটলের এই 'কেন ঘটে' প্রশ্নটি দার্শনিকদের কাছে তৎকালীন সময়ে অধিক জনপ্রিয় ছিল। এবং এই 'কেন' প্রশ্নকে ঘিরেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞান চর্চা করা হতো। কিন্তু এর কয়েক'শ বছর পর যখন ইউরোপে রেনেসাঁস চলছিল, এরই মাঝে শুরু হয় আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ। এ পর্যায়ে দর্শনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে বিজ্ঞান। দর্শন থেকে বিকাশ ঘটে বিজ্ঞানের। মূলত পদ্ধতিগত কারণেই বিজ্ঞান আলাদা হয় দর্শন থেকে। এ সময় বিজ্ঞানীরা এ 'কেন ঘটে' প্রশ্নটির প্রতি অনেকাংশে আগ্রহ হারালেন। তাঁরা বললেন যে, কোনো ঘটনা কেন ঘটে তা অনুসন্ধান না করে বরং 'কিভাবে ঘটে' (how come) অনুসন্ধান করাই বেশি কার্যকরী। বিজ্ঞানীদের মতে, প্রকৃতিতে কোনো ঘটনা কেন ঘটে তা জানতে চাওয়ার মধ্যে এক ধরনের ভাব ও অনুমানের আশ্রয় নেয়া হয়। এর মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ (Objective) ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা বললেন যে, ধোঁয়া আকাশে কেন যায়, তা জানতে চাওয়ার চেয়ে কিভাবে (how) যায়, তাই জানা অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, সাধারণত বাতাসের চেয়ে ধোঁয়া হালকা। অর্থাৎ ধোঁয়ার চেয়ে বাতাস বেশি ভারি। তাই তা নিচে যায়। এক্ষেত্রে এসব ঘটনা কেন ঘটে তা জানতে চাওয়ার কোনো দরকারই নেই। এভাবে দেখা যায় যে, গবেষণা বিভিন্ন প্রশ্ন থেকে উদ্ভব হতে পারে। তবে গবেষণার জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এসব পদক্ষেপ অনুসরণ করে পদ্ধতিগত গবেষণা চালান হয়ে থাকে। পদক্ষেপগুলো হলো–

প্রথমত, সমস্যা থেকে উদ্ভূত প্রশ্ন সংগ্রহ করা,

দ্বিতীয়ত, সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্বুদ্ধ হওয়া,

তৃতীয়ত, সমস্যা সমাধানের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা,

চতুর্থত, সমস্যা সমাধানের কৌশল নির্ধারণ করা,

পঞ্চমত, কৌশল ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

অতএব গবেষণা যে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া তা বলাই বাহুল্য। যাই হোক, সহজে বোঝার জন্য গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল সংজ্ঞা প্রদান করা দরকার। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত গবেষক ক্যাজার, কুক এবং ক্রগ (Katzer, Cook & Crough; 2000) বলেছেন যে, "I define research here as the systematic process of collecting and analysing information (data) in order to increase our understanding of the phenomenon with which we are concerned or interested"। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, "গবেষণা হচ্ছে একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের আগ্রহ অনুযায়ী জ্ঞান লাভের জন্য

তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারি।" সংজ্ঞাটিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হলে উপরে বর্ণিত গবেষণার পদক্ষেপগুলোর সাথে সুন্দরভাবে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে উপরে উল্লিখিত গবেষকগণ গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখার কথা বলেছেন। তাদের মতে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে আলাদা আলাদাভাবে গবেষণা বলা যায় না।

১। কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহকে গবেষণা বলা যায় না।

২। গবেষণা বলতে কেবল তথ্যের আদান-প্রদান বা স্থানান্তরকেই বুঝায় না।

৩। কেবলমাত্র তথ্যের বিশ্লেষণকে গবেষণা বলা যায় না।

৪। কোনো কর্মকাণ্ডের প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণের বিষয়টিকেও গবেষণা বলা যায় না।

গবেষণা সম্পর্কে ভালো করে বুঝতে হলে আমাদের আর একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। তা হলো গবেষণা কত রকমের হতে পারে বা গবেষণা কত প্রকার। বহুকাল আগে থেকেই গবেষণার একটি জনপ্রিয় প্রকারভেদ চলে আসছে। অনেক লেখক এই ধরনের শ্রেণিকরণের পক্ষে। যদিও গবেষণার প্রকারভেদকে বিভিন্নভাবে দেখান যায়। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে গবেষণাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা--

(ক) মৌলিক গবেষণা (Fundamental Research): সাধারণত কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার (natural phenomena) উপর যখন গবেষণা পরিচালনা করে সাধারণ সূত্র স্থাপন করা হয় তখন তাকে বলে মৌলিক গবেষণা। এ ধরনের গবেষণা মূলত পরীক্ষণনির্ভর ও গণিতনির্ভর হয়ে থাকে। অন্য কথায় বলা যায় যে, পরীক্ষালব্ধ ফলাফলকে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা হয়। কেননা গণিতকে বলা হয় গবেষণা ও বিজ্ঞানের ভাষা। যেমন আইনস্টাইন-এর বিখ্যাত সূত্র $E=mc^2$ একটি মৌলিক গবেষণারই গাণিতিক প্রকাশ।

(খ) প্রায়োগিক গবেষণা (Applied Research): যখন গবেষণালব্ধ ফলাফল সরাসরি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তখন সেই গবেষণাকে বলে প্রায়োগিক গবেষণা। এক্ষেত্রে গবেষণার উদ্দেশ্যই থাকে প্রয়োগমূলক। যেমন ধরা যাক হাইব্রিড ধান। এসব ধানের বীজ গবেষণাগারে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উদ্ভাবন করা হচ্ছে, যা সরাসরি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো হচ্ছে। অর্থাৎ গবেষণালব্ধ ফলাফলকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে এর মধ্যেও এক ধরনের মৌলিকত্ব থাকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন সময় গবেষণাকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণের চেষ্টা করেছেন। যার একটি সহজ উদাহরণ উপরে আলোচিত হলো। গবেষণা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য গবেষণার আরও একটি শ্রেণিবিন্যাস নিম্নে দেয়া হলো-

১। ব্যাখ্যা গবেষণা (Explanatory Research): এই ধরনের গবেষণা যে কোনো বিষয় থেকে আসতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়ে একটি গবেষণা শুরু হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে পদ্ধতি (method) ও যন্ত্রপাতি (tools)-এর ব্যবহার কম থাকে। আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এ ধরনের গবেষণার মূল বিষয়। এ ধরনের গবেষণায় অনেক ক্ষেত্রেই সুন্দরভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সূত্রায়ন করা সম্ভব হয় না। তবে এর মাধ্যমে সার্বিক বিষয়টি সম্পর্কে বোঝা যায়।

২। (ক) পদ্ধতিমূলক গবেষণা (Testing-our Tesearch): কোনো একটি গবেষণা যখন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে না পারে তখন সেটির উপর পুনরায় গবেষণা করতে হয়। এটি হচ্ছে পদ্ধতিমূলক গবেষণা। এই গবেষণায় ব্যাপক অর্থে গবেষণা পদ্ধতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত বৈজ্ঞানিক গবেষণাই এ ধরনের গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের গবেষণালব্ধ তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরশীলতা (validity & reliability) বেশি থাকে। তাই ইহার গ্রহণযোগ্যতাও বেশি।

(ক) সমস্যা সমাধানমূলক গবেষণা (Problem-solving): সাধারণত প্রায়োগিক ক্ষেত্রের গবেষণা এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্যই এ ধরনের গবেষণার উদ্যোগ নেয়া হয়। এক্ষেত্রে সঠিকভাবে সমস্যা সংজ্ঞায়িত করার পর গবেষণার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।

গবেষণার শ্রেণিকরণের জন্য আর এক ধরনের শ্রেণিকরণ দেখান যেতে পারে। এ ধরনের শ্রেণিকরণ মূলত গবেষণার বিষয়গুলোর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক কয়েক ধরনের গবেষণা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

* মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণা (Basic Science Research)
* সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা (Social Science Research)
* জীব বিজ্ঞান গবেষণা (Biological Science Research)
* প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গবেষণা (Natural Science Research)
* আচরণ বিজ্ঞান গবেষণা (Behavioural Science Research)
* সাহিত্য গবেষণা (Literature Research)
* প্রায়োগিক গবেষণা (Applied Research)
* প্রযুক্তিগত গবেষণা (Technological Research)

গবেষণা নীতি

Research Ethics

গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণার নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণা পরিচালনা করার সময় এসব নীতিমালা মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি কাজ। যেকোনো ধরনের গবেষণা

পরিচালনা করার পর এর ভিত্তিতে যেকোনো ধরনের প্রবন্ধই হোক না কেন ইহাকে কোনো জার্নালে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এর মৌলিকতা (Originality) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ কোনো প্রবন্ধ যদি অন্য প্রবন্ধের অনুকরণে করা হয়, অথবা যদি অন্য প্রবন্ধের নকল করা হয় তা অবশ্যই কোনো মানসম্মত জার্নালে প্রকাশ করা যাবে না। এটা যেমন বেআইনি (Illigal) তেমনি অনৈতিকও (Unethical) বটে। এক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে যে, গবেষণা প্রবন্ধটির লেখক বা প্রবন্ধকার যারা, তারা অবশ্যই দাবি করবেন যে, এই প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য তাদের একান্তই ব্যক্তিগত। অন্য কোনো উৎস থেকে তারা এর কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ নকল বা হুবহু অনুকরণ করেননি। অথবা করলেও এ জন্য তারা লিখিত অনুমতি গ্রহণ করেছেন। এজন্য তাদের 'কপিরাইট' অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। অতএব যখন এক বা একাধিক প্রবন্ধকার কোনো একটি গবেষণা প্রবন্ধ বা কোনো পুস্তক রচনার কাজে হাত দিবেন তখন বিভিন্ন প্রস্তুতির পাশাপাশি তাদেরকে কতগুলো নৈতিক মানদণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রকাশনার কাজ করতে হবে। গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে প্রচলিত এসব মানদণ্ডগুলোকে বলে 'প্রকাশনার নৈতিক মানদণ্ড' বা Ethical standards of publication। ভালো প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অনেক।

একটি মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবন্ধ কেবলমাত্র একবারই একটি মৌলিক গবেষণা জার্নালে প্রকাশ পেতে পারে। এটাই হচ্ছে প্রবন্ধ প্রকাশের একটি অন্যতম নৈতিক মানদণ্ড। তবে, এক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে, কোনো একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মৌলিকতা নিশ্চিত করা মোটেই সহজ কাজ নয়। কোনো প্রবন্ধ একবার কোনো জর্নালে প্রকাশ পাওয়ার পর একে কোনো বিশেষ দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বা কোনো বিশেষ ভাষার নিজস্বতা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। এছাড়া কোনো এক দেশের জার্নালে প্রকাশ পাবার পর পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের জার্নালে একে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করা যাবে না। আবার ভাষার ক্ষেত্রেও তাই। ধরা যাক, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকে উহার ধারণাগুলো অক্ষত রেখে অন্য কোনো ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এটা করা সম্পূর্ণভাবে নীতিবিরুদ্ধ বা বলা যায় প্রথাবিরোধী কাজ। অনেক বিখ্যাত জার্নালে সেকারণেই লেখকদের জন্য দেয়া নির্দেশাবলিতে এ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে সতর্কমূলক আলোকপাত করা থাকে। উদাহরণস্বরূপ এ প্রসঙ্গে ব্রিটেনের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠা The Royal Society-এর নির্দেশাবলি এরূপ--

"Subsission of a paper (other than a review) to a Journal normally implies that it presents the results of original research or some new ideas not previously published, that it is not under consideration for publication elsewhere in the same form, either in English or any other language, without the concent of the editors.

এভাবে দেখা যায় যে, একবার প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধের মূল ধারণা বা ধারণাসমূহ অথবা এর কোনো বিশেষ তালিকা, গ্রাফ, চিত্র ইত্যাদিকে পরবর্তীতে আবার প্রকাশ করা যায় না। তবে এগুলোকে তথ্যসূত্র (reference) হিসেবে ব্যবহার করা যায় মাত্র। যদি কেউ পূর্বে প্রকাশিত কোনো উপাত্তকে ব্যবহার করতেই চান তাহলে তিনি অবশ্যই জার্নাল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য প্রথা অনুযায়ী আবেদন জানাবেন। এই আবেদনের ভিত্তিতেই যদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমতি প্রদান করে, তাহলেই কেবল এসব অংশ বা অংশবিশেষ প্রকাশ করা যাবে। অবশ্য এটা নির্ভর করবে পরবর্তী জার্নাল কর্তৃপক্ষের বিবেচনার উপর। কোনো একটি প্রাকাশিত প্রবন্ধের কোনো অংশটি অনুমতি পাওয়া গেলেও তা পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে অন্য একটি জার্নাল অনুমতি নাও দিতে পারে। এটা সম্পূর্ণভাবে জার্নাল কর্তৃপক্ষের (board of editors) নিজস্ব ক্ষমতার আওতাভুক্ত। এক্ষেত্রে তারাও তাদের জার্নালের নিজ নিজ নৈতিক ও আইনগত নীতিমালা মেনে চলেন। এটি প্রথা।

তবে একথা ঠিক যে, নৈতিক মানদণ্ড কিভাবে লঙ্ঘিত হয় তা লিখে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না। এজন্য দরকার দুটি প্রবন্ধের মধ্যে তুলনা করা। যা অনেকাংশেই নির্ভর করছে রিভিউয়ারদের ব্যক্তিগত পছন্দের উপর। কোনো কোনো প্রবন্ধ খুব সহজেই বুঝা যায় যে, এটা অন্য একটি প্রবন্ধের নকল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রবন্ধটি অন্য প্রবন্ধের নকল বা অনুকরণ কিনা তা বুঝে ওঠা সহজ হয় না। অবশ্যই এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই লেখক ও প্রকাশককে এদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, নৈতিকতার উপরোক্ত বিষয়টি এক পাক্ষিক নয়। প্রবন্ধকার একাই যে নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলবেন তা নয়। জার্নাল কর্তৃপক্ষকেও নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হয়। কোনো একটি প্রবন্ধ কোনো বিশেষ জার্নালের জন্য প্রকাশযোগ্য কিনা তা বিবেচনা করার সময় সম্পাদকদেরও নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হয়। তাদের এ নৈতিক মানদণ্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কোনো একটি প্রবন্ধকে অবশ্যই বিষয়গত দিক দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। কর্তৃপক্ষ প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য গ্রহণ করার সময় অবশ্য যে দিকগুলোকে আদৌ বিবেচনায় আনবে না তা হলো প্রবন্ধকারের একান্ত ব্যক্তিগত, ধর্মীয় এবং জাতিগত পরিচয়। প্রবন্ধ প্রকাশে যেন এগুলো কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও দাখিলকৃত প্রবন্ধে এসবের কোনো সরাসরি উল্লেখ থাকে না। অর্থাৎ প্রবন্ধ প্রকাশের বিষয়টি এখানে বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে।

প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ কাজ হলো আইনগত ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে কপিরাইট নিশ্চিত করা। এটা নৈতিকতার দিকটিকে আইনের দিক দিয়ে সুনিশ্চিত করে। কোনো প্রবন্ধ কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশের জন্য গৃহীত হলে, এর পরপরই কপিরাইট নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাবিত ফরম পূরণ করে অনুমতিসহ

স্বাক্ষর প্রদান করে জার্নাল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হয়। এটাই হচ্ছে কপিরাইট সংরক্ষণের প্রচলিত নিয়ম। এভাবেই জার্নালের প্রকাশক বা সম্পাদক প্রকাশনার ক্ষেত্রে আইনগত ক্ষমতা সংরক্ষণের অধিকার লাভ করেন। সুতরাং লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনো অংশই আর প্রকাশ করা যায় না। অবশ্য এই অধিকার লেখক নিজেও অনেকাংশে সংরক্ষণ করেন। “International Copyright Act 1909” অনুযায়ী লিখিত হলফনামার মাধ্যমে প্রবন্ধের লেখকের এই অধিকার চলে যায় প্রকাশকের কাছে। পরবর্তীতে অবশ্য এই আইনটি সংশোধন করা হয় ১৯৭৬ সালে, যা কার্যকরী হয় ১৯৭৮ সালের শুরুতে। এতে বলা হয়েছে যে, প্রকাশক অবশ্যই নির্দিষ্ট ফর্মেটে প্রবন্ধকারের কাছ থেকে “Copyright Transfer Agreement” স্বাক্ষর করে নিবেন। আর সে কারণেই জার্নাল কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী একটি ফর্মেট তৈরি করবেন।

বর্তমানকালে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত এই কপিরাইট সংক্ষণ প্রক্রিয়া আরও সহজ করার জন্য “Copyright Clearance Center” প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি সকল আন্তর্জাতিক জার্নালগুলোর (International Journals) প্রতিনিধিত্ব করে। এদের হাতে থেকে আরেক দফা কপিরাইট (Second step copyright), যা তারা সদস্য জার্নালের কাছ থেকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন। সুতরাং যদি কারো কোনো জার্নালের অংশবিশেষ তার নিজস্ব প্রকাশনার জন্য প্রয়োজন হয়, তাহলে তাকে উক্ত বিশেষ জার্নালের কাছে না গেলেও চলবে। এক্ষেত্রে তারা ঐ প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে বা অন্য কোনোভাবে প্রবন্ধের অংশবিশেষ প্রকাশের অধিকার লাভ করতে পারে। তবে এখানে এই কপিরাইট-এর বিষয়টি কিছুটা শিথিল করা হয়েছে বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য। যারা Ph. D., M. S. বা অন্যান্য শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে কাজ করছে তাদের জন্য এই আইনের শৈথিল্য বর্তমান। অর্থাৎ তারা এ তথ্যগুলো শিথিল নিয়মের আওতায় সহজেই তাদের গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে প্রকাশ করা পুস্তক বা অনুরূপ যেকোনো ক্ষেত্রে এই আইনের কড়াকড়ি আছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি হলো-

* প্রবন্ধ প্রকাশের নীতি (Ethics of paper publication) এবং

* প্রবন্ধ প্রকাশের আইন (Law of paper publication)।

গবেষণার প্রকারভেদ

Type of Research

আধুনিক বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও উন্নয়নে গবেষণা অপরিহার্য। জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় সে কারণেই ব্যাপকভাবে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণা ছাড়া

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো শাখাই অগ্রগতি লাভ করতে পারে না। এখন কথা হচ্ছে যে, এক ধরনের গবেষণাই সব ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কি না। অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একই গবেষণা পদ্ধতি সবক্ষেত্রে ব্যবহার করা নাও যেতে পারে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কোন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি কার্যকরী হবে তা এদের উদ্দেশ্যে ও কলাকৌশলের ধরন ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যেমন– প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, আচরণ বিজ্ঞান, সাহিত্য, আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রে একই ধরনের গবেষণা প্রয়োগ করা যায় না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এসব ধরন বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠছে বিভিন্ন রকমের গবেষণা পদ্ধতি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাদেরকে প্রায়শই দেখা যায়।

এসব বিভিন্ন রকমের গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্বে কত বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন রকমের গবেষণার প্রকৃতি ও ধরন বৈচিত্র্যের উপরই নির্ভর করে গবেষণা পদ্ধতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য। নিম্নে কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের গবেষণা উল্লেখ করা হলো–

১। মৌলিক গবেষণা (Basic research)
২। তাত্ত্বিক গবেষণা (Theoretical research)
৩। প্রায়োগিক গবেষণা (Applied research)
৪। বাস্তবধর্মী গবেষণা (Empirical research)
৫। ঐতিহাসিক গবেষণা (Historical research)
৬। পরীক্ষণীয় গবেষণা (Experimental research)
৭। মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (Field research)
৮। জরিপমূলক গবেষণা (Survey research)
৯। মূল্যায়নমূলক গবেষণা (Evaluative research)
১০। কার্যক্রম গবেষণা (Action research)
১১। দার্শনিক গবেষণা (Philosophical research)
১২। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা (Anthropological research)
১৩। জীবন-বৃত্তান্ত গবেষণা (Case-study research)
১৪। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা (Content analysis research) ইত্যাদি।

মৌলিক গবেষণা

Basic Research

মৌলিক গবেষণা অন্যান্য গবেষণার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক গবেষণা মর্যাদার দিক দিয়ে অত্যন্ত উপরে আর সে কারণেই মানব সভ্যতায় অবদান রাখার

জন্য বিশ্বখ্যাত নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয় মৌলিক গবেষণার উপরই। কোনো বিশেষ বিষয়ে মৌলিক গবেষণা পরিচালনা করে তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক আবিষ্কারের উপর এই পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। মৌলিক গবেষণাকে ইংরেজিতে Basic research বা Fundamental research অথবা Pure research হিসেবেও গণ্য করা হয়। মৌলিক গবেষণা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচালনা করা সম্ভব। যেমন– সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা করা হয়। এই মৌলিক গবেষণাকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে কেনেথ বেইলী (Kenneth D. Baily. 1982) বলেছেন, "Pure research (sometime called basic research) in values developing and testing theories and hypothesis that are intellectually interesting to the investigators and might. Thus have some social application in the future, but no application to social problems in the present time. অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, মৌলিক গবেষণা কতগুলো বিকাশমান বৈজ্ঞানিক অনুমানের উপরে নিরীক্ষা চালিয়ে থাকে। যা গবেষকের কাছে আগ্রহের এবং যা বর্তমানকালে সরাসরি কোনো সামাজিক ব্যবহারে আসে না। যদিও এর দূর ভবিষ্যতের প্রয়োগ থাকতে পারে।

মূলত মৌলিক গবেষণা পরিচালনা করে প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা হয়। এটা ধরে নেয়া হয় যে, প্রাকৃতিক ঘটনার উপর অর্জিত এই জ্ঞান ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়নি। এরূপ জ্ঞানের বিষয়টি দর্শনের বিবেচনায় (Philosophical point of view) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। এ ছাড়া মৌলিক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলকে গাণিতিক সূত্রের (Mathematical equation) সাহায্যেও প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞানে একথা ধরে নেয়া হয় যে, প্রকৃতির প্রত্যেকটি নিয়মই গাণিতিক সূত্র মেনে চলে। তাই এদেরকে কোনো না কোনো সমীকরণে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ এককথায় বলা যায়, "Basic research deals with the fundamental rules of nature which, is philosophically significant and mathematically expressed as equation, whether as not it can be applied in any field."

মৌলিক গবেষণা মূলত দার্শনিক চিন্তার সাথে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সম্মেলনের বা ঐক্যের কাজটি করে থাকে। ফলে মৌলিক গবেষণা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলকথা তা বলাই যায়। পরবর্তীতে এই মৌলিক গবেষণাকে ঘিরেই প্রায়োগিক গবেষণার বিকাশ ঘটে। মৌলিক গবেষণার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত থাকে বিধায় এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ তেমন কিছু জানতে পারে না। তবে মানব সভ্যতা বিকাশের মৌলিক চাবিকাঠি এই মৌলিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ভিতরেই নিহিত রয়েছে। আর সে কারণেই মৌলিক গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনোবিজ্ঞানেও মৌলিক গবেষণা তার প্রায়োগিক গবেষণা থেকে অনেক বেশি এগিয়ে আছে।

প্রায়োগিক গবেষণা

Applied Research

প্রায়োগিক গবেষণাকে ফলিত গবেষণাও বলা হয়। এই ধরনের গবেষণা তাত্ত্বিক গবেষণার ঠিক বিপররীত। এখানে যে গবেষণা পরিচালনা করা হয় তত্ত্বগত দিক থেকে তার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। এই গবেষণা মূলত বাস্তবধর্মী এবং এর ফলাফলকে সরাসরি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। অন্য কথায় বলা যায় যে, ফলিত গবেষণা আসলে বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। কোনো বাস্তব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য নিয়েই সাধারণত এ ধরনের গবেষণার নকশা প্রণয়ন করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, ধান গবেষণা বা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির উপর পরিচালিত গবেষণার কথাই ধরা যাক্। ধানের উপর গবেষণা করে উন্নত ফলনসম্পন্ন ধান আবিষ্কার করা হয়ে থাকে। এসব ধান বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই বীজগুলো সরাসরি জমিতে ব্যবহার করে ধানের ফলন বৃদ্ধি করা হয়। এ ছাড়া রেডিও, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, কম্পিউটার ইত্যাদির উপর পরিচালিত গবেষণাগুলো এসব যন্ত্রপাতির গুণগত মান উন্নয়নে এবং নতুন নতুন কাজ সংযোজনের মাধ্যমে ফলিত গবেষণায় ভূমিকা রাখে। এসব ক্ষেত্রে গবেষণাগুলোই হচ্ছে মূলত ফলিত গবেষণা। ইহা সরাসরি ব্যবহারিক কাজে প্রয়োগ করা হয়।

প্রায়োগিক গবেষণাকে অনেক লেখক ও গবেষক নানভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে কেনেথ বেইলী (Kenneth D. Baily, 1982) প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বেশি গ্রহণযোগ্য। ফলিত গবেষণা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "Applied research is research with findings that can be applied to solve social problem of immediate concern." অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, ফলিত গবেষণা হলো সেই গবেষণা যা বর্তমানে সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধানের ফলাফল নিয়ে কাজ করে। তবে এক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যা বলতে কেবলমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রের সমস্যাকেই বুঝানো হয়নি। বরং মানব সমাজে সার্বিক সমস্যাভিত্তিক যেকোনো ধরনের প্রায়োগিক ক্ষেত্রের কথাই বলা হয়েছে। এখানে সামাজিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, পেশাগত, কৃষি, শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যাপক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য উন্নত প্রযুক্তির কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ সবই ফলিত গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, ফলিত গবেষণা কেবলমাত্র ফীরত গবেষণার ধারাবাহিকতায়ই পরিচালিত হয় না। এ ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা এবং তত্ত্বগত গবেষণালব্ধ ফলাফলকে কাজে লাগানো হয়। সবশেষে ফলিত গবেষণাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, "Applied research is that research in which, the aim is oriented with, the attempt is doing through and the finding is applied into field purpose in everyday life.

কার্যক্রম গবেষণা

Action Research

কার্যক্রম গবেষণাটি ফলিত গবেষণার প্রায় কাছাকাছি একটি কার্যক্রম বা কর্মকাণ্ড। সাধারণত ফলিত গবেষণার ফলাফলকে বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য এই ধরনের গবেষণা ব্যবহার করা হয়। ফলিত বা প্রায়োগিক গবেষণার ধারাবাহিকতায় অথবা প্রায়োগিক গবেষণার সহযোগী হিসেবে এ ধরনের গবেষণা পরিচালিত হয়। এই ধরনের গবেষণার প্রকৃতি হয়ে থাকে অধিক মাত্রায় ফলিত ধরনের এবং এর ব্যাপ্তি সাধারণত কম থাকে। ইহাকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত গবেষণা (Pilot study)।

মূলত ফলিত গবেষণাকে বাস্তবে প্রয়োগের সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও কিছু কিছু গবেষণা পরিচালনা করার দরকার হয়। ফলিত গবেষণার ফলাফলকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য অপ্রত্যাশিতভাবে এসব গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন এই ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এই গবেষণাগুলো প্রায়োগিক ক্ষেত্র থেকে উৎসরিত হয় এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রেই এর সার্বিক ব্যবহার হয়ে থাকে।

কার্যক্রম গবেষণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গবেষক লিম্যান ও মেহরেন্স (Lehmann and Mehrens, 1991) উল্লেখ করেছেন যে, "Action research is a type of applied of decision oriented research, but with the stipulation that the researcher is the same person as the practitioner who will make and live with the decision." অর্থাৎ, ফলিত গবেষণাকে গখন বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়, তখন অপ্রত্যাশিত সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য এই কার্যক্রম গবেষণা পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে ফলিত গবেষণা বাস্তবে প্রয়োগ করার কর্তৃপক্ষ এবং কার্যক্রম গবেষণা পরিচালনার কর্তৃপক্ষ সাধারণত একই থাকে। এক্ষেত্রে যদি খুব উচ্চ পর্যায়ের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হয়, কেবল তখনই উচ্চ পর্যায়ের গবেষকদের সহায়তা চাওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে এই সকল সমস্যা কার্যক্রম গবেষণার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়েই সমাধান করার চেষ্টা করা হয়। ফলে একে একটি সহজ পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত করা যায়।

পরীক্ষণীয় গবেষণা

Experimental Research

মনোবিজ্ঞান মতো আচরণীয় বিজ্ঞানেও গবেষণা করার ক্ষেত্রে পরীক্ষণীয় গবেষণার গুরুত্ব অপরিহার্য। এই পরীক্ষণীয় বা পরীক্ষামূলক গবেষণা ব্যবহার করার জন্যই

মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে পরিচিত লাভ করতে পেরেছে। পরীক্ষণীয় গবেষণা মনোবিজ্ঞানে যত বেশি ব্যবহার করা যায় এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব ততই বৃদ্ধি পায়। আর সে কারণেই মনোবিজ্ঞানকে অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রায়োগিক করার জন্যই এর গবেষণায় পরীক্ষণীয় পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। আর এই প্রবণতা বর্তমানকালেও কার্যকরী আছে। আর সে কারণেই মনোবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল।

পরীক্ষণীয় গবেষণা বলতে মূলত পরীক্ষণ পদ্ধতিকেই (Experimental method) বুঝায়। এই পরীক্ষণ পদ্ধতি একটি বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি। বা অন্য কথায় বলা যায় যে, জ্ঞান অন্বেষণের জন্য ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি হচ্ছে এই পরীক্ষণ পদ্ধতি বা কৌশল। এই পরীক্ষণ পদ্ধতিটি এক বিশেষ ধরনের পর্যবেক্ষণ মাত্র। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এভাবে বলা যায়, "বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালিত গবেষণা কর্মে যখন নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সাপেক্ষ চলের উপর নিরপেক্ষ চলের প্রভাব পর্যবেক্ষণমূলকভাবে পরিমাপ করা হয় তখন সেই ব্যবস্থাকেই বলে পরীক্ষণ পদ্ধতি" (Experimental method is that investigation attempts operated by special research objective in which the effects; of independent variable on the dependent one are observationally meaured. under control situation.)।

পরীক্ষণের সংজ্ঞা প্রদানে উইলকিনসন ও ভান্ডারকার (Wilkinson & Bhandarker. 1984) বলেছেন যে, An experiment is the proof of a hypothesis which seeks to hook up two factors into a causal relationship through the study of contrusting situation which have been controlled on all factors except the one of interest, the latter being either the hypothetical cause or hypothetical effect".

এখানে পরীক্ষণ পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে এর কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এসব বৈশিষ্ট্যগুলোকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলেই পরীক্ষণ পদ্ধতিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব। পরীক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ-

(ক) পর্যবেক্ষণ (Observation): পরীক্ষণ পদ্ধতি এক বিশেষ ধরনের পর্যবেক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে, এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণটি সাধারণ পদ্ধতি থেকে আলাদা ধরনের হয়ে থাকে। কেননা এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ চালিত হয় গবেষকের দ্বারা সৃষ্ট বিশেষ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে।

(খ) পরিমাপ (Measurement): পরীক্ষণ পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর পরিমাপ যোগ্যতা। এক্ষেত্রে সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ চলগুলোকে যথাযথভাবে পরিমাপ করে উহাদেরকে সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে উক্ত চল দুটির মধ্যকার পারস্পারিক কার্যকরণ সম্পর্ক বা প্রভাবকেও পরিমাপ করা হয়।

(গ) নিয়ন্ত্রণ (Control): পরীক্ষণ পদ্ধতিতে পরীক্ষণীয় পরিবেশটি সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ নিয়ন্ত্রণটি পরীক্ষণের উদ্দেশ্য ও নক্শা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এখানে নিয়ন্ত্রণ বলতে মূলত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক (Intervening and external variables) চলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকেই বুঝায়। এ ছাড়া পরীক্ষক নিরপেক্ষ চলের (Independent variable) কর্মকাণ্ডকেও প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণ করেন।

(ঘ) চল ব্যবস্থাপনা (Variable setting): পরীক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত ৪টি চলকে পরীক্ষণের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও অনুমান অনুযায়ী প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে চলগুলোর মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক ব্যবস্থাপনা ও বিন্যাস পরীক্ষণের নক্শা অনুযায়ী হয়ে থাকে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পরীক্ষণে এই চল ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(ঙ) বস্তুনিষ্ঠতা (Objectivity): পরীক্ষণ পদ্ধতির কর্মকাণ্ডটি বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়। ফলে এর দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলও বস্তুনিষ্ঠ বা ব্যক্তি নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। অর্থাৎ, পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব দ্বারা পরীক্ষণের ফলাফল প্রভাবিত হয় না। পরীক্ষণের এ বৈশিষ্ট্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা মূলত বিজ্ঞানেরই একটি বৈশিষ্ট্য।

(চ) পুনরাবৃত্তি (Repetition): পরীক্ষণ পদ্ধতিতে পুনরাবৃত্তি বলে একটি কথা আছে। যখন কোনো পরীক্ষণীয় ফলাফল নিয়ে সন্দেহ দেখা যায় অথবা কোনো ফলাফলকে আরও অধিক হারে গ্রহণযোগ্য করার প্রয়োজন পরে তখন একটি পরীক্ষণের এই পুনরাবৃত্তি করা হয়ে থাকে। একই পরীক্ষণটিকে একইভাবে বারবার পরিচালনা করাকেই বলে পুনরাবৃত্তি। এর ফলে পরীক্ষণটির গ্রহণযোগ্যতা আরও বেড়ে যায়।

(ছ) যথার্থতা (Validity): পরীক্ষণ পদ্ধতি পরিচালনা করার পর প্রাপ্ত ফলাফলের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে দেখা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর চেয়ে অনেক বেশি থাকে বিধায় একে অনেক বেশি বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়। উল্লেখ্য, এই যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা পরিমাপ করার জন্য কতগুলো গাণিতিক নিয়ম চালু আছে। পরীক্ষণ পদ্ধতি একটি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বা আচরণীয় বিজ্ঞানে এর ব্যবহার অনেকটা সীমিত। কারণ এখানে পরীক্ষণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা বা জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় এই পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই আছে। এ সকল সুবিধা ও অসুবিধাগুলো সংক্ষেপে দেখান হলো–

সুবিধাসমূহ (Advantage): মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে এর ফলাফলের বস্তুনিষ্ঠতা, যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে এসব ফলাফলগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। পরীক্ষণীয় ফলাফলগুলো যেহেতু সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে প্রকাশ করা হয় এবং যেহেতু এই সংখ্যাগুলো মাপকের নিয়ম (Principle of scale) মেনে চলে তাই এগুলোকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সহজ হয়। এর দ্বারা মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ পদ্ধতিকে বারবার পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব হয় ফলে কোনো একটি পরীক্ষণের ফলাফল নিয়ে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে তা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষণটিকে বারবার পুনরাবৃত্তি করা যায়। পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের আর একটি অন্যতম সুবিধা হলো এর চলের পরিবর্তন করা। চলগুলোকে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে বা বাড়িয়ে কমিয়ে অথবা সম্পূর্ণভাবে কর্মহীন করা মাধ্যমে পরীক্ষণে প্রয়োজন অনুযায়ী ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয়। তবে মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো এর বৈজ্ঞানিক মর্যাদা। একথা ঠিক যে, এই পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করার মাধ্যমেই মনোবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক আসনে আসীন হতে পেরেছে। অতএব মনোবিজ্ঞানে যত বেশি পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে এর বৈজ্ঞানিক মর্যাদা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রবণতা এ রকমই। ফলশ্রুতিতে মনোবিজ্ঞান একটি প্রায়োগিক জ্ঞানের বিষয় হিসেবে পরিচিত হয়েছে।

অসুবিধাসমূহ (Disadvantage): উপরে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের যে সুবিধাগুলোর কথা বলা হয়েছে তা যেমন ঠিক, তেমনি একথাও পাশাপাশি মেনে নিতে হবে যে, মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারে অনেক অসুবিধাও রয়েছে। এখানে অবশ্যই মনে রাখাতে হবে যে, মনোবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো কোনো বস্তুগত বিজ্ঞান নয়। ইহা একটি আচরণীয় বা মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান। আর সে কারণেই এই ধরনের বিষয়ে পরীক্ষণ পদ্ধতির মতো একটি বস্তুগত পদ্ধতি (Materialistic method) ব্যবহারে অনেক রকমের অসুবিধাও রয়েছে। মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো যে, এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃত্রিম উপায়ে আচরণ তৈরি করে তার উপর পরীক্ষণ চালাতে হয়। ফলে, আচরণের স্বাভাবিকতা বা স্বতঃস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হতে পারে। এছাড়া মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিরাট ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব। যেমন– সামাজিক আচরণ, পেশাগত আচরণ ইত্যাদির উপর পরীক্ষণ কার্য চালান সম্ভব হয় না। এসব ঘটনা প্রাকৃতিক বিধায় এক্ষেত্রে চলের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন কাজ। এ ছাড়া মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাপ্ত ফলাফল অন্যান্য বিজ্ঞানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম গ্রহণযোগ্য হয়। কারণ এ নির্ভরশীলতার মান (Value of relibility) অপেক্ষাকৃত কম থাকে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চেয়ে কম।

এভাবে দেখা যায় যে, পরীক্ষণ পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বহুবিধ সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। তারপরও মনোবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বিকাশে এ পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। আর সে কারণেই মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় পরীক্ষণ পদ্ধতিকে যত বেশি প্রয়োগ করা যায় ততই মঙ্গল। তাই সে প্রচেষ্টাই সকল মনোবিজ্ঞানীদের।

দার্শনিক গবেষণা

Philosophical Research

ইংরেজিতে একটি কথা প্রচলিত আছে যে "Philosophy is the mother of all sciences." অর্থাৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় অধিকাংশ শাখা বা বিজ্ঞানের সকল বিষয়গুলোই এসেছে দর্শন শাস্ত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে। আর সে কারণেই দর্শনকে বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর মাতৃতুল্য বলে বিবেচনা করা হয়। দর্শন এসব বিষয়গুলোকে কেবলমাত্র সৃষ্টিই করেনি ; বরং এদের সাথে দর্শনের সম্পর্ক অতীব নিবিড়। এছাড়া অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেকটি বিষয়েরই রয়েছে আলাদা আলাদা দর্শন বা দার্শনিক ভিত্তি। দর্শন কেবলমাত্র বিজ্ঞানের ধারণাগুলোর সাথেই সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং তা সাহিত্য, আইন এবং ইতিহাসের সাথেও বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

এসব কারণেই কোনো বিষয়ের উপর অর্জিত সর্বোচ্চ একাডেমিক ডিগ্রীকে পিএইচ. ডি. (Ph.D) বলে অভিহিত করা হয়। Ph.D- এর শাব্দিক অর্থ "Dector of Philosophy". অর্থাৎ, বিষয়ভিত্তিকভাবে অর্জিত এই সর্বোচ্চ ডিগ্রিকে বলা যায়- "Doctor of Philosophy in Psychologly." বা Dector of Philosophy in chamistry". অর্থাৎ, Doctor of Philosophy in Economics. ইত্যাদি।

উপরে আলোচিত এই দার্শনিক গবেষণাকে প্রধানত দুইভাবে দেখা যেতে পারে। যেমন-

(ক) **মৌলিক দার্শনিক গবেষণা:** দার্শনিক গবেষণার ক্ষেত্রে যখন কেবলমাত্র যুক্তি-তর্ক, আলোচনা-পর্যালোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে এর জ্ঞানের বিকাশ ঘটান হয়, তখনই তাকে বলে মৌলিক দার্শনিক গবেষণা। এই ধরনের গবেষণার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান বিষয়গতভাবে দর্শনের জ্ঞাত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

(খ) **বিষয়ভিত্তিক দার্শনিক গবেষণা:** বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, আইন ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর পরিচালিত গবেষণার বিভিন্ন ধরন বৈচিত্র্য রয়েছে। এসব গবেষণামূলক ধরনগুলোর মধ্যে বিষয়ভিত্তিক দার্শনিক গবেষণা, বিষয়বস্তুগত গবেষণা, পদ্ধতি সম্পৃক্ত গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ইত্যাদি রকমের গবেষণা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক দার্শনিক গবেষণা একটি বিষয়ের মৌলিক

বিকাশকে সবচেয়ে প্রভাবিত করে থাকে। বিশেষ করে বিষয়ের বস্তুগত দিকটিকে বিকশিত করতে হলে উহার দার্শনিক দিকটির বিকাশ ঘটাতে হবে। আর সে কারণেই দরকার দার্শনিক গবেষণার কার্যকরী প্রয়োগ।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, দার্শনিক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যগুলো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ, মৌলিক দার্শনিক গবেষণার তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে পরীক্ষণ চালিয়ে গাণিতিক সূত্রে রূপদান করা হয়। অতঃপর সেই গাণিতিক সূত্রকে প্রযুক্তিগত গবেষণার মাধ্যমে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে বহুল পরিচিত "কার্যকারণ নীতি" (Law of cause effect) বিজ্ঞানী নিউটনের গতিজনিত তৃতীয় সূত্র "প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আলে" (Every action has an equal and oposite reaction.) স্বীকৃতি লাভ করেছে। পরবর্তীতে এই সূত্রটিকে মহাকাশে চলাচলের ক্ষেত্রে রকেট প্রযুক্তিতে (Rocket technology) ব্যবহার করা হয়েছে।

দার্শনিক গবেষণার মূল ভিত্তি হলো যৌক্তিক বিচার, মৌলিক বিশ্লেষণ ও সার্বিক প্রত্যক্ষণ (Logical judgement, fundamental analysis and as a whole perception)। এসব ধারণাগুলো দুটি নিয়মের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। এ দুটি হলো আরোহ পদ্ধতি (Inductive method) এবং অবরোহ পদ্ধতি (Deductive method)। দার্শনিক গবেষণার এ সকল নীতিমালা প্রয়োগ করার পর শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। এই শেষ সিদ্ধান্তই হলো "তত্ত্বগত উপস্থাপন" (Theoretical presentation)। গবেষণার এই তত্ত্বগত উপস্থাপন একট গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এভাবে দেখা যায় যে, দার্শনিক গবেষণায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান বা তত্ত্বগুলো পরিবর্তীতে বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে। আর সে কারণেই দার্শনিক গবেষণার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই দার্শনিক-গবেষণালব্ধ জ্ঞান অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে অধিক বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা

Content-Analysis Research

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা কোনো মৌলিক গবেষণা পদ্ধতি নয়। অর্থাৎ, এটি এমন কোনো পদ্ধতি নয় যা এককভাবে কোনো বিষয়ের উপর একক অনুসন্ধান করতে পারে। বরং অন্য কোনো পদ্ধতির সহায়ক হিসেবে এই পদ্ধতি কাজ করে।

অর্থাৎ, এটিকে একটি সহযোগী পদ্ধতি বলাই ভালো। আবার অন্যভাবে বলা যায় যে, বিশেষ প্রকল্প প্রমাণে এরূপ কয়েকটি আংশিক পদ্ধতি একত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান পরিচালনা করে থাকে। এভাবে দেখা যায় যে, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা একটি আংশিক বা অপূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি মাত্র যা অন্যান্য পদ্ধতির সাথে যৌথভাবে অনুসন্ধান পরিচালনা করে।

বিশেষ করে সামাজিক গবেষণা বা সমাজ মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। সাধারণত প্রশ্নমালা পর্যবেক্ষণ বা সাক্ষাৎকার প্রয়োগ করে প্রাপ্ত উপাত্তগুলোর উপর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি পদ্ধতিগুলো পূর্ণতা লাভ করে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণমূলক এই গবেষণাতে কতগুলো ধাপ মেনে চলতে হয়। এসব ধাপগুলো হলো-

১। **শ্রেণিকরণ:** সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা বা অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে প্রথমত শ্রেণিকরণ করা হয়। গবেষণা তথ্যের এই শ্রেণিকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শ্রেণিকরণ করার পর কিছু মূলনীতি মেনে চলতে হয়। এসব মূলনীতির ভিত্তি হচ্ছে তথ্য বা উপাত্তের প্রকৃতি (Nature of data)। এক্ষেত্রে তথ্যগুলো মূলত সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবেই সংগ্রহ করা হয়। যেমন- সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর উৎসমূল থাকে মূলত নমুনা। এসব নমুনার লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে আলাদা আলাদাভাবে শ্রেণিকরণের দরকার হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। এই শ্রেণির ভিত্তিতেই পরবর্তিতে উপাত্ত আলাদা করা হয়।

২। **পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ:** শ্রেণিকৃত উপাত্তগুলোকে পরিসংখ্যানের বিভিন্ন নিয়ম (যমন-গড়, মধ্যমা, প্রচুরক) অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা হয়। এসব বিশ্লেষণ দুটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এদের একটি হলো উপাত্তের প্রকৃতি এবং অন্যটি হলো গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য। এসব বিবেচনায় উপাত্তকে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সহজ থেকে জটিল ধরনের বিভিন্ন গাণিতিক নিয়মে বিশ্লেষণ করতে হয়।

৩। **ভাষাগত বিশ্লেষণ:** গাণিতিক বা পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের উক্ত সংখ্যাগুলোকে বিশেষ বিশেষ নিয়মে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করার সময় গবেষককে কতগুলো বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নজর দিতে হয়, গবেষক সে সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত থাকেন। যেমন-

* বিশ্লেষণের দিক নির্দেশনা থাকবে গবেষণা অনুকল্প/ প্রকল্প (Hypothesis) অনুযায়ী।

* বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গবেষণায় ব্যবহৃত সব ধরনের চলগুলোকে বিবেচনায় আনতে হবে।

* বিশ্লেষণ অবশ্যই যৌক্তিকভাবে করা হবে।

* বিশ্লেষণের শেষে এসে একটি সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

* ভাষাগত সিদ্ধান্তকে গাণিতিক সূত্রে বা সমীকরণে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়।

এভাবে দেখা যায় যে, গবেষণার বিভিন্ন ধাপগুলোর মধ্যে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের উপরই অনেকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করে গবেষণার পরবর্তী গতি প্রকৃতি। নতুন কোনো গবেষণা করার বেলায় এই বিশ্লেষণ নতুন দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। তাই বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। গবেষক তার সর্বোচ্চ মেধা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ব্যবহার করেন এই বিশ্লেষণ সম্পন্ন করার জন্য।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণা

Empirical Research

অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণাকে কোনো কোনো লেখক পরীক্ষামূলক গবেষণা বলেও অভিহিত করেছেন। তবে এটিকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণা বলাই ভালো। কেননা পরীক্ষামূলক গবেষণা বলতে Experimental method বলে ভ্রম হতে পারে। এই ধরনের গবেষণা বিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। অবশ্য সামাজিক বিজ্ঞানেও এদের পদচারণা একেবারে কম নয়। অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণার মূলভিত্তি সাধারণত দুটি। একটি হলো বাস্তব পর্যবেক্ষণ এবং অন্যটি পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ (Reality observation and Experimental observation)। এ ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা হয় কোনো এক বা একাধিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অথবা কোনো অনুকল্পকে (প্রকল্প) প্রমাণ করার জন্য। এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণার সংজ্ঞা প্রদানে গবেষক ফিসার (R.A. Fisher) বলেন, "Empirical research is any research that bases its findings on direct or indirect observation as its test of reality. Such research may also be conducted according to hypothetic-deductive procedure." অর্থাৎ "বাস্তবতাকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করে বা অনুমানভিত্তিক-অবরোহ পদ্ধতিতে গবেষণা বা অনুসন্ধান সম্পন্ন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাকেই বলে অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণা। এই "অনুমানভিত্তিক-অবরোহ পদ্ধতি" একটি বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পদ্ধতি (Karl Popper)। এই অনুমানভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতিকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এই ভাগ দুটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

১। **পরীক্ষামূলক গবেষণা (Experimental research):** এই ধরনের গবেষণা মূলত কার্যকারণ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এই ধরনের পারীক্ষমূলক গবেষণা দুই ভাবে করা হয়। যেমন-

ক) সত্য পরীক্ষণীয় (True experimental): এক্ষেত্রে পরীক্ষকগণ দুই ভাগে বিভক্ত থাকে। এই দুই ভাগ হলো পরীক্ষণীয় দল (Experimental group) এবং নিয়ন্ত্রিত দল (Control group)। কর্মকে বিবেচনা করে বলা যায় যথাক্রমে পরীক্ষণীয় পর্যায় (Experimental phase) এবং নিয়ন্ত্রিত পর্যায় (Control phase)।

খ) সাধারণ পরীক্ষণীয় (General experimental): এই ধরনের পরীক্ষণীয় ব্যবহারে পরীক্ষকগণ কোনো দলে বিভক্ত থাকে না। এখানে কেবলমাত্র দলগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক যাচাই করা হয়।

২। **অপরীক্ষামূলক গবেষণা (Non-experimental research):** পরীক্ষণমূলক গবেষণা যেমন- "কার্যকরণ সম্পর্ক" আবিষ্কারে কাজ করে, অপরীক্ষণমূলক গবেষণায় তেমনি "কার্যকরণ সম্পর্ক"-এর ব্যাখ্যা করে থাকে। এই অপরীক্ষণমূলক গবেষণা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন- ক্ষেত্র গবেষণা, সহ-সম্পর্কমূলক গবেষণা, ঐতিহাসিক গবেষণা, বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ গবেষণা ইত্যাদি।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক গবেষণার কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মাধ্যমে একটি গবেষণা তার সফলতার দিকে এগিয়ে যায়। এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো-

* সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অর্জন করা।

* বাস্তবভিত্তিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ সম্পর্কের উদ্ভাবন।

* তাত্ত্বিক ধারণার উদ্ভব, ব্যাখ্যা ও নিশ্চিতকরণ।

এভাবে দেখা যায় যে, অভিজ্ঞতামূলক গবেষণাই বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মূল হিসেবে কাজ করে। এই ধরনের গবেষণা সাধারণত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও কাজ করে থাকে। এ ছাড়া আচরণ বিজ্ঞান তথা মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় অভিজ্ঞতামূলক গবেষণা এক ধরনের অনুসন্ধানের মূলনীতি হিসেবে পরিচিত। অবশ্য মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ নানা কারণে সীমাবদ্ধ হতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পিএইচ. ডি.
PH. D.

পিএইচ. ডি গবেষণা
Ph. D. Research

পিএইচ. ডি. একটি সম্মানসূচক একাডেমিক ডিগ্রি। অর্থাৎ ইহার যেমন রয়েছে উচ্চ পর্যায়ের একাডেমিক বৈশিষ্ট্য তেমনি আছে উচ্চ পর্যায়ের মর্যাদার বৈশিষ্ট্য। একথা প্রায় সকলেরই জানা। তবে এই ডিগ্রিটি সম্পর্কে অনেকেরই (সাধারণের) পরিষ্কার ধারণা নেই। এই ডিগ্রি-র কাছাকাছি অন্যান্য ডিগ্রি যেমন- এম.এস., এম. ফিল., এম. এ. ইত্যাদির থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাই এই ডিগ্রি সম্পর্কে একটি সাদামাটা ধারণা থাকা শিক্ষিত সকল লোকদের জন্য প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পিএইচ. ডি. ডিগ্রিটিকে উপরে উল্লিখিত অন্যান্য ডিগ্রির সমতুল্য মনে করা ঠিক হবে না।

এখানে একটি কথা বলে নেয়া বাঞ্ছনীয় যে, সমগ্র পৃথিবীতে উচ্চ শিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শমান (International standard/Naorm/Reference) কার্যকরী রয়েছে। এদের একটি হলো আমেরিকান রেফারেন্স এবং অন্যটি ব্রিটিশ রেফারেন্স। সময়ে রাশিয়া এক্ষেত্রে আর একটি রেফারেন্স হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল, যা সফল হয়নি বলা যায়। বিশেষ করে আমাদের মতো ব্রিটিশ কমনওয়েলথ দেশগুলোর প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটিশ রেফান্স অনুযায়ী করা হয়েছিল। তবে সম্প্রতি বাংলাদেশসহ অনেক দেশ ব্রিটিশ নিয়ম থেকে বের হয়ে আমেরিকান নিয়ম চালু করার চেষ্টা করছে। তাই প্রচলিত অনেক নিয়মের সাথে এর অমিল থাকলে ভুল বোঝাবুঝি না হওয়াই প্রত্যাশিত। নিম্নে একাডেমিক ডিগ্রির স্তরবিন্যাস দেখান হলো যা আমেরিকান সংজ্ঞা অনুযায়ী নির্ধারিত। এর সাথে ব্রিটিশ প্রচলনের কমবেশি অমিল রয়েছে। যাই হোক একথা ঠিক যে, বর্তমান বিশ্বের প্রবণতা আমেরিকান পদ্ধতির দিকেই ধাবমান- ব্রিটিশ পদ্ধতির দিকে নয়। আর সে কারণেই আমরা যাতো তাড়াতাড়ি ব্রিটিশ পদ্ধতির খোলস থেকে বের হয়ে আমেরিকান পদ্ধতি চালু করতে পারবো ততই মঙ্গল।

প্রসঙ্গত একথা মনে রাখতে হবে যে, পিএইচ. ডি. ডিগ্রিই হচ্ছে সর্বাধিক একাডেমিক ডিগ্রি। এটা আন্তর্জাতিকভাবেই স্বীকৃত। আর সার্বিক বিবেচনায় উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক ডিগ্রি মূলত তিনটি। অন্যান্য ডিগ্রি এসব ডিগ্রির সমতুল্য বা একই অর্থ প্রকাশ করে মাত্র (Under the provision and practice in the Universities of the USA)। যেমন–

প্রথমতত, নিম্ন-স্নাতক ডিগ্রি (Under-Graduate Degree),

দ্বিতীয়ত, স্নাতক ডিগ্রি (Graduate Degree).

তৃতীয়ত, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (Post-Graduate Degree)।

এখানে নিম্ন-স্নাতক ডিগ্রি বলতে বি. এ., বি. এসসি., এল. এল. বি., বি. কম., বি. এস. এস., বি. বি. এ., বি. ইন্‌জ., এম. বি. বি. এম. ইত্যাদি বুঝায়। আন্তর্জাতিকভাবে এসব ডিগ্রি সাধারণত কমপক্ষে তিন বছরের এবং ক্ষেত্র বিশেষে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কোর্স। ব্রিটিশ নিয়মের অনার্স কোর্সগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। এর উপরের ধাপটিতে রয়েছে স্নাতক ডিগ্রি। এই স্নাতন ডিগ্রির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-এম.এ., এম.এসসি., এম.এম., এম.এস.এস., এম.বি.এ., এল.এল.এম., এম. এস., এ.ইন্‌জ., এম.এজি. ইত্যাদি। এই স্নাতক ডিগ্রির উপরের স্তরের ডিগ্রিই হচ্ছে ডক্টরেট ডিগ্রি। এই ডক্টরেট ডিগ্রি নানা রকমের হতে পারে। যেমন- পিএইচ. ডি., ডি. এসসি., এম.ডি., ডি.লিট., ডি.ইন্‌জ. ইত্যাদি। উপরে উল্লিখিত এই তিন ধরনের ডিগ্রিই হচ্ছে মৌলিক ডিগ্রি। এছাড়া আরও দুইটি ডিগ্রি আছে যাকে পুরাপুরি মৌলিক ডিগ্রি বলা যায় না। আর. এম. এস হচ্ছে আমেরিকান পদ্ধতির ডিগ্রি। নিম্ন-স্নাতক ও স্নাতক থেকে শুরু করে ডক্টরেট ডিগ্রি করার ক্ষেত্রে এ দুটি ডিগ্রির কোনো ভূমিকা নেই আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে। অবশ্য বর্তমানে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মাস্টার্স ডিগ্রিকে এম.এস. (বিজ্ঞান) ডিগ্রি বলছে। এই ডিগ্রি দুটি একাডেমিকভাবে স্বাধীন ডিগ্রি হলেও এদের কাজ প্রয়োজন ক্ষেত্রে সাধারণত দুই ধরনের। যথা–

#এই ডিগ্রি দুটি ক্ষতিপূরণ ডিগ্রি (Compensating degree) হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ একবার স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর আন্তর্জাতিকমানের স্বীকৃতি (recognition) লাভের জন্য এই ডিগ্রি দুটি যে কোনো একটি করা হয়। অর্থাৎ কেউ যদি আমাদের দেশ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে উন্নত দেশ পিএইচ.ডি. ডিগ্রি করতে যান সেক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় তাকে এ ধরনের এম.এস. বা এম. ফিল ডিগ্রি করতে হয়। এখানে এসব ডিগ্রিকে পূর্বের মাস্টার্স ডিগ্রির সমতুল্য ধরা হয়।

এই ডিগ্রি দুটি ডক্টরেট ডিগ্রি করার প্রস্তুতি (Pre-Ph.D.) হিসেবেও কাজ করে। অর্থাৎ যখন স্নাতক অথবা মাস্টার্স ডিগ্রি থেকে সরাসরি ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণে

সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন সেতুবন্ধ হিসেবে এই ডিগ্রি দুটির যে কোনো একটি অর্জন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি করার অনুপযুক্ত মনে করেই এই বাড়তি ডিগ্রি করানো হয়। অর্থাৎ বলা যায় যে, এই ডিগ্রির মাধ্যমে যোগ্যতার যথার্থতা নির্ধারিত হয়।

অনেকে নিম্ন-স্নাতক ডিগ্রিকে স্নাতক ডিগ্রি এবং মাস্টার্স ডিগ্রিকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বলে থাকেন। ইহা মূলত: পুরাতন ব্রিটিশ পদ্ধতির ধারণা। কিন্তু বিষয়টি পুরোপুরি সঠিক নয় বরং তা একটু জটিল। অর্থাৎ আমরা যাদের স্নাতক ডিগ্রিধারা বলছি, তারা মূলত: নিম্ন-স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করে স্নাতক পর্যায়ে অবস্থান করছে। একইভাবে মাস্টার্স ডিগ্রি পাস করার অর্থ হলো সে ব্যক্তি স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অবস্থান করছে। আর সে কারণেই উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. বা বি.এসসি অথবা বি.বি.এ এর ছাত্রদের বলা হয় Under Graduate Student. এখানে উল্লেখ্য যে, নিম্ন-স্নাতক (Under Graduate Degree) সম্পন্ন করার ফলে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু সে যখন ঐ বিষয়ের উপর স্নাতক (মাস্টার্স) ডিগ্রি অর্জন করে তখনই কেবলমাত্র তাকে একজন পেশাধারী শিক্ষিত লোক (A licenced person to practise on a particular field) বলা যায়। এখানেই স্নাতক-এর সাথে নিম্ন-স্নাতক ডিগ্রির মধ্যকার পর্থক্য বিদ্যমান।

অন্যদিকে, ডক্টরেট ডিগ্রিধারীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লাইসেন্স পেতে পারেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি মেম্বার হওয়ার জন্য এটিই একমাত্র শর্ত। অন্যদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ডিগ্রি (Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery)- কে নিম্ন-স্নাতক ডিগ্রি বলে হলেও ইহাকে মূলত (অনেক ক্ষেত্রে) স্নাতক ডিগ্রি হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ তারা এক্ষেত্রে কার্যত দুটি নিম্ন স্নাতক ডিগ্রি (Under Graduate Degree) MBBS লাভ করেছে। যেমন- এক্ষেত্রে মেডিসিন ও সার্জারীর উপর দুটি ডিগ্রি হিসেবে ধরা নেয়া হয়। এই ডিগ্রির মেয়াদকাল সে কারণেই অন্যান্য ডিগ্রি থেকে বেশি হয়। তাই এই MBBS ডিগ্রিকে অন্যান্য বিষয়ের মাস্টার্স ডিগ্রির সমতুল বলে ধরে নেয়া হয়। ফলে, এই MBBS ডিগ্রি দিয়ে তারা চিকিৎসা করার লাইসেন্স লাভ করেন।

অনেক আগে থেকেই ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচলিতভাবে বিভাগভিত্তিক ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া হতো। যেমন –দন্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে (DD), মেডিসিনের জন্য MD, আইনের LLD, মিউজিক এ D Mus. ইত্যাদি ডিগ্রিগুলো প্রায় সমতুল। তবে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে Ph.D. ডিগ্রি প্রদানের প্রচলন মূলত বিংশ শতাব্দীতেই। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডে এই ডিগ্রি প্রদানের প্রচলন মূলত যুক্তরাষ্ট্র থেকেই আসে। অর্থাৎ Ph.D. ডিগ্রির মূল উৎসস্থল হলো যুক্তরাষ্ট্র।

একথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, এই Ph.D. ডিগ্রির ধারণাটি সর্ব প্রথম ও সবচেয়ে বেশি প্রচলন ঘটে আসছিল যুক্তরাষ্ট্রে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, Ph.D. ডিগ্রির গ্রহণের ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক শর্ত পূরণ করতে হয়। আর এই সকল শর্তগুলো আদৌ সহজ ও সুনির্দিষ্ট নয় বরং তা অবশ্যই জটিল ও দুর্বোধ্যতায় পরিপূর্ণ। এই শর্তগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল শর্ত হচ্ছে এর গবেষণার মান। গবেষণার মানের এই কথাটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বা বিষেয়ের একটি এলাকার উপর ব্যক্তি যখন নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে, তখনই কেবল শর্ত পূরণ করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, Ph.D. -এর শাব্দিক অর্থই (Abreviation) হচ্ছে Doctor of Philosophy। আর এটিকে বিস্তারিতভাবে দেখলে, সংজ্ঞাটি এমন দাঁড়ায় যে, Completely new pholiosophy on the particular field of knowledge, at doctorate level (post-Graduate)" এখানে দুটি কথা অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ আর তা হলো Phliosophy এবং Doctorate level। এই (Original contribution to the particular field of knowledge) এবং সেনই অবদানের একটি মাত্রা বা মান আছে। (Ph.D. Student) ডিপক্ষে সাধারণত তেমন কোনো উচ্চমানসম্পন্ন মৌলিক গবেষণা উপহার দেয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তার এই গবেষণার মৌলিক কমপক্ষে (post-Gradute Level) পর্যায়ের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত Ph.D. ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব হবে না। পাশাপাশি এই ডিগ্রিধারী ব্যক্তিগত পেশাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, Ph.D. বা Doctorate ডিগ্রিধারী ব্যক্তি হবেন একজন পরিপূর্ণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত পেশাজীবী। এই পেশাজীবী বলতে বুঝায় মূলত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকতা এবং গবেষণার কাজ করা। অর্থাৎ তিনি সৃজনশীল কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলবর্টি আইনস্টাইন (Albart Einstein) এবং কার্ল মার্কস (Karl Marx)- এর বিখ্যাত তত্ত্ব যথাক্রমে Theory of Relativity এবং Das Capital-এর জন্য এদের কেউই ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেননি। তারা এ ডিগ্রি পেয়েছিলেন অন্য গবেষণার জন্য। তাছাড়া কেবলমাত্র তাদের তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা কর্মের জন্যই তারা যে, Ph.D. ডিগ্রি পেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে ঠিক নয়। প্রাতিষ্ঠানিক পেশাজীবী হওয়ার জন্য Ph.D. ডিগ্রি-র অন্যান্য শর্তাবলি তারা যথাযথভাবে পূরণ করেছিলেন।

যাই হোক, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ডক্টরেট ডিগ্রি একটি সম্মানজনক একাডেমিক ডিগ্রি। এই ডিগ্রিকে প্রচলিতভাবে ব্যক্তির নামের সামনে বসান হয়। যেমন –ড. কোরবান আলী (Dr. Korban Ali) । তবে বর্তমানকালে কোনো কোনো

ক্ষেত্রে লেখার ক্ষেত্রে এই ডিগ্রিটিকে সহজে বুঝবার জন্য Korban Ali Ph.D. এভাবে লেখা হয়। নামের সামনে লিখলে একটি ভ্রমের সৃষ্টি হয় বলেই একে নামের পিছনে লেখা হয়। কেননা যেকোনো ধরনের ডক্টরেট ডিগ্রি এবং মেডিকেল সাইন্সের M B B S ডিগ্রিধারীদের একইভাবে লেখা হয়। অনেক সময় Dr. Korban Ali (Ph.D.) এভাবেও লেখা যায় তাতে দৃশ্যত কোনো ভুল হবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামের শেষে Ph.D.-এর মর্যাদা (Starus) বিষয়ভিত্তিক অনেক ডিগ্রির (Dr.) চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের।

এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। আর তা হলো যে, এই ডক্টরেট ডিগ্রিটি ঐ ব্যক্তি কোন বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেছে! এমনকি তার সুপারভাইজারইবা কে ছিলেন। এগুলো ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর সে কারণেই এই সম্মানজনক ডিগ্রিধারী ব্যক্তির নামের পরে এসব তথ্য লেখার প্রচলন রয়েছে। যেমন, ধরা যাক Dr. Korban Ali (Ph.D Cambridge) বা Dr. Korban Ali (Ph.D MIT) জার্মানির অনেক পণ্ডিত অধ্যাপকরাই একাধিক ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। সেক্ষেত্রে তারা লেখেন, Dr. Korban Ali. জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ প্রধানগণ (President) এইভাবে তাদের নামের সামনে দুবার ডক্টরেট লিখনে যা অধিকতর মর্যাদা বহন করে।

এক্ষেত্রে আর একটি নিয়ম বা প্রচলন এই ডিগ্রিটিকে আরও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ করেছে। তাহলো সুপারভাইজারের নাম উল্লেখ করা। এই নিয়মটিও ব্যাপকভাবে দেখা যায় জার্মানিতে। যদি সুপারভাইজার অত্যন্ত বিখ্যাত হন, যেমন নোবেল বিজয়ী হন তাহলে তার নাম লেখা যায় এভাবে Dr. Korban Ail(Father Einestine) । অর্থাৎ ড. কোরবান আলীর পিএইচ.ডি. সুপারভাইজার হচ্ছেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। আর একটি নিয়মও এখানে উল্লেখ করা ভালো। এই নিয়মটি হচ্ছে বিষয়ের নাম লেখা। সাধারণত পদার্থবিদ্যায় খুব উচ্চ পর্যায়ের গবেষণার মাধ্যমে Ph.D. ডিগ্রি অর্জনকারীরাই এভাবে লিখে থাকেন, যেমন– (Korban Ali Ph.D.) ।

এভাবে দেখা যায় যে, ডক্টরেট ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদের নামের সাথে এই ডিগ্রি অতি সম্মানের সাথে ব্যবহার হয়। এই প্রচলন বা প্রথা সারা পৃথিবীতেই জনপ্রিয় হয়ে আছে। তবে, যারা কেবলমাত্র সম্মানসূচক ডক্টরেট লাভ করেন তাদের আগে ও পরে ডক্টরেট কথাটি লেখা বা বলা যায় না। তাছাড়া একাডেমিক ডিগ্রিধারীদের নামের পূর্বে ডক্টর শব্দটি বলে সম্বোধন করাই আন্তজাতিক প্রথা। যা সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে বলা যায় না।

পিএইচ. ডি ব্যক্তিত্ব

Ph. D. Personality

একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যত্রতত্র এবং যেনতেনভাবে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি প্রদান করা ঠিক নয়। একটি নির্দিষ্ট কোর্স পড়িয়ে এবং একটি থিসিস লিখে দিলেই তা মূল পিএইচ. ডি. ধারণার (fundamental concept of Ph. D) সাথে অনেক সময় সংগতিপূর্ণ নাও হতে পারে। এটা অবশ্যই একটা জটিল সমস্যা। এমনকি বর্তমানকালে অনেক ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ করে একটি যেনতেন থিসিস দাখিলের মাধ্যমে এই ডিগ্রি প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে। এটাও পিএইচ. ডি. ডিগ্রি-এর মূল চেতনার বিরোধী। এভাবে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত Ph.D. যে একটি ভ্রান্ত প্রচেষ্টা তা বলাই বাহুল্য। এসব ডিগ্রিগুলো মূলত একাডেমিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত (Academic character)। কিন্তু পিএইচ.ডি.-কে কেবলমাত্র এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায় না। একথা অবশ্যই জানতে হবে যে, পিএইচ. ডি.-এর মূল বৈশিষ্ট্য দুটি। যথা–

(ক) পিএইচ. ডি. একটি একাডেমিক ডিগ্রি।

(Ph.D. is an acadmic degree.)

(খ) পিএইচ. ডি. একটি ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক ডিগ্রি।

(Ph.D. is a personalized degree.)

একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, পিএইচ. ডি.-এর উপরোক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র একটি ভালো মাপের গবেষণা এবং একটি ভালো থিসিস লিখে দিলেই পিএইচ. ডি. ডিগ্রি হয় না। তাই যদি হতো তাহলে অনেকগুলো প্রকাশিত প্রবন্ধ আছে এমন লোকদেরকেও পিএইচ. ডি. ডিগ্রিধারী বলা হয়। এই ডিগ্রিটি পেতে হলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়। একজন দক্ষ ও বুদ্ধিমান সুপারভাইজার অবশ্যই এসব বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সজাগ থাকেন। একজন ব্যক্তিকে পিএইচ. ডি. প্রদান করার সময়, অর্থাৎ গবেষণার সময়কালে সুপারভাইজার এসব গুণ তার মধ্যে আছে কিনা তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি তার নিজ মেধা ও সৃজনশীলতা দিয়ে ছাত্রের মধ্যকার এসব বৈশিষ্ট্য উন্মেষে সহায়তা করেন। পিএচ. ডি. ডিগ্রি অর্জনে রত ছাত্রের মধ্যে বর্তমান, প্রত্যাশিত এসব বৈশিষ্ট্য হলো–

- তিনি অবশ্যই একজন সত্যবাদী মানুষ হবেন। ব্যক্তি জীবনে ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই সততা তিনি সবসময় রক্ষা করে চলবেন।
- গবেষণার প্রতি নিষ্ঠা ও পরবর্তীতে চালিয়ে যাবার প্রতি আগ্রহ এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা।

* সৃজনশীল কাজে আত্মনিয়োগের প্রবণতা ও সৃষ্টিশালী কাজে নিয়োজিত থাকা।

* তার পরিকল্পনা ও কার্মপ্রবণতা দূরদর্শী হবে এবং ভবিষ্যতের কাজের জন্য বর্তমানকে প্রস্তুত রাখবেন।

একজন পিএইচ. ডি. ছাত্রকে একথা মনে রাখতে হবে যে, পিএইচ. ডি.-এর ধারণাটা কোন বদ্ধ ধারণা (Covert idea) নয়, বরং এটি হচ্ছে মুক্ত ধারণা (Open idea)। অর্থাৎ Ph.D. কোনো শেষ কথা নয় বরং বলা যায় যে, এক ধরনের আরম্ভ বা শুরু। পিএইচ. ডি. গবেষণা অবশ্যই এমন হতে হবে যা থেকে আরও গবেষণার প্রবণতা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। বীজ থেকে যেমন গাছ জন্মে, আর গাছ থেকে বীজ। সে রকমেই একটি অবস্থা, অনন্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা থাকতে হবে Ph.D. কর্মের মধ্যে। এসব গুণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি প্রদান করা পিএইচ. ডি. ডিগ্রির নৈতিক মানদণ্ডের (Ethical standard of ph.D. Degree) পরিপন্থী।

পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো

post-Doctoral Follow

পিএইচ. ডি. বা ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আর একটি বিষয় প্রসঙ্গক্রমে এসে যায়। আর তাহলো 'পোস্ট-ডক্টরেট'। একথা বলা হয়তো অযৌক্তিক নয় যে, ডক্টরেট ডিগ্রিই হচ্ছে একাডেমি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি। এর উপরে আর কোনো ডিগ্রি নেই। আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে ডক্টরেট ডিগ্রির মধ্যে বিভিন্ন রকম প্রকার ভেদ আছে। যদিও মর্যাদা (Status) এর ক্ষেত্রে এদের মধ্যে ছোটখাটো পার্থক্য বিদ্যমান। তথাপি বলা যায় যে, এই ডক্টরেট ডিগ্রিই হচ্ছে প্রথাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে সবচেয়ে বড় বা সর্বোচ্চ ডিগ্রি।

কিন্তু আর একটি শিক্ষার কথা প্রায়ই শোনা যায়। এটি হলো পোস্ট-ডক্টরেট (post-Doctoret)। ডক্টরেট ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর এই post-Doctoret করা হয়। আমার জানামতে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই ধরনের কোনো শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ এখনও প্রদান করা হয় না। এর জন্য যেতে হয় উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ডক্টরেট ডিগ্রি করার পর অনেকেরই ইচ্ছে থাকে এই পোস্ট-ডক্টরেট সম্পন্ন করার। কথা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, আমাদের দেশ বা ভারত থেকে যারা পিএইচ. ডি. করেছেন তাদের কারো কারো মধ্যে এই পোস্ট-ডক্টরেট সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। অতএব, এ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা লেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাতে করে পোস্ট-ডক্টরেট সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায়। তা না হলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে যা কোনোমতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পোস্ট-ডক্টরেট, ডক্টরেট ডিগ্রির চেয়েও উচ্চ পর্যায়ের একটি গবেষণার শিক্ষা (Resarch education) । কোনো ডক্টরেট করার পরই কেবলমাত্র এই পোস্ট-ডক্টরেট করা যায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো যে, ডক্টরেটের মতে পোস্ট-ডক্টরেট কোনো ডিগ্রি নয়। ফলে এই পোস্ট ডক্টরেট শেষ করার পর কোনো রকম প্রথাগত একাডেমিক সনদ (সার্টিফিকেট) প্রদান করা হয় না। আর ডক্টরেটের মতো পোস্ট-ডক্টরেটের কোনো থিসিস করার বাধ্যবাধকতা নেই। তবে পোস্ট-ডক্টরেট গবেষণা থেকে প্রবন্ধ প্রকাশন করা হয়। এটাই হচ্ছে পোস্ট-ডক্টরেটের একমাত্র চ্যালেঞ্জ। এখানে একটি জরুরি যে, এই পোস্ট-ডক্টরেট তাহলে কী? বলা যায় যে, পোস্ট- ডক্টরেট না শিক্ষা না চাকরি। অর্থাৎ এদের মাঝখানের একটি পর্যায় । ডাক্তারদের কথাই ধরা যাক। এম.বি.বি.এস. করার পর চিকিৎসা করার জন্য আমাদের দেশে ডাক্তারদের ইন ট্রেইনি নামের একটি কোর্স করান। এই কোর্সটি না করলে চিকিৎসা করার জন্য সরকারিভাবে তাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয় না। ঠিক তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে পিএইচ., ডি. ডিগ্রির পর পোস্ট-ডক্টরেট প্রশিক্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয়। এই পোস্ট-ডক্টরেট প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আমাদের দেশে পোস্ট-ডক্টরেট থাকাতো দূরের কথা পিএইচ. ডি. ছাড়াই কেবলমাত্র মাস্টার্স ডিগ্রিধারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দেওয়া হয়। কিন্তু উন্নত দেশে তা অনেক ক্ষেত্রেই চিন্তাই করা যায় না। আমি যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের কথা বলছি। এদুটি দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি তো থাকতেই হবে তারপর দেখা হবে তার পোস্ট-ডক্টরেট প্রশিক্ষণ আছে কিনা এবং কতগুলো প্রকাশন (publications) আছে এর উপর নির্ভর করবে তার চাকরি।

অনেকে এই পোস্ট-ডক্টরেটকে post-Doctoral Fellow (PDF) বলে থাকেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে posyt-Doctoral Training (PDT)- ও বলা হয়। এই পোস্ট-ডক্টরেটের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থ বরাদ্দ করে। এই অর্থকে Fellowship বলে। সাধারণত বলা যায় যে, এই ধরনের প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ প্রদান করাই যথাযথ প্রথা।

এখন কথা হচ্ছে যে, এই পোস্ট-ডক্টরেট কত দিনের কোর্স। অর্থাৎ এর স্থায়িত্ব কত। আসলে পোস্ট-ডক্টরেটের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই ডক্টরেটের মতো। তবে, স্বাভাবিক প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পোস্ট-ডক্টরেট হয়ে থাকে দুই বছরের জন্য। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর স্থায়িত্ব এক বছর থেকে তিন বছরও হতে পারে। আর একটা কথা স্পষ্ট যে, এই পোস্ট-ডক্টরেট একজন মানুষ একাধিকবার করতে পারেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মেয়াদের পোস্ট ডক্টরেট

করা সম্ভব। এইভাবে একাধিকবার পোস্ট-ডক্টরেট করার ফলে একাডেমিক ক্যারিয়ার আরও উন্নত হয়। পোস্ট-ডক্টরেট বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন করা হলে উচ্চতর গবেষণামূলক অভিজ্ঞতার ব্যপ্তি ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পোস্ট-ডক্টরেট তাদেরকে নির্ধারিত গবেষণার পাশাপাশি নিম্ন স্নাতক পর্যায়ের ক্লাসে লেকচার প্রদান করতে হয় বিধায় বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে একাডেমিক দক্ষতা ও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অনেক উন্নত হয়।

পোস্ট-ডক্টরেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে আরও কিছু বিষয় প্রসঙ্গক্রমেই এসে যায়। কেননা এগুলো পোস্ট-ডক্টরেটের প্রায় সম পর্যায়ের এবং এদের সম্পর্কেও পাশাপাশি নানা আলোচনায় দেখা যায়। এসব বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে এ ক্ষেত্রের জ্ঞান থেকে যায়। এসব বিষয় হলো–

Visiting Fellow,
Visiting Scientist,
Visiting professor,
Research Fellow,
Invited Lectuer,

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত হতে হয়। এখানে Visiting Fellow এবং Visiting Scientist-কে প্রায় একই ধরনের কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। এগুলো হলো, কোনো গবেষক শিক্ষক তার কর্মক্ষেত্রের বাইরে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষণা করার সুযোগ লাভ করা। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ বিষয়ের উপর গবেষণা করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে (Fellow) দাওয়াত করা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে ঐ প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন এবং তার জন্য তাকে সম্মানী ভাতা (বেতন) প্রদান করা হয়। এই ধরনের গবেষকদেরকে Research Fellow বলা হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে। যে শিক্ষকের সাথে তিনি একত্রে গবেষণা করবেন তাকে বলা হয় Host Fellow/Host professor। মূলত এই হোস্ট প্রফেসরই তাকে আমন্ত্রণ জানান তার গবেষণার কাজ করার জন্য।

আর Visiting professor শব্দটি দুইভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এক হচ্ছে গবেষণার কাজ, যা Visiting Fellow হিসেবেই বিবেচিত। আর অন্যটি হচ্ছে কেবলমাত্র শিক্ষকতার কাজ করা। এক্ষেত্রে তিনি কোনো নির্দিষ্ট ক্লাসের নির্ধারিত কোর্স পড়ানোর কাজ করেন। কোর্স শেষে তিনি আবার তার নিজ প্রতিষ্ঠানে ফিরে যান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই প্রথা চালু আছে। এক দেশের অধ্যাপক অন্য দেশে গিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এক বা একাধিক কোর্সে শিক্ষাদান করেন।

অন্যদিকে Invited Lectuer এর মেয়াদকাল হয়ে থাকে খুবই সংক্ষিপ্ত। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি লেকচার প্রদান করার জন্য বাইরের কোনো গবেষককে বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে দাওয়াত করা হয়। এই ধরনের লেকচার কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের উপর প্রদান করা হয়। এই লেকচার শ্রোতার স্থানে থাকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক গবেষক ও ছাত্ররা। তবে এ ধরনের আয়োজন থাকে মূলত মুক্ত। যে কেউ এই লেকচার শেষে প্রশ্ন পর্বেও অংশগ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ আমন্ত্রিত বক্তা নির্দিষ্ট পরিমাণে সম্মানী বা আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশের কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কর্মকাণ্ড মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটে এর প্রচলন আছে। এটা অবশ্যই একটা সম্মানিত কাজ।

এভাবে দেখা যায় যে, উপরের ফেলোশিপগুলো ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক কাজ। এই কাজে তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উন্নয়ন ঘটে। তাছাড়া প্রশ্নপর্ব ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে উভয়েই কমবেশি উপকৃত হয়। এতে পারস্পরিক জ্ঞান ও চিন্তার আদান-প্রদান ঘটে থাকে। এই ধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা তথ্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে। এছাড়া এই ধরনের যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদির মধ্যে কৃষ্টি, ভাব ও মানবিকতার আদান-প্রদান হয়ে থাকে। ফলে মানবিকতা ও শান্তির পথ প্রসারিত হয় এবং এভাবে জাতিসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হতে সহায়তা করে। এসব বিবেচনায় এই ধরনের আদান-প্রদান অত্যন্ত জরুরি কাজ।

অধ্যাপনা

Professorship

এই Professorship শব্দটি মূলত ল্যাটিন শব্দ Profess থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করা। এখানে ঘোষণা বলতে জ্ঞানচর্চার এবং সে সম্পর্কিত সত্য প্রচারকেই বোঝান হয়। মূলত উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষকতা পেশাকে বোঝাতে এই অধ্যাপনা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেখানে পেশাধারী মৌলিক ধরনের উচ্চপর্যায়ের গবেষণায় নিয়োজিত থাকেন। এসব গবেষণা থেকে পাওয়া জ্ঞানকে প্রথাগতভাবে বলা যায় প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং তা দৃঢ়চিত্তে প্রচার করার কাজকেই বলে অধ্যাপনা। বলাইবাহুল্য যে, এই অধ্যাপনা পেশাটি সমাজের একটি অতি উচ্চ পর্যায়ের ও সম্মানজনক পেশা হিসাবে সারা পৃথিবীতে সমাদৃত।

অধ্যাপনা পেশার মূল কাজ তিনটি। প্রথমত, শিক্ষকতা করা ও দ্বিতীয়ত, গবেষণা করা এবং তৃতীয়ত, সামাজিক উন্নয়ন তথা মানব কল্যাণে মৌলিক অবদান রাখা। অবশ্য এই তিনটি কর্ম পরস্পর পরস্পরের সাথে পরিপূরকভাবে সংযুক্ত। সাধারণত

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অধ্যাপনা শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এখানে তেমন পার্থক্য নেই। পার্থক্য হচ্ছে যে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি কোন পর্যায়ে শিক্ষাদান করছেন। মূলত নিম্ন-স্নাতক (Under-graduate) এবং স্নাতকোত্তর (post-graduate) পর্যায়ে শিক্ষাদানরত ব্যক্তিকেই বলে অধ্যাপক। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষাদানরত সবাইকেই অধ্যাপক বলা হয় না। কেবলমাত্র এদের মধ্যে পদোন্নতি পেয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত পদকেই বলে অধ্যাপক যা কতগুলো ধাপ অতিক্রম করে আসতে হয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বিশ্ববিদ্যায়গুলোর নিয়ম ও প্রচলন অনুযায়ী অধ্যাপনার পদটি মূলত তিনটি সর্বোচ্চ তিনটি পদের সর্বোচ্চ অবস্থান। এ পদ তিনটি হলো –

প্রথমত, সহকারি অধ্যাপক (Assisitant Professor)

দ্বিতীয়ত, সহযোগী অধ্যাপক (Associate professor)

তৃতীয়ত, অধ্যাপক (Professor)

এখানে সহকারী পদটির পূর্বে আরও একটি পদ আছে। যদিও এই পদটি প্রকৃত অর্থে অধ্যাপনার আওতাভুক্ত নয়। তবুও যেহেতু এই পদটিই প্রাথমিকভাবে অতিক্রম করা হয় তাই এটিকে অনেকেই প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচনা করতে ইচ্ছুক। এই পদটিকে বলে প্রভাষক (Lecturerবা Instructor)। আমাদের দেশে এই পদটিকেও অধ্যাপনার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই পদের ব্যক্তির (প্রভাষক) প্রধান কাজই হলো পাঠদান করা। যেহেতু এই প্রভাষকদের গবেষণা সম্পর্কে ধারণা নেই (সাধারণত ধরে নেয়া হয়) তাই তারা কর্মে নিযুক্ত হন না।

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার ক্ষেত্রে অধ্যাপক পদ লাভ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির গবেষণার দক্ষতা ও অবদানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আর সে কারণেই ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি গ্রহণ করতে হয়। এই ডিগ্রিটিই হলো Ph.D. । এই ডিগ্রিটি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন : Ph.D. D. Sc. D. Lit. M. D. D. Eng. ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। অতএব মনে রাখতে হবে যে, অধ্যাপনা পদটি লাভ করতে হলে এসব ডিগ্রি অর্জন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা এই ডিগ্রিগুলো অর্জন করলে ব্যক্তি একজন স্বাতন্ত্র্য গবেষক হিসাবে কাজ করার মতো ক্ষমতা লাভ করেন। এছাড়া এই ডিগ্রিধারী ব্যক্তি অধ্যাপনা পেশার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, পেশাগত, সামাজিক ইত্যাদি দিক থেকে যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। এছাড়া ব্যক্তির মধ্যে সৃজনশীলতাও বিকাশ লাভ করেন। ফলে তা উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষকতা ও গবেষণা করার জন্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত করে তোলে। এসব কারণেই উপরোল্লিখিত ডিগ্রিগুলোর কোনো একটি

লাভ না করলে সাধারণত অধ্যাপক পদবি দেয়া হবে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কমবেশি ব্যতিক্রম আছে।

উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক পেশাটি একটি অতি উচ্চমানের পেশাগত উপাধি। এই উপাধিটি সে কারণেই ব্যক্তির নামের সামনে সাথে ব্যবহার করা হয়। আর একবার যদি কেউ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই পদবি অর্জন করে তাহলে সে তা সারাজীবন তার নামের সাথে মর্যাদার সাথে ব্যবহার করতে পারেন। এখানে ব্যক্তি পেশার নিয়োজিত থাক বা না থাক সে তার নামের সামনে উপাধিটি লিখতে বা বলতে পারবেন। বলাই বাহুল্য যে, এটি একটি আমৃত্যু ব্যবহার উপযোগী পদবি। তবে অধ্যাপনা নামের এই পদবিটি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। অধ্যাপনা পদবিটি কয়েকটি নিম্নে অতি সংক্ষেপে দেখানো হলো–

* প্রফেসর এমেরিটাস (Professor Emeritus) : একজন পূর্ণ অধ্যাপক যখন তার গবেষণার দ্বারা অনেক খ্যাতি লাভ করেন তখন তাকে এ ধরনের উপাধি প্রদান করা হয়ে থাকে। এই উপাধি প্রদান করা হয় মূলত অবসরে পাওয়ার পর। অবসরে যাওয়ার পূর্বে অর্থাৎ চাকরিকালীন অবস্থায় এ ধরনের উপাধি প্রদান করা হয় না। এই ধরনের উপাধির মর্যাদাগত অবস্থান (Status) অধ্যাপকের চেয়ে উপরে হয়। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তাকে এই ধরনের পদবি প্রদান করে থাকে। অধ্যাপক সাহেব এক্ষেত্রে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতেও পারেন। তবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা তিনি এই উপাধি লাভ করেছেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নাম আমৃত্যু লেখা থাকবে Emeritus Faculty দের স্থলে। উল্লেখ্য এই পদকটিও আমৃত্যু ব্যবহার করা হয়। এরা নিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সারা জীবন আর্থিক সুবিধা পাবেন। এই ধরনের পদবিওয়ালা অধ্যাপক আমাদের দেশে খুব কমই দেখা যায়

* ডিসটিংগুইস্ট প্রফেসর (Distinguished Professor, Teaching/ Research): ডিসটিংগুইস্ট প্রফেসরদের অবস্থানও সাধারণ প্রফেসরদের থেকে উপরে। এই ধরনের পদবি প্রদান করা হয় সাধারণত খুবই অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে। কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে, কোনো বিশ্ববিদ্যালদের মাত্র ১% অধ্যাপক এ ধরনের পদবি পেয়ে থাকেন। বলাই বাহুল্য যে, এ সকল পদবি প্রদানের ক্ষেত্রে অধ্যাপকের ব্যক্তিগত অবদান অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। এই পদবটি প্রদানের ক্ষেত্রে অধ্যাপকের অবসরে যেতে হয় না। অর্থাৎ চাকরিকালের মধ্যেই তাকে এ ধরনের সম্মানিত পদবিতে ভূষিত করা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকাতে এ ধরনের অধ্যাপকদের পরিচয় পাওয়া যায়।

* এনডউড প্রফেসর (Endowed Professor) : মূলত একে এনডউড প্রফেসর না বলে বলা হয়, এনডউড চেয়ার (Endowed Chair/ Named)। পদবিটিও খুব

কমসংখ্যক অধ্যাপককে প্রদান করা হয়। সাধারণত চাকরিরত অবস্থায়ই এই পদক প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে এই ধরনের পদবি অধ্যাপক সাহেবের নামের প্রথমে ব্যবহার করা যায় না। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় বরং ; নয় অন্য কোনো অর্থ প্রদানকারী (গবেষণার জন্য যারা অর্থ প্রদান করে থাকেন) সংস্থা বা সংগঠন অথবা উচ্চ পদমর্যাদাশালী ব্যক্তির কাছ থেকেই এ ধরনের উপাধি প্রদান করা হয়। ইউরোপের অনেক দেশে এই ধরনের পদবি প্রদান করা হয়।

* অ্যাডজাক্ট প্রফেসর (Adjuct Professor) : এটি তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদবি নয়। সাধারণত কোনো অধ্যাপক যখন কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহণ করেন তখন তিনি অন্য কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি গবেষণায় অংশগ্রহণ নাও করতে পারেন। এখানে তার কাজ কেবলমাত্র নির্ধারিত কোর্সের উপর শিক্ষাদান করা। এটা এক ধরনের খণ্ডকালীন কাজের মতোই। এই ধরনের পদে আসীন ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। তিনি এভাবে একাধিক প্রতিষ্ঠানে একই সময় কাজ করতে পারেন। কেননা এ ক্ষেত্রে তার বেতন অনেকটা কম থাকে। এই ধরনের অধ্যাপকরা এক বিষয়ের হয়েও অন্য বিষয় কাজ করতে পারেন। যেমন– বলা যায় যে, A Professor of phyiscs could be a prcfessor of Chamisty।

* কোর্টসি প্রফেসর (Coutresy Professor) : এই ধরনের অধ্যাপকরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা অন্য কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠানে যখন কর্মরত থাকেন তখন অন্য একটি প্রতিষ্ঠানেও পাশাপাশি কাজ করতে পারেন। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রের জন্য তাকে বলা হয় কোর্টসি প্রফেসর। প্রথম কাজটি তার প্রধান এবং দ্বিতীয়টি অপ্রধান। এই ক্ষেত্রেও দুটি ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে শিক্ষা দান করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক Jousa M. Alphen is a professor of low and professor by courtesly of History at Stampford University । এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অধ্যাপক সাহেব কম দায়িত্ব পালন করেন এবং তারই ফলে কম বেতন গ্রহণ করে থাকেন।

* গবেষক অধ্যাপক (Research Profrssor) : এই ধরনের অধ্যাপনার ক্ষেত্রে নিম্নতর দুটি ধাপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন– Associate Research Professor এবং Associate Research Professor। এই ধরনের অধ্যাপকদের বেতনভাতা আসে মূলত কোনো বিশেষ তহবিল (Special Grant/Fund) থেকে। এরা সাধারণত কোনো শিক্ষকতার কাজ করেন না। এদের মূল কাজ হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করা। মর্যাদার ক্ষেত্রে এরা সাধারণ অধ্যাপকদের মতোই তবে তাদের উপরে নয়।

* সম্মানজনক অধ্যাপক (Honourary professor) : এটি মূলত: কোনো একাডেমিক পদবি বা একাডিমিক পদ নয়। এ পদবি সাধারণত প্রদান করা হয়

কোনো একাডেমিক কাজে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখার জন্য। ফলে এই ধরনের পদবি ব্যক্তি তার নামের আগে। ব্যবহার করতে পারেন না । কোনো ব্যক্তি যদি কোনো উচ্চতর গবেষণার প্রতিষ্ঠান বা কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অথবা এর উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন তবে তাকে এ ধরনের সম্মানে ভূষিত করা যায়। এই ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে তিনি টাকা প্রদান করতে পারেন। তবে এখানে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে উক্ত ব্যক্তিটি যে সম্মানসূচক অধ্যাপক পদটি গ্রহণ করেছেন তার যথাযথ সম্মান ধারণ করার মতো একাডেমিক যোগ্যতা থাকে। এ ধরনের একাডেমিক যোগ্যতা (Academic background) ছাড়া কাউকে এই পদ/পদক প্রদান করা হয় না।

* জিপসী স্কলার (Gypsy Scholar) এখানে জিপসী শব্দের অর্থ হলো যাযাবর। অর্থাৎ যারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে তাদের জীবিকার কার্য সম্পাদন করে তারাই হলো জিপসী। এক্ষেত্রেও বিষয়টি অনুরূপ। এক ধরনের একাডেমিক আছেন যাদের কোনো স্থায়ী কর্মস্থল নেই। তারা কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও কাজ করে থাকেন। এ সবের কোনোটিই স্থায়ী পদ নয়। এই ধরনের একাডেমিক ব্যক্তিরা শিক্ষা প্রদান ও গবেষণার কাজ করে থাকেন। যেহেতু এদের কোনো স্থায়ী কর্মস্থল নেই সুতরাং এদেরকে বলা হয় জিপসী স্কলার।

'* লুকাসিয়ান প্রফেসর (Lucasian professor বা Lucasian Chain): এই পদটি অত্যন্ত সম্মানজনক। বলা যায় যে, এই পদের পদমর্যাদা একাডেমিক যেকোন পদের চেয়ে উপরে। তবে ইহা প্রদান করা হয় কেবলমাত্র Cambridge University-তে। আবার তাও কেবলমাত্র Department of Mathematics-এ। এই পদবিটি প্রথম প্রবর্তন করেন ব্রিটেনের তৎকালীন রাজা Henry Lucas ১৬৬৩ সালে। তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Member of parliament (১৬৩৯-১৬৪০) ছিলেন। তবে এই পদবিটি অফিসিয়ালভাবে প্রবর্তন করেন ব্রিটেনের তৎকালীন রাজা King Charles II (18-01-1664)। উল্লেখ্য বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন (Isaac Newton) এই পদবিতে ভূষিত ছিলেন। বর্তমানকালে এই মহাসম্মানের অধিকারী ব্যক্তিটি সকলেরই পরিচিত ভুবনখ্যাত Lucasinan Professor Dr. Stephen Hawking একজন গণিতবিদ ও তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী।

লেখকের নাম

Name of the Author

কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে লেখক বা প্রবন্ধ রচনাকারীর নাম উল্লেখ করা একটি অপরিহার্য বিষয়। যদিও এই বিষয়টি প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম সহজ কাজ। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের শিরোনাম লেখার পর দ্বিতীয় কাজটিই

হচ্ছে লেখকের নাম লিপিবদ্ধকরণ। যে প্রবন্ধ কেবলমাত্র একজন রচনা সেক্ষেত্রে একজনের নাম লিপিবদ্ধ করতে আদৌ কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয় না। কিছুটা জটিলতা বা দ্বিধার উন্মেষ ঘটে যখন কোনো গবেষণার কাজ ও প্রবন্ধ তৈরিতে দুই বা ততোধিক গবেষকের বা লেখকের অংশগ্রহণ থাকে। এখানে তাদের নামের পূর্বাপর ধারাবাহিকতাই হচ্ছে মূল সমস্যা। অর্থাৎ কোন নামটি প্রথমে হবে, কোনটি শেষে হবে আবার কোনটিই হবে দ্বিতীয় , তৃতীয় ইত্যাদি স্থানে সেটা নির্বাচন করাই অন্যতম সমস্যা। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে লেখকদের নামের ক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে ঠিক কোন নিয়মে এই ক্রম তৈরি করতে হবে সে ব্যাপারে সর্বজনীন নিয়ম নেই বললেই চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচলিত মূলনীতি মেনে চলা হয়। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক রবার্ট (Robert A. Day, 1919) বলেছেন Unfortunately there are no agreed upon rules on generally accepted conventions। অতএব এক্ষেত্রে কেবলমাত্র গবেষকগণই ঠিক করেন এই ক্রম। তারা তাদের মধ্যকার অংশগ্রহণের মান ও মাত্রা বিবেচনা করে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতেই তা ঠিক করেন।

কিছু কিছু বিখ্যাত ব্রিটিশ জার্নালে লেখকদের নামের ক্রম তৈরি করা হয় তাদের নামের আদ্যাক্ষরের বর্ণমালাভিত্তিক ক্রমানুসারে। বর্তমানে এই নিয়ম তেমন একটা চলে না। কারণ এতে জটিলতা ও অস্পষ্টতা বৃদ্ধি পায়। তবে বর্ণমালার ভিত্তিতে তৈরি করা ক্রমানুসারে নাম লেখার এই নিয়ম আমেরিকান পদ্ধতিতে সচরাচর দেখা যায় না। অবশ্য অতীতে এমন একটি প্রবণতা লক্ষ করা গেছে যে, লেখকদের মধ্যে প্রথম নামটি সাধারণত গবেষণাগারের প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের হবে। সেক্ষেত্রে উক্ত গবেষণা কার্য পরিচালনা বা সার্বিক বিষয়ে তার অবদান যতই কম থাকুক না কেন। এক্ষেত্রে নামটি দেখলেই বুঝা যেতে পারে তিনি একজন সিনিয়র গবেষক। এই রীতির পাশাপাশি পূর্বে আরও একটি নিয়ম চালু ছিল যা আগের নিয়মটির ঠিক উল্টো ধরনের। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তির নামটি লিপিবদ্ধ হয় শেষে। আর তাই শেষের নামটি দেখলেই বুঝা যাবে যে তিনি হয় গবেষণা প্রজেক্টের প্রধান বা বিভাগীয় প্রধান বা গবেষণার প্রধান ইত্যাদি। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে নামের ক্রমানুসারে দিয়ে সব সময় লেখকের অবদানের কম-বেশি পরিচয় নিরূপণ করা যায় না।

বর্তমানের লেখকের নামের ক্রমনীতিমালার পরিবর্তন এসেছে। এখন কোনো গবেষণা প্রবন্ধ আকারে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে লেখকের নামের ক্রমানুসার নির্ধারণ করা হয় তার অংশগ্রহণমূলক বা আদান-প্রদানমূলক স্তরকে (Desigree of contribution) বিবেচনা করে। অর্থাৎ যার নাম অগ্রে লেখা থাকেব সে এই গবেষণায় বেশি অবদান রেখেছে বলে ধরে নেয়া যাবে । এমনকি নোবেল

বিজয়ী কোনো বিজ্ঞানীর নামও যদি শেষে থাকে তবে বুঝতে হবে যে এই গবেষণায় তার অবদান সবচেয়ে কম। বর্তমানকালে কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গবেষণাগারের সাধারণ টেকনিশিয়ানদের নামও লেখক তালিকায় কমবেশি স্থান পায়। যদিও সে মূল গবেষণা কর্মে আদৌ অংশগ্রহণ করেনি। এই ধরনের প্রচলনে ভালো ও মন্দ উভয় রকমের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে কোনো সাময়িকীতে এদের অবস্থান সম্পর্কে ফুট নোটে উল্লেখ করা যায়। ফলে গবেষণায় সকলের অবদান ও অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখকদের নামের ডান পার্শ্বের উপরে (কোণাকুনি অবস্থানে) মাঝে মাঝে এক ধরনের তারকা চিহ্ন (*) ব্যবহার করা হয়। এই তারকা চিহ্ন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, যা নিচে সংক্ষেপে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো। সাধারণত যে পৃষ্ঠায় লেখকদের নাম উল্লেখ থাকে সেই পৃষ্ঠার নিচের অংশে উক্ত তারকা চিহ্ন এঁকে তার পার্শ্বে এর অর্থ সংক্ষেপে ব্যবহার করা হয়। এভাবে একাধিক অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে একাধিক লেখকের নামের পার্শ্বে একটি, দুইটি বা তিনটি বিভিন্ন সংখ্যায় চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশের বাস্তবতায় বিখ্যাত একটি সাময়িকী "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্রিয়া", ২০০৩ এর ১৩৫ নং পৃষ্ঠা থেকে একটি উদাহরণ দেয়া হলো–

বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশার নিয়োজিত নারী ও পুরুষের ছাত্র রাজনীতির প্রতি মনোভাব

হামিদা আখতার বেগম * ফারহানা হোসেন**

(এভাবে প্রবন্ধের শিরোনাম ও লেখককে নাম যে পৃষ্ঠায় যে আছে সেই পৃষ্ঠারই নিচে 'ফুট নোট' হিসেবে লেখা আছে এর ব্যাখ্যা। যেমন-)

* অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

** পিএইচ. ডি. গবেষক

তবে, এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার সাথে বিভিন্ন আন্তজাতিক পত্রিকার (International scientific journal) কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে যে সেসব ক্ষেত্রে লেখকদের পদবি (অধ্যাপক, প্রভাষক, পিএইচ. ডি. গবেষক ইত্যাদি) লেখা হয় না। লেখকদের পদমর্যাদা উল্লেখ করা হয় তা প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। তাই প্রবন্ধকারের পদমর্যাদা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় না। কেবলমাত্র তাদের কর্মক্ষেত্র যদি আলাদা থাকে বা গবেষণায় তাদের অংশগ্রহণ যদি কোনো কৌশলগত বিষয় থাকে, তবে কেবলমাত্র ফুট নোটের মাধ্যমে তাহাই প্রকাশ করা হয়। যেমন –

*Department of Experimental Psychology,
Cambridge University,UK
**Department of Psychology,
Dhaka University, Bangladesh
*** Took part in data collection
**** Took part in the discussion

গবেষণা প্রবন্ধ লিখনের আর একটি নিয়ম হলো - লেখকের নামের সাথে সাথে তার ঠিকানাও লিখতে হয়। এভাবে যোগাযোগের জন্য ঠিকানা লেখার নিয়মকে ইংরেজিতে বলে Affiliation । তবে বিজ্ঞান জার্নালগুলো লেখকদের পদমর্যাদা না লিখলেও মেডিকেল জার্নালগুলোতে লেখকের নামের সাথে ডিগ্রি ও পদবি লেখা হয়ে থাকে। বিখ্যাত গবেষক রোস্টেন (Leo Rosten, 1968)-এর মতে, কোনো কোনো মেডিকেল জার্নালে বিস্তারিত আদলে প্রবন্ধকারদের নামের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করা হয়। এটিই এসব জার্নালের বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে নিম্নের উদাহরণগুলোর শেষেরটি দ্রষ্টব্য।

(i) Dr. Mahmudur Rahman – Clinical Phpychologist
(ii) Dr. K. S. Bennur and Dr. K. Noorshitan
(iii) Dr. Albert Green
(Obstetricians 24th. service..........we deliver)

এবার আমরা দেখবো যে, কোনো গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির নাম লেখক হিসেবে লেখা যায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, যে স্বাভাবিকভাবে লেখক হিসেবে তাদেরই নাম স্বীকার করা যাবে যারা গবেষণার নকশা প্রণয়ন (Desiging) এবং গবেষণা পরিচালনায় (Execution) সরাসরি অংশগ্রহণমূলক গুরুত্বের (Degree of contribution) ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় লেখকদের নামের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "The first author being acknowledge as the senior author, the second author the primary the third author author possibly being equivalent to the second but more likely havning a lesser involement with the work report " (Robert 1979) ।

অনেক সময় এমনও গবেষণা প্রবন্ধ দেখা যায় যেখানে প্রায় দশ জনের মতো লেখকের নাম লিপিবদ্ধ থাকে। যদিও এটা কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয় এটা একটি ব্যতিক্রম মাত্র। প্রসঙ্গত কিভাবে প্রায় দশজন গবেষক একটি গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা সহজে বোধগম্য নয়। এক্ষেত্রে জটিলতা এড়াবার জন্য লেখকদের সংখ্যা কম হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় এবং সাধারণত তাই হয়ে থাকে।

ক্রমিকীকরণ

Numbering

গবেষণা প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় সচরাচরই চোখে পড়ে। তা হলো যে, প্রতিবেদনের বিভিন্ন ধাপগুলো লেখার সময় সংখ্যার বা ভাষায় এদেরকে ক্রমিকীকরণ করা হয়। যেমন অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবেদনকে কতগুলো অধ্যায়ে ভাগ করা হয় (Alphabetic statement)। সাধারণত উচ্চতর পর্যায়ের থিসিসি লেখার সময় বিশেষ বিশেষ গবেষণাগুলো এক একটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষণাগুলো ধারাবাহিকতা অনুযায়ী প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অধ্যায় ইত্যাদিভাবে সাজানো যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অধ্যায়গুলো স্বতন্ত্র ধরনের হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় যখন গবেষণার ব্যাপ্তি খুব বেশি থাকে না, তখনও ইহাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রতিবেদন লেখার প্রবণতা দেখা যায়। যদিও তা খুব বেশি প্রচলিত নয় এবং খুব বেশি আকর্ষণীয়ও নয়। এসব ক্ষেত্রে ভূমিকাকে প্রথম অধ্যায়, পদ্ধতিকে দ্বিতীয় অধ্যায়, ফলাফলকে তৃতীয় অধ্যায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তকে চতুর্থ অধ্যায় ইত্যাদি চিহ্ন বিবৃত করা হয়। তবে এরূপ ধাপ তৈরি খুব বেশি প্রত্যাশিত নয়। অবশ্যই বৃহদাকার গবেষণা বিশেষ করে, যেখানে অনেকগুলো গবেষণা ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে সেইসব ক্ষেত্রে এভাবে অধ্যায়ের ব্যবহার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণা প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে আর এক ধরনের ক্রমিকীকরণ হলো সংখ্যা তাত্ত্বিক (Numberical statement)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সংখ্যা দ্বারা ধাপগুলোকে প্রকাশ করা হয়। পূর্বের আলোচনায় যে অধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে সেই অধ্যায়ের মধ্যের উপধাপগুলো সংখ্যা দ্বারা ধারাবাহিকভাবে সাজান হয়। আবার যেখানে গবেষণার ব্যাপ্তি কম যেমন একক গবেষণার ক্ষেত্রেও এই সংখ্যামূলক ধাপ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ যেখানে গবেষণার প্রতিবেদন অপেক্ষাকৃত ছোট হয় সেখানে সংখ্যার ব্যবহার করাই ভালো।

একথা ঠিক যে, বিভিন্ন বিখ্যাত জার্নালের গবেষণা প্রতিবেদনগুলোর ধাপগুলোকে বিভিন্নভাবে ক্রমিকীকরণ করা হয়। আবার কোনো কোনো জার্নালে এইসব ধাপগুলোকে বিশেষভাবে বুঝাবার জন্য আদৌ কোনো সংখ্যা অথবা ভাষাগত ধাপ ব্যবহার করা হয় না। অন্যদিকে, যে সব ক্ষেত্রে সংখ্যার ব্যবহার করা হয় সেখানেও বিভিন্ন জার্নালের মধ্যে কমবেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে বেশির ভাগ আন্তর্জাতিক জার্নালে যে নিয়মটি মেনে চলা হয় তা হলো এরূপ– গবেষণা জার্নালে প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম শিরোনাম (Title) লিখতে হয়। অতঃপর বস্তুসংক্ষেপ (Abstract) লেখা হয়। সাধারণত এমন কোনো জার্নাল চোখে পড়ে না যেখানে শিরোনামটি লেখার পূর্বে 'শিরোনামটি' বা Title শব্দটি লেখা হয়। অর্থাৎ

প্রবন্ধের শিরোনামটি লেখার পর এর সামনে শিরোনামটি বা Title শব্দটি ব্যবহার করার দরকার নেই। কোনো কোনো 'বস্তুসংক্ষেপ'- এর ঠিক পূর্বে লেবেল হিসেবে (Abstract) ব্যবহার করা হয় না। তবে্ অধিকাংশ থিসিসেই বস্তুসংক্ষেপ বা Abstract শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সংখ্যা দ্বারা ক্রমিকীকরণ শুরু হয় মূলত ভূমিকা (Introducation) থেকে। একটি আর্দশ ও আকর্ষণীয় ক্রমিকীকরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা (Introducation) '1.0' পদ্ধতি (Method) '2.0' ফলাফল (Result) '3.0'. আলোচনা ও সিদ্ধান্ত (Discussion and Conclusion) '4.0'. ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। আবার এসব প্রতিটি ধাপের সমন্বয়ে করে তাদের উপবিভাগ করা হয়। যেমন পদ্ধতি (Method)-এর মধ্যে থাকতে পারে উদ্দীপক (Stimulus), যন্ত্রপাতি (Aparatus), কার্যক্রম (Procedure) ইত্যাদি। আবার যদি এই উপধাপগুলোর মধ্যে আরও সহকারী ধাপ থাকে তবে, তাও সেই নিয়মে ক্রমিকীকরণ করা হয়। যেমন ধরা যাক কোনো গবেষণার মধ্যকার কার্যক্রম তিনটি ধাপে করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবেদন লেখার সময় সম্পূর্ণ ধাপগুলোর হেডলাইন দিতে হয়। এরূপ কোনো গবেষণা প্রতিবেদনের ধাপগুলো একটি নমুনা নিম্নে দেয়া হলো–

1.0 Introducation
2.0 Method
2.1 Stimulus
2.2 Procedure
2.2.1 1st Step
2.2.2 2nd Step
2.2.3 3rd Step
3.1 Result
4.1 Discussion and Conclusion

এভাবে উপরের প্রধান প্রধান ধাপগুলোর মধ্যে উপধাপ থাকলে সেগুলোকে উপরের নিয়মে ক্রমিকীকরণ করাই সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি হিসেবে অনেকেই মনে করেন। আবার কোনো কোনো জার্নালে এসব ধাপগুলোকে বড় অক্ষরে (A, B, C ইত্যাদি) এবং উপধাপগুলোকে ছোট অক্ষরে (a, b, c ইত্যাদি) প্রকাশ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার রোমান সংখ্যাও ব্যবহার করতে দেখা যায় (I, II, III, IV ইত্যাদি)। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোনোমতেই শিরোনাম (Title). বস্তুসংক্ষেপে (Abstract). কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement). তথ্যসূত্র (Reference) এবং পরিশিষ্ট (Appendix)-এর সামনে কোনো সংখ্যা বা অক্ষর দ্বারা ক্রমিকীকরণ করা হয় না। এটাই প্রায় সর্বজনীন নিয়ম। অর্থাৎ অধিকাংশ আন্ত

র্জাতিক সাময়িক এই নিয়ম মেনে চলে। আর সে কারণেই আমাদেরও তা মেনে চলা উচিত। তবে পরিশিষ্টের মধ্যে এক ধরনের ক্রমিকীকরণ মাঝে মাঝে দেখা যায়, যখন পরিশিষ্টের মধ্যে একাধিক উপবিভাগ করা প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে পরিশিষ্ট শব্দটির শেষে এই ক্রমিকীকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ক্রমিক হিসেবে বড় ফ্রন্টের অক্ষর (যেমন A, B, C ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়। এ রকম দুটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো–

Appendix-A
Appendix-B
Appendix-C
অথবা,
Appendix-A1
Appendix-A2
Appendix-A3

অন্যদিকে তথ্যসূত্রের (Reference) সামনে কোনো ক্রমিক থাকে না ঠিকই , কিন্তু বিভিন্ন তথ্যসূত্রগুলোকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যা দ্বারা আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে (Alphabetical order) সাজান হয় (৩.১৬ তথ্যনির্দেশ দ্রষ্টব্য)।

অন্যদিকে, আর এক ধরনের ক্রমিক ব্যবহার করা হয় সাধারণত থিসিসের ক্ষেত্রে। থিসিস লেখার প্রথমদিকে মুখবন্ধ (Preface), কৃতজ্ঞতাস্বীকার (Acknowledgement), বস্তুসংক্ষেপ (Abstract), লিখতে হবে। এক্ষেত্রে সূচিপত্রে (Content) ইহাদিগকে রোমান অক্ষরে নির্দেশ করতে হয়।

যেমন–

Preface...(i)
Acknowledgements...(ii)
Abstract...(iii)

ভূমিকা

Introduction

গবেষণা প্রতিবেদন বা থিসিস লেখার বর্ণনামূলক ও বিস্তারিত ধাপটি হলো 'ভূমিকা'। ভূমিকাতে গবেষণার মূল দিক নিদের্শনাটি থাকে। এতে প্রধানত থাকে পূর্ববর্তী গবেষণার সাহিত্য (Research Literature)। এক গবেষণার ঐতিহাসিক পটভূমিও বলা হয়ে থাকে। একজন দক্ষ গবেষক ঠিক তখনই 'ভূমিকা' লিখতে শুরু

করেন যখন গবেষণা কর্মটি অগ্রগতি লাভ করতে থাকে। বিশেষ করে যখন যন্ত্রপাতি সহজলভ্য থাকে এবং যখন পরীক্ষণ কার্য চলতে থাকে। মূলত তখনই ভূমিকা লেখা শুরু করা উচিত। গবেষণার ক্ষেত্রে যদি সহ-লেখক (Co-author) থাকে তবে তাহাকে বা তাহাদিগকে সাথে নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে ভূমিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে লেখককে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কেননা ভূমিকাকে অবশ্যই গতিশীল করে সাজাতে হবে। পূর্ববর্তী গবেষণাকে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি গতি থাকে এবং তা ক্রমশ: একটি পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। আর এই পরিণতিই হচ্ছে একটি প্রকল্প/ অনুকল্প (hypothesis) গঠন করা। যার ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যাতে কোনো এলোমেলো ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত না হয়। এক্ষেত্রে মূলত প্রাসঙ্গিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। ভূমিকাতে উল্লিখিত গবেষণাগুলোকে এভাবে অবশ্যই প্রাসঙ্গিকতায় সমৃদ্ধ হতে হবে। তাছাড়া একে কোনো ভালো সাহিত্যে বলা যাবে না। ফলে একটি ভালো ভূমিকা লেখার ক্ষেত্রে লেখককে কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। এ প্রসঙ্গে রবার্ট (Robert A. Day. 1979) এর উক্তিগুলো দেয়া হলো–

(i) The introuduction should present first with all possible clarity the nature and scope of the problem investigated.

(ii) To orient the reader the pertinent research literature should be properly reviewed.

(iii) The method of the investigation should be stated.If deemed necessary, the reasons for the choice of a particular method should also be stated.

(iv) The principle result of the previous investigation should be stated in brief.

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, একটি ভালো ভূমিকা লেখার ক্ষেত্রে লেখককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ভূমিকাটি প্রতিবেদনের প্রথমদিকে লিখতে হবে। ভূমিকায় সব ধরনের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ থাকবে যা মূল গবেষণাটিকে বুঝতে সহায়তা করে। তাছাড়া গবেষণার প্রকৃতি ও পরিসর সম্পর্কেও প্রাথমিক ধারণা থাকবে এই ভূমিকায়। তাছাড়া লেখকের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির একটি প্রচেষ্টাও থাকবে। যাতে করে পাঠক ভূমিকা পড়ার সাথে সাথে গবেষণাটির প্রতি আরও অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে। গবেষণায় কী ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কেও একটি প্রচ্ছন্ন ধারণা থাকবে। পদ্ধতির কথা সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও কোন প্রেক্ষিতে কোন বিশেষ পদ্ধতি এখানে ব্যবহার করা হবে তাও কৌশলে উল্লেখ থাকতে হয়। আবার গবেষণাটির প্রধান প্রধান নীতিমালা সম্পর্কেও

বিশেষভাবে উল্লেখ থাকবে। গবেষণায় এই নীতিমালা অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে এর গবেষণা পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। তবে পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা যাবে না এ ক্ষেত্রে।

ভূমিকা কখনই এমন হবে না যাতে করে পাঠক একটি অস্বস্তির মধ্যে বা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। ভূমিকা সবসময়ই গতিশীল, আকর্ষণীয় ও সহজে বোধগম্য ধরনের হবে। কোনো কোনো বিখ্যাত গবেষকের লেখা ভূমিকায় দেখা যায় যে, তারা পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট গবেষণাগুলো ভূমিকায় আলোচনার ক্ষেত্রে প্রধান গবেষণাটি সবশেষে উল্লেখ করেন। ভূমিকার শেষে দেখা যায় যে, হঠাৎ করে এমন একটি গবেষণালব্ধ ফলাফল উল্লেখ থাকে যা বর্তমান গবেষণাটির প্রাসঙ্গিকতাকে সরাসরি প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে ভূমিকার মূল চমকটি ভূমিকার শেষে অবস্থান করে। এখানে চমক বলতে এক ধরনের আবিষ্কারমূলক 'ইউরেকা'-কেই বুঝান হয়েছে। আবার এক ধরনের ভূমিকায় চমক বা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাটি দিয়েই ভূমিকা শুরু করা হয়। এক্ষেত্রে চমক প্রদানের পর এর সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণাগুলো প্রাসঙ্গিকভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা হয় মাত্র। তবে অবশ্যই মনের রাখতে হবে যে, উভয়ক্ষেত্রেই উল্লেখ্য গবেষণাগুলোর উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও ফলাফলের মধ্যে এক ধরনের যৌক্তিক দায়বদ্ধতা বা যৌক্তিক ধারাবাহিকতা থাকবে। আর এই ধারাবাহিকতার যৌক্তিক পরিণতিতেই বর্তমান গবেষণাটির গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা নিহিত থাকবে। এভাবে লিখিত একটি ভূমিকাকে গতিশীল ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ভূমিকা লেখার ক্ষেত্রে ইতপূর্বে নিজের প্রকাশিত প্রবন্ধ যা এর সাথে সংশ্লিষ্টতাকে উল্লেখ করতে হয়। অবশ্য তা লিখতে হবে যথাযথ সূত্র (Citation) উল্লেখ করার মাধ্যমে। সংশ্লিষ্ট গবেষণা যদি প্রকাশিত নাও হয় এমন ক্ষেত্রে যদি কোনো জার্নালে দাখিল করা হয় অথবা দাখিলা করার জন্য প্রস্তুতির কাজ চলে তাহাও উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের অপ্রকাশিত গবেষণাগুলোকে প্রথাগতভাবে শেষের দিকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া গবেষণার ব্যবহার করা হবে এমন কোনো নতুন বিষয়বস্তু (Tram) ভূমিকায় এর সংজ্ঞা প্রদান ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তাছাড়া সংক্ষিপ্ত বিষয় (Abbreviation) যা প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করা হবে সেগুলোকে সহজে বর্ণনা করতে হবে। এভাবে দেখা যায় যে, কোনো গবেষণা প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে ভূমিকার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে যে, বিষয়টি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ এবং প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা। প্রতিবেদনে যে কোনো ধরনের দুর্বোধ্যতা ভূমিকাতে সহজভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। ফলে ভূমিকাকে গবেষণার প্রতিবেদনের প্রবেশ্য হিসাবে গণ্য করা যায়। যেখানে এই প্রবেশ্যটি হতে হবে মসৃণ ও আরামদায়ক (রূপক অর্থে)। অর্থাৎ এটি যত বেশি আকর্ষণীয় হবে ততই ভালো।

পদ্ধতি

Method

পদ্ধতিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'পদ্ধতি ও উপকরণ' (Method and Materials) হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়। তাছাড়া এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল বস্তুগত কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয় সে সম্পর্কেও উল্লেখ থাকে। বিশেষ করে গবেষণার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিবরণ উল্লেখ করতে হয়। গবেষণা পদ্ধতির ও পদ্ধতিগত বা উপকরণের ব্যবহারকে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করতে হয়। যন্ত্রপাতির যান্ত্রিক দিক ও পদ্ধতিগত দিককে পারস্পরিক বিবেচনায় আনতে হবে। এটা অবশ্যই একটা জটিল কাজ। এই পদ্ধতিতে যন্ত্রপাতি এবং এর ব্যবহার এমনই হতে হবে যাতে একে প্রয়োজনবোধে নতুন করে পুনরাবৃত্তি করা যায়। গবেষণাকে অবিকল একইভাবে পুনরাবৃত্তি করতে না পারলে তার নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) অনেকাংশে কমে যায়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, কোনো গবেষণা পদ্ধতিকে অবশ্যই এমন হতে হবে যাতে করে একে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব হয়। কারণ এ ধরনের পদ্ধতিগত পুনরাবৃত্তি বিজ্ঞানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এমনকি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকে প্রকাশের জন্য যখন একটি জার্নালে দাখিলা করা হয় তখন এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। একজন ভালো যাচাইকারক (Reviewer) এই বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনা করেন। যাচাইকারক যখন কোনো প্রবন্ধ যাচাই করেন তখন তিনি এই পদ্ধতি উপকরণকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি যদি এক্ষেত্রে মনে করেন যে বর্ণিত পদ্ধতিটিকে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না তখনই সেই প্রবন্ধটি প্রকাশ না করে বরং তা বাতিল করার জন্য তিনি সম্পাদককে লিখতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, এটি একটি প্রথা আইন নয়। ফলে এর ব্যতিক্রম থাকাও অস্বাভাবিক নয়।

একটি উন্নত গবেষণা প্রবন্ধে পদ্ধতিই (Method) হচ্ছে সর্বপ্রথম সেই শিরোনাম বা ধাপ যার মধ্যে উপ-শিরোনাম বা উপধাপ থাকাটা স্বাভাবিক। তবে ভূমিকার মধ্যেও কোনো কোনো সময়ই উপ-শিরোনাম দেখা যেতে পারে। এসব উপধাপের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে গবেষণা পদ্ধতির কৌশলগত বিশ্লেষণ, উপকরণের সংখ্যাগত বিন্যাস, যন্ত্রপাতির ধারাবাকিতা এবং কার্যাদির জন্য পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে গবেষণায় ব্যবহৃত রাসায়নিক ও ধাতুগত উপাদানগুলোর নামের তালিকাও লিখতে হয়। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে এসব দ্রব্যের বাণিজ্যিক নাম লেখা থেকে বিরত থাকতে হয়। বরং এর পরিবর্তে এসব দ্রব্যের রাসায়নিক নাম, জেনেটিক নাম ইত্যাদি ব্যবহার করাই সবচেয়ে উত্তম। এখানে এমন কোনো কথা লেখা বাঞ্ছনীয় নয় যা কোনো বাণিজ্যিক বস্তু বা দ্রব্যের

বিজ্ঞপ্তির মতো প্রকাশ পায়। মনে রাখতে হবে যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশনা বা বাণিজ্যিক গবেষণার প্রকাশনা দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

পদ্ধতি ও উপকরণের মধ্যে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো যে বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ প্রাণীর উপর গবেষণাটি পরিচালনা করা হবে তার জৈবনিক দিকটিকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। তাছাড়া মানুষ বা প্রাণী ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিক ও আইনগত দিকটিও উল্লেখ করতে হবে। আবার যে বিশেষ প্রাণীটি পরীক্ষক হিসেবে ব্যবহার করা হবে তার শ্রেণি, গণ, প্রজাতি, লিঙ্গ, বয়স ইত্যাদিকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হয়। মানব পারীক্ষের (Human subject) উপর গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নির্বাচনের পদ্ধতি বা নমুনায়ন কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা উচিত। এক্ষেত্রে পদ্ধতির পরিসংখ্যানগত দিক বিশ্লেষণ করা হয়। সাধারণত একটি দীর্ঘ বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে, গবেষক এ ধরনের বিশ্লেষণের সাথে সর্বপ্রথম পরিচিত হয়েছেন এবং পাঠকগণও এ ধরনের বিশ্লেষণ ইতপূর্বে লাভ করেন নাই। অবশ্য পরিসংখ্যানের সেই বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলোর কোনো ব্যাখ্যা দরকার নেই যেগুলো অতি পরিচিত এবং সর্বজনস্বীকৃত। যেমন– গাণিতিক গড় (Arithmetic mean), আদর্শ বিচ্যুতি (Standard deviation), সহ-সম্পর্ক (Correlation) ইত্যাদি। তবে খুব বেশি পরিচিত পদ্ধতি না হলে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অবশ্যই দরকার। যেমন– ধরা যাক মিশ্র নকশা বা কম্পিউটার গড়করণের (Computer averaging) ক্ষেত্রে কমবেশি এর পরিচিতি প্রয়োজন। বর্তমানকালে বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি ব্যাপকতা লাভ করায় এর বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন নতুন কলাকৌশল সম্পর্কে অনেকে অবগত নাও থাকতে পারেন। সেকারণেই এসব আধুনিক গবেষণা পদ্ধতির পরিচিতি ও ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ থাকতে হয়। আর এসব পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেবার সময় এর পূর্ববর্তী প্রয়োগ সম্পর্কেও আলোকপাত করা প্রয়োজন। ফলে এই পদ্ধতির পূর্ববর্তী তথ্য নির্দেশ (Reference) থাকতে হয়। এক্ষেত্রে যদি রেফারেন্সটি অপ্রকাশিত হয় তাহলে সে সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। আবার যেখানে বেশ কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে বিশ্লেষণের পরিমাপ কমিয়ে উহাকে তথ্যনির্দেশের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল থাকতে হয়। এভাবে নতুন পদ্ধতি ও পাঠকদের বোধগম্যতার মধ্যে সাম্যাবস্থা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনে একটি ভালো পদ্ধতি ও উপকরণ লিখন বলতে বুঝায় যে, একই ধরনের গবেষণায় নিয়োজিত কোনো গবেষক এই পদ্ধতিটি পড়ে ঠিক একই পদ্ধতিতে আর একটি গবেষণার পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। একটি ভালো পদ্ধতি লিখন বলতে মূলত ইহাকেই বুঝান হয়। এক্ষেত্রে ভাষাগত দিকটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। খুব উন্নত ভাষার দরকার হয় না এক্ষেত্রে। এখানে ভাষাগত

বোধগম্যতাকেই অগ্রাধিকার দিতে হয়। তবে কোনো ভাষাগত ত্রুটি বাঞ্ছনীয় নয় যাতে বাক্যের অর্থে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। অথবা ব্যাকরণগত ত্রুটি থাকে। আর এই পরিবর্তনের ফলে পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তনের আনয়ন করে। যাই হোক, একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, পদ্ধতি লিখন গবেষণা প্রতিবেদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই ধাপের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে গবেষণা কর্মটির বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য, গ্রহণযোগ্যতা ও বোধ্যগম্যতার বিষয়। গবেষণা প্রবন্ধে এসব দিক বিবেচনায় আনা হয়।

সারণি বা তালিকা

Table

গবেষণা প্রবন্ধ তৈরি করার ক্ষেত্রে তালিকা বা সারণি একটি অতি স্বাভাবিক বিষয়। সাধারণত সমালোচনামূলক প্রবন্ধে (Review paper) এ ধরনের সারণি তেমন একটা দেখা যায় না। কিন্তু সরাসরি গবেষণা প্রবন্ধে তালিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাধারণতভাবে মনে হয় যে, এর দ্বারা গবেষণা প্রবন্ধ কল্পনাও করা যায় না। গবেষণা বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সংখ্যার ব্যবহার (Neumerical approach) একটি অপরিহার্য বিষয়। সংখ্যার ব্যবহার ব্যতীত বৈজ্ঞানিক গবেষণা কল্পনাও করা যায় না। আর এ সংখ্যাকে উপস্থাপন করতে হয় ছক বা তালিকার মাধ্যমে। এই তালিকা বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে তালিকার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে যে, ফলাফলের সংখ্যাতাত্ত্বিক উপস্থাপন। তাই তালিকা সাধারণত ব্যবহার করা হয় ফলাফলের (Result) মধ্যে। তালিকার মাধ্যমে সংখ্যাগুলোকে নিয়ম অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয় বলে এক নজরে দেখলে ফলাফল সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা করা যায়। তালিকার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সংখ্যাকে নিয়মমাফিক ও সহজ করে উপস্থাপন (Systematic and simple presentation of data)। আর সে কারণেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে তালিকার ব্যবহার একটি অতি জনপ্রিয় অংশ। যেকোনো প্রবন্ধে স্বাভাবিকভাবেই তালিকা একটি প্রত্যাশিত বিষয়।

প্রায় সব ধরনের তালিকার একটি গাঠনিক চিত্র (Structural figure) আছে। এই গাঠনিক চিত্রেই উপস্থাপিত হয় সংখ্যা বা উপাত্ত। সাধারণত এসব উপাত্ত পরিশালিত তথ্য (Processed data) হিসাবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক উপাত্তকে (Primary data/ raw data) গাণিতিক বা পরিসংখ্যানিক নিয়মে হিসাব-নিকাশ করে তালিকায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এই তালিকার একটি বিস্তারিত শিরোনাম (Caption) থাকে। এই শিরোনামে টেবিলের ভিতরের উপাত্তগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকে। তালিকার সংখ্যাগুলো কোন চলের (Variable) সাথে কোন চলের সম্পর্ক নির্দেশ করেছে এবং এর ফলাফল কী হয়েছে তা শিরোনামে সংক্ষিপ্ত অথচ সহজভাবে

উপস্থাপন করা হয়। তালিকার মধ্যকার সংখ্যাগুলো এমনভাবে দেখাতে হবে যাতে করে স্বাধীন চলের (Independent varible) সাথে সাপেক্ষ চলের (Dependent varible)সম্পর্কটি সহজে প্রকাশ পায়। এই সম্পর্কটির গাণিতিক প্রকৃতি পরিমাপ করাকেই বলে প্রকল্পের সত্যিকার প্রমাণযোগ্যতা। গবেষণা প্রবন্ধে ব্যবহৃত তালিকাকে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝান যাক (Table 3.1)।

Teble 3.1. Effect of nosie componet on the hearing lose.

Previouse hearing Noise componet Later hearing
condition(dB)condition
A70B-1
A80B-2
A90B-3

উপরে উল্লিখিত তালিকাটি (Table 3.1) একটি ক্রটিপূর্ণ তালিকা। কেননা এখানে “Previous hearing conditon” তিনটি ক্ষেত্রেই ধ্রুব (Constant condition) আছে। ফলে একে তালিকায় উপস্থাপনের কোনো যুক্তি বা অর্থ নেই। যদি শর্ত A-কে দেখাতেই হয়, তাহলে তাকে তালিকার শেষে পেতে পারে না। তালিকার বাকি দুটি কলাম সহজেই বোধগম্য। এখানে মাঝের কলামে তীব্রতা (dB) বৃদ্ধির (70, 80, 90) সাথে সাথে ডান পার্শ্বের শ্রবণমাত্রা ‘B’-এর মান কমতে (B-1, B-2, B-3) দেখা যায়। এটা সহজেই বোধগম্য যে, মাঝের কলামের সংখ্যাগুলো স্বাধীন চলের ভূমিকা পালন করেছে। পক্ষান্তরে ডান পার্শ্বের কলামের শ্রবণমাত্রা হিসেবে চিহ্নিত ‘B’-এর মান ক্রমান্বয়ে সরলরৈখিকভাবে (linear) কমেছে। এখানে ‘B’-কে সাপেক্ষ চল বলা যায়। অতএব দেখা যায় যে, উক্ত তালিকায় বামপার্শ্বের কলামটি অপ্রয়োজনীয় ফলে তাকে বাদ দিতে হবে। এভাবে তালিকার যথাযোগ্যতা ও শুদ্ধতাকে বিচার করে প্রবন্ধের জন্য তালিকা তৈরি করা হয়।

এছাড়া যদি এমন কোনো তালিকা দেখা যায় যেখানে স্বাধীন চল বা সাপেক্ষ চল এবং যে কোনোটির ক্ষেত্রেই অথবা উভয়ের ক্ষেত্রে পরস্পর একাধিক শূন্য (০) থাকে তবে তাকে ব্যবহার না করাই ভালো। এছাড়া শতকরা হারের (%) ক্ষেত্রেও যদি পরপর একাধিক ১০০ লেখা থাকে, তাকে বর্জন করা উচিত। কেননা এ দুটি ক্ষেত্রের কার্যকরণ সম্পর্কে (Cause-effect) জটিলতা দেখা দেয়। যা কোনোমতেই গবেষণায় কাম্য হতে পারে না। যে সব তথ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় সেগুলোকে অবশ্যই তালিকা থেকে বাদ দেয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণ হিসাব-নিকাশ ও নিম্নমানের পার্থক্যসূচক ফলাফল তালিকায় উপস্থাপন না করাই কাম্য। অর্থাৎ তালিকা হবে স্বচ্ছ, সংক্ষিপ্ত, সহজে বোধগম্য ও তাৎপর্য। এসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তালিকাকেই ভালো তালিকা হিসেবে ধরে নেয়া যায় এবং একটি ভালো গবেষণা প্রবন্ধে তা কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যায়।

কোনো একটি গবেষণা পরিচালনা করার পর গবেষককে প্রতিবেদন লেখতে গিয়ে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, ফলাফল লেখার জন্য কোনো তালিকা দরকার হবে কিনা। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তাকে ভাবতে হবে যে তালিকা কিভাবে তৈরি করা হবে। প্রাথমিক এই পরিকল্পনা ব্যতীত তালিকা তৈরি করা আদৌ সম্ভব নয়। আর পরিকল্পনা করার সময় তা অবশ্যই বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। তথ্যগুলো তালিকায় কিভাবে উপস্থাপন করা হবে তা প্রথম থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে। তালিকায় তথ্য বসাতে এর মধ্যে দুইটি পথ অবলম্বন করা যায়। এর একটি আনুভূমিক পথ (Horizonatal way) আর একটি হলো উল্লম্ব পথ (Vertical way)। এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, তালিকার চেহারা যদি উল্লম্ব দিকের চেয়ে আনুভূমিক দিকে বেশি প্রশস্ত হয় তাহলে তা দেখতে অনেক ভালো মনে হয়। যদিও এটার কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রহণযোগ্যতা নেই। তবে তথ্যগুলো এমন হয় যে, তালিকার বামদিকে স্বাধীন চলগুলো এবং ডানদিকে সাপেক্ষ চলগুলো থাকে, তাহলে তা একটি আদর্শ তালিকার বৈশিষ্ট্য বহন করে। এর মূল ভিত্তি সাধারণ জ্ঞান ও সরলতা। একই গবেষণার একই তথ্যসমূহকে যে বিভিন্নভাবে তালিকায় উপস্থাপন করা যায় তা তালিকা-৩.২ (Table 3.2) এবং তালিকা ৩.৩ (Table 3.3) থেকে স্পষ্ট বোঝা সম্ভব। এখানে সহজেই বোধগম্য যে, Table 3.2 এর চেয়ে Table 3.3 অধিকতর সহজ, সাবলীল, বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য। আর সে কারণেই আর্ন্তজাতিক মানসম্পন্ন সাময়িকীতে এভাবেই সরল, সাবলীল ও সুন্দর তালিকা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

Table 3.2 Characteristics of antibiotic-producing Streptomyces

DeterminationS. S.griseusS.S.
fluoricolor coelicolor nocolor
Optinal growth-10242892
temp (C) Color of
myceliumTenGrayRed Purple
Anitibiotic
produced Fluoricilling Steptomycin Coelimycin Nomycin
Yield ofmycin
antibiotic
(mg/ml)4.1087820

A There probably was a significant yield, but, to be frank (and that is what science is all about), I dropped and broke the fermentation flask before completing the measuremen.

Table 3.3 Characteristics of antibiotic-producing Streptomyces

OrganismOptimalColor ofAntibioticYield of
growthmyceliumproducedantibiotic
temp(°C)(mg/ml)
S. fluoricolor -10 Ten Fluoricillinmyci 4,108
n
S. griseus 24GraySteptomycin 78
S. coelicolor 28RedCoelimycin 2
S. nocolor 92PurpleNomycin 0
A Oops. Dropped it again.

উপরে উল্লিখিত ফলাফলের তালিকা দুটির মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করে দেখা যায় যে তালিকা ৩.২ এর চেয়ে তালিকা ৩.৩ বেশি সুন্দর ও সহজবোধ্য। আর সে কারণেই তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ,

(ক) দ্বিতীয় তালিকাটি বোধগম্যতার ক্ষেত্রে অধিকতর সহজ। একে এক নজর দেখলেই বোঝা যায়।

(খ) দ্বিতীয় তালিকাটি বেশি ঘনীভূত বলে ছাপার ক্ষেত্রে স্থানের তথা খরচেরও সাশ্রয় হয়।

(গ) এই তালিকাটি (৩.৩)-তে স্বাধীন চলের সাথে সাপেক্ষ চলের কার্যকরণ সম্পর্কে সহজেই বোধগম্য হয়।

তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে আর একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। তাহলো তালিকাতে রেখা টানা অর্থাৎ ছক আকার বিষয়টি। আধুনিককালে প্রকাশিত প্রবন্ধে সাধারণত একটি ভালো ও সুন্দর তালিকা তৈরিকরণে কোনো উল্লম্ব রেখা (Vertical line) আঁকা হয় না। কেবলমাত্র উপরে লেখা শিরোনামগুলোকে দুটি আনুভূমিক লাইন এঁকে আটকাতে হবে এবং তালিকার শেষেও একটি লাইন থাকবে। সুন্দর তালিকার লাইন টানতে হবে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে তালিকা ৩.২ এবং তালিকা ৩.৩। এছাড়া তালিকার উপরে যে শিরোনাম লেখা হয় তা অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। উল্লেখ্য যে, একটি ভালো শিরোনাম কখনই একটি পূর্ণাঙ্গ লাইন হবে না। আর সেকারণেই এর শেষে সাধারণত কোনো ফুলস্টপ (.) দেয়া হয় না। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, শিরোনামের ভাষা পূর্ণাঙ্গ বাক্যের মতো হওয়া উচিত নয়। উপরের উদাহরণ দুটি দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তালিকায় অবশ্যই নম্বর দিতে হবে। আর নম্বর দিতে হবে ধারাবাহিকভাবে এবং তা দিতে হবে শিরোনামের অগ্রভাগে। যদি প্রবন্ধের অধ্যায়গুলোতে নম্বর দেখা থাকে তাহলে তার সাথে তালিকার নম্বরের

সামঞ্জস্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি অধ্যায় নম্বর ৫ হয়, তাহলে এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত তালিকাগুলোর নম্বর হবে ৫.১, ৫.২, ৫.৩ ইত্যাদি।

অনেক সময় তালিকায় 'ফুট নোট' ব্যবহার করা হয়। তালিকায় উপস্থাপিত কোনো কোনো তথ্য সহজে বোঝার জন্য এসব তথ্যের তাৎক্ষণিক ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকা দরকার। তাই সংক্ষিপ্ত এ ব্যাখ্যা সাধারণত তালিকার নিচে দেয়া হয় (উদাহরণ ৩.২ এবয় ৩.৩ দ্রষ্টব্য)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এব্রিভিয়েশনের ব্যাখ্যা বা অর্থ এখানে দেয়া থাকে। তবে ফুট নোট না লিখে যদি বোধগম্য তালিকা তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহলে তাই হবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অনেক সময় তালিকার মূল শিরোনামটি 'বোল্ড' করা হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে করা হয় 'ইটালিক'। আবার অনেক ক্ষেত্রে 'ফুট নোট' ইটালিক করতে দেখা যায়। তাছাড়া 'ফুট নোট' এর আকার ছোট (Small size) করাও হয় অনেক জার্নালে। যাই হোক মূল কথা হচ্ছে কোন বিশেষ জার্নালে কোন বিশেষ ধরনের নিয়মে মেনে চলে তা পূর্ব থেকে জেনে নেওয়াটাই ভালো। আর তা জানতে হলে ঐ জার্নালের নিদের্শাবলি (Instruction to the authors) পড়তে হবে। এছাড়া সম্ভব হলে ঐ জার্নালের সাম্প্রতিক প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ উদাহরণ হিসেবে অনুকরণ করাও যেতে পারে।

সমীকরণ

Equation

প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে অনেক সময় সমীকরণের ফলাফল উপস্থাপন করতে হয়। গণিত শাস্ত্র ও পর্দাথবিদ্যায় যে প্রচুর পরিমাণে সমীকরণের ব্যবহার রয়েছে একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিজ্ঞানের বা সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের গবেষণাতেও সমীকরণ ব্যবহার কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। তবে, সমীকরণ লেখার তেমন কোনো স্থান নির্ধারণ করা নেই। কারণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভূমিকাতে পূর্ববর্তী গবেষণা আলোচনা করতে গিয়ে ঐ সব গবেষণায় ব্যবহৃত সমীকরণ ব্যবহার করা হয়। তবে সমীকরণের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় ফলাফল এর মধ্যে। এক্ষেত্রে উপাত্ত বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করার পর নতুন সমীকরণ তৈরি করা হয়ে থাকে। আবার সারাংশ (Summary) ও বস্তুসংক্ষেপের (Abstract) মধ্যেও সমীকরণ উল্লেখ করতে হয়। এছাড়া পরিশিষ্টের (Appendix) মধ্যেও অনেক সময় সমীকরণ উল্লেখ থাকে। অতএব দেখা যায় যে, গবেষণা প্রতিবেদনে সমীকরণের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। ইহা প্রতিবেদনের বিভিন্ন স্তরে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলাফলের মধ্যে অথবা অন্য কোথাও যখন সমীকরণ উল্লেখ করা হয় তখন সমীকরণটির একটি নম্বর দেয়া হয়। তালিকা ও গ্রাফের মতোই সমীকরণে নম্বর থাকে। সমীকরণের নম্বরটি দিতে হয় সমীকরণের ডান দিকে (নিম্নের

সমীকরণ 3.1 দ্রষ্টব্য)। তবে বস্তুসংক্ষেপে যদি সমীকরণের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে নম্বর প্রদানের প্রয়োজন নেই। একটি প্রতিবেদনের মধ্যে যতগুলো সমীকরণ ব্যবহার করা হয় সবগুলোর একই ধারাবাহিকতায় নম্বর দেয়া যায়। যেমন 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো জার্নাল সমীকরণের নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে অন্য নিয়ম মেনে চলে। এক্ষেত্রে যদি সমীকরণটি ফলাফলের অন্তর্গত হয় এবং যদি ফলাফলের নম্বর থাকে ৫, সেক্ষেত্রে সমীকরণগুলো নম্বর হবে, 5.1,5.2, 5.3, 5.4 ইত্যাদি। আর যদি ভূমিকাতে সমীকরণ থাকে এবং যদি ভূমিকার সামনে. নম্বর থাকে (1), সেক্ষেত্রে সমীকরণের নম্বরগুলো হবে 1.1, 1.2, 1.3 ইত্যাদি। কিছু কিছু জার্নালে এই নম্বর ব্রাকেট বন্দি থাকে ((1.2))। তবে আর একটি নিয়ম বহুল প্রচলিত আছে। তা হচ্ছে, যদি সমীকরণ লেখা হয় পরিশিষ্টে (Appendix) তাহলে এখানকার সমীকরণগুলোর নম্বর একটু অন্যভাবে দিতে হয়। সেক্ষেত্রে এই নম্বরগুলোর ধরন হবে A-1, A-2, A-3 ইত্যাদি। নিচে সমীকরণ লেখার একটি সাধারণ নিয়ম দেখান হলো-

$$P\,(i > j) = \sum y(3\frac{1F}{F}$$

Where, Y = responds to a prefernce of i overj.

yi = yj = =0.5 (i = j)

Whgile, yi = 0 corresponds to a prefernce of j iover i.

উপরের সমীকরণটিতে দেখা যায় যে, এর বিভিন্ন সংকেতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এটা সমীকরণ লেখার একটি সাধারণ নিয়ম। তবে প্রতিবেদনে লিখিত সমীকরণের সংকেতগুলো প্রতিবেদনের ভিতর লেখা থাকে বলে, সাধারণত এভাবে নিচে উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি পূর্ব থেকে উল্লেখ না থাকে তাহলে এভাবেই লিখতে হবে। তবে সমীকরণে ব্যবহৃত সংকেতগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যা দেয়া বাধ্যতামূলক। তা সে তার নিচেই হোক বা প্রাসঙ্গিক অন্য কোথাও হোক।

উপসংহার

Conclusion

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা গবেষণা প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে আর একটি ধাপ হচ্ছে উপসংহার। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উপসংহার লেখার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে সাময়িকী বা জার্নালের নিজস্ব একটি নিয়ম মাত্র। জার্নালের এসব নিয়ম অবশ্যই লিখিত থাকে। অর্থাৎ কোনো কোনো জার্নালে দেখা যায় যে, উপসংহারকে আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার কোনো কোনো জার্নালে আলোচনার

পর আলাদাভাবে লেখা হয়। অনেক জার্নালে এই উপসংহার কথাটি ব্যবহার না করে সেক্ষেত্রে শিরোনাম হিসেবে সারাংশ (Summary)শব্দটিকেও ব্যবহার করতে দেখা যায়। অবশ্য এসবই নির্ভর করে নিজস্ব নীতিমালার উপর।

যে সব জার্নালে কেবলমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই উপসংহারের কাজ সেরে ফেলা হয়, সেক্ষেত্রে আলোচনার ব্যাপ্তিও হয় অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। এখানে আলোচনার শেষের দিকে আলাদা প্যারায় উপসংহারের কাজ শেষ করতে হয়। আলোচিত বিষয়কে ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত ও সংকুচিত করে আনা হয় । অতএব প্রয়োজনমতো এক বা একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তগুলো লেখার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারেও হতে পারে, আবার সংখ্যার ক্রমানুসারেও প্রকাশ করা যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকে ঘনীভূত করে গাণিতিক সূত্রের সাহায্যেও প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে গাণিতিক সমীকরণ অধিকতর বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ হিসেবে কাজ করে বিধায় ইহাকে উপসংহার হিসেবেও প্রকাশ করা যেতে পারে।

আবার যেখানে উপসংহারকে আলোচনা থেকে আলাদা করা হয় সেখানে উপসংহার আলোচনা থেকে একটি আলাদা প্যারা হিসেবে বিবেচিত। তাই, শুরুতে পূর্বের আলোচনার রেশ ধরেই লেখা আরম্ভ করতে হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আলোচনার ধারাবাহিকতায় উপসংহার লিখতে হয়। আলোচনার মধ্যকার উপসংহারের চেয়ে এই আলাদা উপসংহারটি কিছুটা বড় ধরনের হতে পারে। তাছাড়া অন্য সবদিক থেকে এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উপসংহার হচ্ছে আলোচনার একটি ঘনীভূত রূপ। অর্থাৎ পূর্বেকার ভূমিকা, পদ্ধতি, ফলাফল ও আলোচনাকে অতি সংক্ষেপে এমনভাবে উপসংহারে ফুটিয়ে তোলা হয় যাতে করে খুব সহজেই গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। এটাই প্রবন্ধকারের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ। উপসংহারের আর একটি বৈশিষ্ট্য বেশ উল্লেখযোগ্য। তা হচ্ছে যে, কোনো একটি গবেষণার ফলাফল পরবর্তীতে আরও গবেষণার ইঙ্গিত বহন করে কিনা তা উপসংহারে স্পষ্ট হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে সরাসরি লিখিত না হলেও উপসংহার পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, এই ফলাফল ও সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে কোন ধরনের গবেষণার দিক নির্দেশ করে। আবার এমনও হতে পারে, কোনো গবেষণার ফলাফল এমন যে, তা থেকে পরবর্তীতে অন্য কোনো গবেষণা করার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তাহাও উপসংহারকে মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে সহজেই বোধগম্য হয়। যদিও এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে বিস্তারিত উপসংহারে সরাসরি উল্লেখ থাকে না।

তথ্যনির্দেশ

Reference

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে 'তথ্যনির্দেশ' উল্লেখ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তথ্য নির্দেশ উল্লেখ নেই এ ধরনের গবেষণা প্রবন্ধ খুঁজে পাওয়া ভার। এই তথ্যনির্দেশের মাধ্যমে বর্তমান গবেষণা ও পূর্ববর্তী গবেষণার সাথে সেতুবন্ধ রচনা করে। অট্টালিকা যেমন এক তলার উপর আর একতলা করে গড়ে উঠে তেমনি তথ্যনির্দেশে দুটি গবেষণা কর্মের মধ্যে কলামের কাজ করে। তাই গবেষণায় এর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান গবেষণাটি অথবা গবেষণার যে অংশটি গবেষণার ধারাবাহিকতা, পূর্ববর্তী সেই গবেষণার পরিচয় প্রদানকেই বলে তথ্যনির্দেশ। অতএব বলা যায় যে, তথ্যনির্দেশ হচ্ছে কোনো গবেষণা বা কোনো প্রকাশনার ঠিকানা অথবা পরিচয়। অর্থাৎ প্রকাশনাটিকে সংক্ষেপে এমনভাবে প্রকাশ করতে হয় যাতে সহজেই একে খুঁজে বের করা যায়। কোনো প্রকাশনার এই পরিচয় বা ঠিকানাটি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। দুই, তিন বা চার লাইনের এই তথ্যনির্দেশ বা ঠিকানা থেকে প্রকাশনাটিকে খুঁজে বের করা যায়। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রকাশনা থাকা সত্ত্বেও এই তথ্যনির্দেশ অনুযায়ী কোনো প্রকাশনাকে সহজেই খুঁজে বের করা যায়। ফলে দেখা যায় যে, তথ্যনির্দেশ ব্যবহার না করলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাটির ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া অন্যান্য সাদৃশ্য গবেষণাগুলোর সাথে এর পারস্পরিকতা রক্ষা করার জন্যও তথ্যনির্দেশ উল্লেখ্য করা দরকার। অর্থাৎ তথ্য নিদের্শ একদিকে ইতিহাস এবং অন্যদিকে সম্পর্ক উল্লেখ করে।

তবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তথ্য বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। প্রায় সকল ধরনের জার্নালের ব্যবহৃত তথ্য নির্দেশগুলো একটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু জার্নালভেদে এদের মধ্যে তারতম্য বিদ্যমান। এক এক জার্নালে এক এক ধরনের নিয়ম মেনে চলে। কোনো একটি জার্নালে কী ধরনের তথ্যনির্দেশ কেমনভাবে লেখা হবে সে সম্পর্কিত নির্দেশাবলি (Instruction) উল্লেখ করে থাকে। এই নির্দেশাবলির মধ্যে একটি স্থানে তথ্য নির্দেশ কিভাবে লিখতে হবে সে সম্পর্কে উদাহরণসহ বিস্তারিত উল্লেখ থাকে। অতএব যখন কেউ একটি প্রবন্ধ কোনো একটি বিশেষ জার্নালে প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপি (Manuscript) তৈরি করে তখন সে ঐ জার্নালের লিখিত নিয়ম অনুযায়ী তথ্যনির্দেশ ঠিক করে। সম্ভব হলে উক্ত জার্নালের কোনো একটি প্রবন্ধ উদাহরণ হিসেবে অনুসরণ বিষয়টি আরও সহজ হয়। তথ্যনির্দেশ লেখার এই নিয়ম একই জার্নালে হুবহু একই রকমের হতে হবে।

কিন্তু এখানে একটি সমস্যা প্রায়ই পরিলিক্ষিত হয়। তাহলো একটি বিশেষ জার্নালের নিয়ম অনুযায়ী তথ্যনির্দেশ লিখতে গিয়ে এর সব অংশ নাও পাওয়া যেতে পারে।

বিশেষ করে যখন ইহাকে কোনো দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস (Secondary source) থেকে নেয়া হয়। কারণ এই উৎসে উল্লিখিত নিয়মটি অন্যরকম হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি জার্নালের নিয়ম অনুযায়ী ভলিউম উল্লেখ করা না থাকে। এই সমস্যা দূর করার জন্য যথাসম্ভব প্রাথমিক উৎস (Primary source) থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে (M.0' Connor, Br. Med. J. 1 (6104): 31, 1978)। রেফারেন্স বা তথ্য নির্দেশ লেখার ক্ষেত্রে এদের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী ধারাবাহিকতা মেনে চলা হয়। এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই ধারাবাহিকতা প্রধানত দুই রকমের হতে পারে। যথা–

(ক) সংখ্যাতাত্ত্বিক ধারাবাহিকতা (Neumerical order) : গবেষণা প্রতিবেদনে ভূমিকা থেকে শুরু করে অন্যান্য স্থানে যে তথ্যগুলো ব্যবহার কথা হয়, সেখানে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যা দেয়া হয়। এই সংখ্যার ব্যবহার অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে ১, ২, ৩ ইত্যাদি হয়ে থাকে। কোনো একটি তথ্য উল্লেখ করার পর এর শেষে নম্বরটি লিখতে হয়। উদাহরণস্বরূপ "বামহাতিরা (Left handed) শিল্পকলায় ভালো করে (২)"। অথবা লেখা যায়, "বামহাতিরা শিল্পকলায় ভালো করে২"। এ ধরনের তথ্যনির্দেশ-এ '২' নম্বরে উল্লেখ্য করতে হবে পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্সটি।

(খ) আক্ষরিক ধারাবাহিকতা (Alphabilical order) : এক্ষেত্রে তথ্যটি উল্লেখ করার পর লাইনের শেষে রেফারেন্সটির লেখকের (লেখকদের) নাম ও সাল উল্লেখ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ "বামহাতিরা শিল্পকলায় ভালো (John, M, 1972)।" এই রেফারেন্সটি তথ্যনির্দেশের স্থানে এর আদ্যাক্ষরের (J) ধারাবাহিকতা অনুযায়ী লেখা হয়। এই নিয়মটিকে বলা হয় " Harvard System "। এটি খুবই জনপ্রিয় পদ্ধতি। কারণ কোনো নতুন রেফারেন্স প্রতিবেদনে স্থাপন করা বা অন্য কোনোটিকে বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিই সহজ উপায়। উপরের পদ্ধতিতে এসব প্রতিস্থাপন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা সেক্ষেত্রে একটি নম্বর পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্য সকল নম্বরকে পরিবর্তন করতে হয়। আর সে কারণেই এই নিয়মটি বর্তমানে বহুল প্রচলিত একটি নিয়ম।

আবার যদি একই প্রতিবেদনে একই লেখকের (Author), একই সালে একই গবেষণা সাময়িকীতে প্রকাশিত একাধিক রেফারেন্স উল্লেখ থাকে তাহলে সেখানে সনাক্তকরণের জটিলতা দেখা দেয়। এই জটিলতার দূর করার জন্য লেখকের নামের পরে সালের সাথে অক্ষর ব্যবহার করে আলাদা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ John. M. and Green, p. (1995a) Ges M. and Green, p. (1995a) ইত্যাদি।

কোনো কোনো জার্নালে অনেকগুলো লেখকের নাম সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম লেখকের নামটি লিখে তারপরও et.al. ব্যবহার করা হয়, যার অর্থ 'অন্যরা'। অর্থাৎ এখানে আরও লেখকের নাম আছে। উদাহরণস্বরূপ, John, M. et al. 1995। সাধারণত লেখকদের নামের দীর্ঘ তালিকা সংক্ষিপ্ত করার জন্যই লেখকদের নাম কমিয়ে এভাবে লেখা হয়ে থাকে।

রেফারেন্স লেখার সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবন্ধের শিরোনাম (Title) লেখা হয় না। কোথাও বা জার্নালের নাম সংক্ষেপে লেখা হয়। অন্য পদ্ধতিতে সাল প্রথমে অথবা শেষে লেখা হয়। সাধারণত জার্নালের নাম এবং বই-এর ক্ষেত্রে প্রকাশকের নাম ইটালিক ধরনের করা হয়। তবে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করে রেফারেন্স লেখাই সবচেয়ে ভালো। যদিও লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ জার্নালটির নিয়ম আমাদের মেনে চলতেই হয়। এখানে বহুল প্রচলিত কয়েকটি নিয়ম নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

Kazi saifuddin and Yoichi Ando (2001). Duration Sensation when Listening to Bandpass Noises in a Room. Journal of Temporal Design in Architecture and the Environmen. ১(১) ২৭-৩২. লাইনটি বেশি দীর্ঘ হওয়ায় ইহাকে ছোট করার এভাবে লেখা হয়–

K. Saifuddin and Y. Ando, 2001. Duration sensation when listening to bandopass noises in a room. J. Temp. Dign. Archt. & Envr. 1(1) 27-32.

Saifuddin, K. and Ando, Y, J. Temp. Dign. Archt. & Envr.v 2001, ১(১), ২৭-৩২ লেখা যায়–

আবার রেফারেন্স হিসেবে যখনই বই-এর নাম ব্যবহার করা হয়, তখন নিম্নলিখিত নিয়ম ব্যবহার করা যায়–

Booth, U, 1978. Writing a Scientific Paper, 4th ed. the Biochemical Society, London

Garfild, E. 1977. Easy of an Information Scientist, 2 Vol. ISI press, Phi;adelphia

তথ্যনির্দেশ বা রেফারেন্স লেখার কয়েকটি নিয়মের উপরে উদাহরণস্বরূপ দেখান হলো। এক্ষেত্রে দেখা যায় লেখকের নাম, বছর, প্রবন্ধের নাম বা বই-এর নাম, জার্নালের নাম বা প্রকাশকের নাম বা সম্পাদকের নাম, ভলিউম, পৃষ্ঠা নম্বর এবং প্রকাশনার স্থান বিভিন্নভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে। অতএব এই রেফারেন্স লেখার সময় প্রবন্ধ দাখিল করা হবে এমন জানালটির প্রচলিত নিয়মটি ভালোভাবে দেখে নিতে হবে। কেননা রেফারেন্স লেখার ক্ষেত্রে এক জার্নালের সাথে অন্য জার্নালের পার্থক্য অনেক।

পরিশিষ্ট

Appendix

অভিসন্দর্ভ (Thesis) বা প্রবন্ধ (Paper) লেখার ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পরিশিষ্ট লিখতে হয় প্রবন্ধের একেবারে শেষে। অর্থাৎ তথ্য নির্দেশ লেখার পর কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট এর কলেবর অনেক বড় হতে দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, পরিশিষ্টে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেগুলো প্রবন্ধ

লেখার বা সরাসরি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে থিসিসকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হলে পরিশিষ্টের দরকার হয়। গবেষণা করার সময় প্রাপ্ত কতগুলো তথ্য বা উপাত্ত যা সরাসরি প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় না সেগুলোকেই লেখা হয় পরিশিষ্টে। ধরা যাক প্রাথমিক উপাত্তের কথা (Raw data)। একটি সুন্দর প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে এসব প্রাথমিক উপাত্তের দরকারই হয় না। তবে যদি এই প্রাথমিক কলেবর অনেক বড় হয় তাহলে তাকে পরিশিষ্টে উল্লেখ করার দরকার নেই। এসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপাত্ত ও চূড়ান্ত ফলাফল (Final result) যা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে এই দুটির মাঝখানের কোনো স্তরকে পরিশিষ্টে অর্ন্তভুক্ত করা যায়।

একথা অবশ্যই মনে রেখে প্রবন্ধ লিখতে হবে। পাঠক যেন পরিশিষ্ট বাদেই প্রবন্ধটি বুঝতে পারেন। সাধারণত পরিশিষ্ট প্রয়োজন হয় তাদেরই জন্য যারা প্রবন্ধের অতি গভীরে যেতে চায়। যারা এই গবেষণাটিকে কেন্দ্র করে আরও গবেষণা করতে চায় তাদের জন্য অবশ্যই পরিশিষ্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানা দরকার। প্রবন্ধের সাধারণ বিশ্লেষণে (General review) মূলত এই পরিশিষ্টের কোনো দরকার হয় না। এক কথায় পরিশিষ্ট একধরনের অতিরিক্ত বিষয়বস্তু বা Resurve task হিসেবে বিবেচিত হয়।

কোনো কোনো সময় পরিশিষ্ট অনেক বড় হয় অথবা ভিন্ন রকম হতে পারে। সেক্ষেত্রে একে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা ভালো। এসব অধ্যায়ে শিরোনাম ব্যবহার করা হয়। আর এসব শিরোনামের ধরন কিছুটা অভিনক। যেমন Appendix-A, Appendix-C, Appendix-C ইত্যাদি। থিসিস বা অভিসন্দর্ভ লেখার ক্ষেত্রে যে সূচিপত্র লিখতে হয়ে সেখানেও এভাবে উল্লেখ করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই শিরোনাম সংক্ষেপে App-A, App-B, App-C অথবা Appendix-I, Appendix-II, Appendix-III ইত্যাদি ভাবেও লিখতে দেখা যায়।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, লেখকগণ তাঁর নিজের প্রবন্ধ বা অভিসন্দর্ভের এই পরিশিষ্ট লেখার সময় অবশ্যই যত্নবান হবেন। কেননা অপ্রয়োজনীয় কোনো বিষয় যুক্ত করার বিষয়কেও এখানে উপস্থাপন না করে বরং এদেরকে ফলাফলে উপস্থাপন করতে হতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, পরিশিষ্টের বিষয়গুলো যথাযথভাবে সনাক্ত করা বেশ কঠিন কাজ। একটা গবেষণার প্রাথমিক উপাত্ত ও তার বিশ্লেষণ প্রচুর পরিমাণে থাকতে পারে। তাই এগুলোকে সব পরিশিষ্টে স্থান দেয়া যাবে না। কেবল সামনে ও পেছনের মধ্যে সেতুবন্ধ রক্ষা করতে সক্ষম এবং যেগুলো ফলাফলকে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে কেবলমাত্র সেগুলোকেই উপস্থাপন করতে হবে। অতএব পরিশিষ্ট লেখার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়
গবেষণা
PAPER PUBLICATION

পাণ্ডুলিপি তৈরিকরণ
Manuscript Preparation

গবেষণা প্রবন্ধ জার্নালে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হচ্ছে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ। একটি ভালো পাণ্ডুলিপি তৈরি করার পর তাকে জার্নাল অফিসে সম্পাদকের কাছে প্রেরণ করতে হয়। একটি ভালো পাণ্ডুলিপি যেমন তেমন ভাবে তৈরি করা যায় না। পাণ্ডুলিপি তৈরিকরণের কিছু নিয়ম আছে। অবশ্য এসব নিয়ম-কানুন কেমন হবে তা নির্ভর করে জার্নালের নির্দেশনার উপর। তাই এক এক ধরনের জার্নালের পাণ্ডুলিপি এক এক রকমের হয়ে থাকে। তবে পাণ্ডুলিপির কতগুলো সাধারণ নিয়ম রয়েছে, যা সকল জার্নালের জন্য প্রযোজ্য। যেমন– সুন্দর করে টাইপ করা বা কম্পিউটার কম্পোজ করা, বানানো ভুল না থাকা, গ্রামারে ভুল না থাকা, সহজবোধ্য ভাষা ব্যবহার করা ইত্যাদি। এগুলো যে কোনো পাণ্ডুলিপির জন্যই অন্যতম শর্ত। এ ধরনের কোনো ভুল থাকলে সে পাণ্ডুলিপি রিভিউ করা হয় না। বরং শুরুতেই তা ফেরত পাঠিয়ে দেবার সম্ভাবনা থাকে। বেশিরভাগ বিখ্যাত জার্নালের আরও কিছু নিয়ম থাকে। যেমন– পাণ্ডুলিপির লাইনগুলো ফাঁকা ফাঁকা (Double space) হবে। কাগজের এক পার্শ্বে লেখা হবে এবং অন্য পার্শ্বে ফাঁকা থাকবে। এছাড়া দুই বা তিন সেট কপি পাণ্ডুলিপি পাঠাতে হয়। এসব দিকগুলো বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য পাণ্ডুলিপি শেষবারের মতো ভালো করে দেখে নেয়া ভালো। নির্দেশাবলির প্রতিটি লাইন ভালো করে দেখে নিয়ে সে অনুযায়ী পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। সম্ভব হলে ঐ জার্নালের কোনো একটি কপি দেখে তা মিলিয়ে নিলেই ভালো হয়। তবে, উদাহরণ হিসেবে অনুকরণ করার জন্য নির্বাচিত কপিটি যতবেশি সাম্প্রতিক হবে তা ততই বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। সাধারণত ফুটনোট এড়িয়ে যাওয়া ভালো। কেবলমাত্র লেখকদের পরিচিতির জন্য প্রয়োজন হলে ফুটনোট ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাণ্ডুলিপির একটি কভার পেজ থাকে। এটাই প্রথম পৃষ্ঠা। এই পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র শিরোনাম ও লেখকদের নাম ঠিকানা লেখা থাকে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় থাকে বস্তুসংক্ষেপে (Abstract)। অধিকাংশ জার্নালেই ২০০ শব্দের মধ্যে বস্তুসংক্ষেপ লিখতে নির্দেশনা

দিয়ে থাকে। এরপর তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকেই শুরু করে ভূমিকা লেখা। ভূমিকার প্রতিটি অংশ ধারাবাহিকভাবে চলে যাবে। কিন্তু এরপর পদ্ধতি ফলাফল, আলোচনা ও তথ্যসূত্র লেখার ক্ষেত্রে নতুন পৃষ্ঠা থেকে শুরু করাই ভালো এবং এদের অন্তর্ভুক্ত সাব টাইটেলগুলো ধারাবাহিকভাবে চলে যাবে। তথ্যসূত্র লেখার পর আলাদা পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট (Appendix) লিখতে হবে। এভাবে প্রতি পৃষ্ঠা অনুযায়ী সুন্দর করে সাজিয়ে পাণ্ডুলিপি তৈরি করা প্রয়োজন।

প্রবন্ধের চিত্র ও টেবিল সম্পূর্ণ আলাদা পৃষ্ঠায় দিতে হবে এবং এসব পৃষ্ঠা আলাদাভাবে পাণ্ডুলিপির পেছনে থাকবে। এছাড়া এইসব চিত্র ও টেবিলের পরিচিতিগুলোও (Legend) আলাদা কাগজে করে পাণ্ডুলিপির সর্বশেষে লাগিয়ে দিতে হবে। চিত্রগুলোকে বড় আকারে করতে হয়। সাথে সাথে এদের লেখাগুলোর আকারও (font) বাড়িয়ে এদেরকে বড় করতে হয়। প্রবন্ধটি যখন মুদ্রণ করা হয় তখন এই চিত্রগুলোকে ছোট করে (Enclosiure) স্থাপন করা হয়। পাণ্ডুলিপির লেখা সাধারণত ১২ পয়েন্টে লেখা হয়। তাছাড়া পাণ্ডুলিপির কাগজের আকার হবে অ-4 আকৃতির।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বস্তুসংক্ষেপটি ইটালিক (বাঁকা করে) করে দিতে হয়। এছাড়া চিত্র ও তালিকার লিজেন্ডগুলোও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইটালিক করে দিতে হয়। এছাড়া তথ্যসূত্রে উল্লিখিত জার্নালের নাম ও প্রকাশকের নাম ইটালিক করতে হবে। প্রবন্ধের শিরোনাম ও অন্যান্য হেড লাইন বোল্ড করে দিতে হয়। এটা প্রকাশনার সাধারণ নিয়ম। লেখার ক্ষেত্রে চার পার্শ্বে যথেষ্ট মার্জিন রাখতে হবে। উপরে ও বামে থাকবে বেশি খালি জায়গা।

এভাবে দেখা যায় যে, একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ একটি ভালো জার্নালে তৈরি ভালো না হলে, নিখুঁত না হলে আর্দশ (Standard) না হলে– এক কথায় প্রথাগত না হলে তা প্রকাশের জন্য গ্রহণযোগ্য হয় না। ফলে তা লেখকদের কাছে ফেরত পাঠান হতে পারে।

পাণ্ডুলিপি দাখিল

Manuscript Submission

ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, একটি গবেষণা প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কিভাবে তৈরি করা হবে। এখন দেখা যাক এই পাণ্ডুলিপিটি কিভাবে জার্নাল অফিসে দাখিল বা প্রেরণ করা যায়। অবশ্য একথা বলাবাহুল্য যে, কোন পাণ্ডুলিপি কোন বিশেষ জার্নালে প্রকাশ করা হবে তা পূর্বে থেকেই ঠিক করে নিতে হয়। কোন ধরনের বিষয়বস্তু কোন জার্নালের বিষয়বস্তুর সাথে সংগতিপূর্ণ তা সবার আগেই ঠিক করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধের সাথে জার্নালের মূলনীতির অপ্রাসঙ্গিকতা এড়িয়ে চলতে হবে।

প্রত্যেক জার্নালের নিজ নিজ নিয়ম অনুযায়ী পাণ্ডুলিপি তৈরি করার পর তা প্রকাশের জন্য যথাযথ অফিসের ঠিকানায় দাখিল করতে হয়। এক্ষেত্রে কয়খানা পাণ্ডুলিপি পাঠাতে হবে তা ঐ জার্নালের নিয়ম দেখে নিতে হবে। বেশির ভাগ জার্নালের নিয়ম হচ্ছে তিন (৩) সেট পাণ্ডুলিপি প্রদান করা। এদের মধ্যে এক সেট হচ্ছে সরাসরি কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করা এবং অন্য দুটি এ থেকে ভালো করে ফটোকপি করে নেয়া। এক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপির উপর টাগ লাগিয়ে যথাক্রমে 'মূলকপি' ও 'ডুপ্লিকেট কপি' উল্লেখ করে দিতে হয়। বর্তমানকালে কেবলমাত্র কাগজে ছাপান পাণ্ডুলিপি পাঠানই যথেষ্ট নয়। বরং এর সাথে কম্পিউটারের 'ফ্লপি ডিস্ক' অথবা সিডি অথবা পেন-ড্রাইভ পাঠাতে হয়।

এটা বলাই বাহুল্য যে, এসব পাণ্ডুলিপি কোনো একটি খামের মধ্যে পাঠাবার ক্ষেত্রে একটি ফরোয়ার্ডিং লেটার দিতে হয়। এই লেটারে প্রধান সম্পাদকের বরাবর প্রবন্ধটি পাঠিয়ে তা প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ থাকতে হয়। এরূপ একটি নমুনা ফরোয়ার্ডিং পত্র নিম্নে দেয়া হলো–

To
The Editor-in-Chief
Journal of Sound and Vibration
Institute of Sound and Vibration
Unviersity of Southampton
Southampton SO17 IBT
England

Subject : Paper submission for publication.
Enclosed, please find the manuscript entitled as "Duration Secnsation of the Simulated Environmental Nosie in Relation to its Autocorrelation Function" by Kazi Saifuddin et al. Three sets of manuscript along with a floppy disk also submitted, herewith.
We hope that theme of the paper is well fit to that of the demand of the Journal. Your early respons will be highly apprexiated.
I look forward to hearing from you.
Sincerely yours,
(Sign)
Kazi Saifuddin
Please send notice to :
Kazi Saifuddin
Department of Global Development Science
Graduate School of Science & Technology
Kobe University
Nada-Ka
Kobe 657-8501

Japan
Phone:
Fax :
E-mail:

এভাবে একটি কভার লেটার লিখে তাতে সই করে এবং সাথে সাথে পাণ্ডুলিপিগুলো একটি ফ্লপি ডিস্কসহ খামে ভরে যথাযথ ঠিকানা উল্লেখপূর্বক পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে ফেরত ঠিকানাও খামের উপর দিতে হবে। সাধারণত এয়ার মেইলে পাঠাতে হয় এসব কাগজপত্র। তবে সাধারণ মেইলে পাঠাবার সময় যদি তা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে হয় তাহলে খামের উপর অবশ্যই লিখতে হয় 'First Class Mail'। এছাড়া মেইল সাধারণত অনেক বেশি দেরি করে।

পাণ্ডুলিপি এয়ার মেইল পাঠাবার পর তা ঠিকমতো গৃহীত হয়েছে কিনা তা জানা দরকার হয়। অতএব মেইল পাঠাবার অন্তত দু'সপ্তাহ পর ফোন করে হোক বা ই-মেইল হোক, তা জেনে নেয়া দরকার যে, জার্নালের কৃর্তপক্ষ এয়ার মেইলটি ঠিকমতো পেয়েছে কিনা।

পাণ্ডুলিপি সংস্করণ

Manuscript Review

গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য এর পান্ডুলিপি জানাল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবার পর জানাল কর্তৃপক্ষ ফলাফল প্রদান করেন। এরূপ ফলাফল কয়েক সপ্তাহে, অথবা কয়েক মাস এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বছরাধিক সময় লাগতে পারে। তবে, সময় যাই লাগুক না কেন সম্পাদক কর্তৃক প্রেরিত ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত এই ফলাফল তিন রকমের হতে পারে। যেমন–

(ক) গৃহীত চিঠি (Accepted Letter) : এক্ষেত্রে সম্পাদক একটি চিঠি প্রদান করেন এভাবে যে, "আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আপনার পাঠানো পাণ্ডুলিপিখানা আমাদের কমিটি দ্বারা গৃহীত হয়েছে। অতএব আপনার প্রবন্ধখানা পরবর্তী প্রকাশনায় (উদাহরণ, Vol-৩৪ (২০৬) যথারীতি প্রকাশ পাবে। এটি প্রবন্ধ প্রকাশনার গৃহীত হওয়ার চিঠি।

(খ) অগৃহীত চিঠি (Unaccepted Letter) : যখন রিভিউয়ারদের দ্বারা ঋণাত্মক মন্তব্য পাওয়া যায় তখন প্রধান সম্পাদক প্রবন্ধটি তার জার্নালে প্রকাশ করতে অপারগতা জানায়। এক্ষেত্রে সরাসরি ÷জবলবপঃবফচ না লিখে বরং লেখা হয় "Unacceptable for publication"। কোনো কোনো সময় পাণ্ডুলিপি খুলে দেখার সাথে সাথে তা বাতিল করে দেয়া হয়। এসব পাণ্ডুলিপি রিভিউয়ারদের কাছে পাঠানই হয় না। আবার কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি রিভিউয়ারদের কাছ থেকে পাওয়া

মন্তব্যের ভিত্তিতে বাতিল বলে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। এরূপ বাতিলের সিদ্ধান্ত কখনও কখনও বেশ সহজে হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই প্রবন্ধ যখন একজন রিভিউয়ার দ্বারা গ্রহণযোগ্য এবং অন্য জন দ্বারা অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে তৃতীয় জনের কাছে পাঠিয়ে তিনজনের মন্তব্যের গড় করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

(গ) সংস্করণের চিঠি (Modify Letter) : কোনো পাণ্ডুলিপির উপর যদি রিভিউয়াররা এমন মন্তব্য করেন যে, পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের যোগ্য। কিন্তু এর কিছু ছোটখাটো পরিবর্তন বা সংস্করণ করা দরকার, তাহলে প্রধান সম্পাদক একটি চিঠিতে পাণ্ডুলিপির ক্রটিগুলো উল্লেখ করা থাকে এবং এক্ষেত্রে তা সংশোধনের জন্য কিছু সাজেশনও থাকে। এক্ষেত্রে সম্পাদক নিজের মন্তব্য সাধারণত লেখেন না। তিনি কেবলমাত্র রিভিউয়ারদের মন্তব্য (Reviewers comments) লিখে পাঠান। সম্পাদক একটি কভার লেটার এভাবে পাঠাতে পারেন যে, "Your manuscript has been reviewed and it is being returned to you with the attached comments and suggestions by the reviewers. We believe these comments will help you improve your manuscript and to send back again."

এবার তাদের মন্তব্য ভালোভাবে হৃদয়াঙ্গম করার চেষ্টা করতে হয়। অতঃপর সে অনুযায়ী পাণ্ডুলিপির যথাসম্ভব নির্ভুল সংস্করণ করা হয়। তারপর এই পরিবর্তিত পাণ্ডুলিপি পুনরায় একই পদ্ধতিতে ডাকযোগে পাঠাতে হবে। এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই ডেডলাইন দেয়া থাকলে সে অনুযায়ী সময়মতো পরিবর্তিত পাণ্ডুলিপি পাঠাতে হবে। আর সময় নির্ধারিত করা না থাকলেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা পাঠাতে হবে।

পাণ্ডুলিপি ঠিকমতো পরিবর্তন করে তা পুনরায় দাখিল করার পর এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তা প্রকাশিত হবেই। সব সময় এসব সংস্করণ গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। এরপর, দ্বিতীয়বার সংস্করণের জন্য কর্তৃপক্ষ চিঠি দিতেও পারে, নাও হতে পারে। গ্রহণ করতে পারে অথবা বাতিল করতে পারে। আবার এমন অনেক জার্নাল আছে যা গ্রহণ করা হয়েছে এমন পাণ্ডুলিপিকে মূল জার্নালের আদলে হুবহু তৈরি করে দিতে বলে। এক্ষেত্রে লেখককে কষ্ট করে আবার নতুনভাবে জার্নালের আদলে নির্দেশনা অনুযায়ী মেপে মেপে অবিকল তৈরি করেন। ফলে কর্তৃপক্ষ খুব সহজেই এগুলোকে স্ক্যানিং করে তা প্রকাশনার কাজে লাগাতে পারেন। অন্যদিকে যাদের পাণ্ডুলিপি বাতিল হয়েছে তারা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে কোনো জার্নালে পুনরায় দাখিল করতে পারেন। অনেক জার্নাল আছে যেখানে প্রবন্ধ প্রকাশনার জন্য ফি (আর্থিক সহায়তা) দিতে হয়। সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ গৃহীত প্রবন্ধটি জার্নালে প্রকাশ করার জন্য নির্ধারিত ফি জমা দিতে বলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণা পরিচিতি

INTRODUCTION TO RESEARCH

গবেষণা কি

What is Research

গবেষণা কি? বা গবেষণা বলতে কি বোঝায়? গবেষণা শব্দটিতে এ পর্যন্ত অসংখ্য অর্থ আরোপিত হয়েছে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে এর অর্থের ভিন্নতা বা পার্থক্য বর্তমান। বিভিন্ন ব্যক্তি 'গবেষণা' পদটিতে বিভিন্ন অর্থ আরোপ করে বর্ণনা করলেও তাদের মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে মিল রয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তির সংজ্ঞা থেকে গবেষণার সংজ্ঞা সনাক্ত করা সম্ভব।

সাধারণ অর্থে গবেষণা হলো সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানকে গবেষণা বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, গবেষণা হলো বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের একটি কলা বা আর্ট। The Advanced Learner Dictionary of Current English পুস্তকে গবেষণাকে বলা হয়েছে জ্ঞানের যেকোনো শাখায় নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপক ও সযত্ন তথ্যানুসন্ধান। রেডম্যান (Readman) ও মরী (Mory) নতুন জ্ঞান আরহণের সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টাকে গবেষণা হিসাবে অভিহিত করেছেন। রাস্ক (Rusk) বলেন, গবেষণা হলো একটি অভিমত, মানস কাঠামোর একটি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি, গবেষণা সেসব প্রশ্নের অবতারণা করে যার অবতারণা এর আগে কোনোদিন হয়নি এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। গ্রিনের (Green)-এর মতে, জ্ঞানানুসন্ধানের আদর্শায়িত বা মানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগই গবেষণা। সুসংগঠিত জ্ঞানের আবিষ্কার ও বিকাশের লক্ষ্যে নিবেদিত পদ্ধতিগত কর্মকাণ্ডকে গবেষণা বলা যায়।

কোনো সমস্যার অধিক পর্যাপ্ত সমাধান লাভের লক্ষ্যে ব্যবহৃত পদ্ধতিগত ও পরিশীলিত বা পরিমার্জিত কৌশলকে গবেষণা বলা যেতে পারে। সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রফোর্ড (Crawford) বলেন যে, চিরাচরিত উপায়ে কোনো সমস্যার যে সমাধান পাওয়া যায় তার চেয়েও অধিক পর্যাপ্ত সমাধান লাভের জন্য বিশেষ ধরনের উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও কার্যধারা প্রয়োগের মাধ্যমে চিন্তনের পদ্ধতিগত ও

পরিমার্জিত কৌশলই গবেষণা। এটি একটি সমস্যা নিয়ে শুরু হয়, উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে এবং প্রকৃত সাক্ষ্যের বা তথ্যের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে।

জন ডব্লিউ বেস্ট বলেন যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা বিশ্লেষণের আরও আনুষ্ঠানিক, সুসংবদ্ধ ও ব্যাপক প্রক্রিয়াকে গবেষণা হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে।

ফ্রান্সিস রুমেল (Rummel) বলেন, "গবেষণা হলো জ্ঞানের আবিষ্কার, বিকাশ ও যাচাইয়ের একটি প্রচেষ্টা। এটি এমন একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়া যা শত শত বছরে বিকাশ লাভ করেছে। এর উদ্দেশ্য ও কাঠামো চিরকালই পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু সর্বদাই করেছে সত্যের অনুসন্ধান।"

গবেষণা হলো নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিগত এবং নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ ও রেকর্ডকরণ যা সার্বিকীকরণনীতি বা তত্ত্বের বিকাশের দিকে পরিচালিত করে। এসব সার্বিকীকরণনীতি বা তত্ত্ব বহু ঘটনার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ, যা ভবিষ্যদ্বাণী থেকে উদ্ভূত এবং যা হতে পারে কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের কারণ বা পরিণতি।

আমরা গবেষণার যেসব সংজ্ঞা দিয়েছি তা নিতান্তই তাত্ত্বিক বা বিমূর্ত। আমরা এবার গবেষণার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করব। দেখা যাক, RESEARCH শব্দটির প্রত্যেকটি বর্ণের তাৎপর্য কী?

RESEARCH এর প্রতিটি বর্ণ দ্বারা কী বোঝাতে পারে তা নিচের মতো করে ব্যাখ্যা করা যায়।

R দ্বারা বোঝায় Rational way of thinking বা যুক্তিযুক্ত চিন্তন পদ্ধতি।

E দ্বারা বোঝায় Expert and exhaustive treatment বা সুদক্ষ ও ব্যাপক আলোচনা।

S দ্বারা বোঝায় Search for solution বা সমাধানের অনুসন্ধান।

E দ্বারা বোঝায় Exactness বা যথার্থতা বা নির্ভুলতা।

A দ্বারা বোঝায় Analytical analysis of adequate data বা পর্যাপ্ত উপাত্তের গাণিতিক বিশ্লেষণ।

R দ্বারা বোঝায় Relationship of facts বা সত্য বা ঘটনার পারস্পর্য বা সম্পর্ক।

C দ্বারা বোঝায়

(ক) Careful recording বা সতর্কতাসহ রেকর্ডকরণ।

(খ) Critical observation বা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ।

(গ) Constructive attitude বা গঠনমূলক মনোভাব।

(ঘ) Condensed and compactly stated generalization বা সুসংগতভাবে বিবৃত সার্বিকীকরণ।

H দ্বারা বোঝায় গবেষণার সকল স্তরে

(ক) Honesty বা সততা

(খ) Hardwork বা কঠোর পরিশ্রম

গবেষণার বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Research

১। গবেষণা কোনো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিবেদিত।

২। গবেষণা প্রাথমিক বা প্রধান উৎস থেকে জ্ঞান বা উপাত্ত সংগ্রহ করে। অথবা বর্তমান উপাত্ত নতুন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে।

৩। গবেষণা পর্যবেক্ষণযোগ্য অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষালব্ধ সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর জন্য প্রয়োজন নির্ভুল পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা। এর জন্য দক্ষতারও প্রয়োজন।

৪। এটি একটি কুশলী, পদ্ধতিগত ও সঠিক অনুসন্ধান।

৫। এটি সাধারণ নীতি আবিষ্কারের উপর গুরুত্বারোপ করে।

৬। গবেষণা যুক্তিযুক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক। সম্ভাব্য সকল রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ ব্যবহার পদ্ধতি, সংগৃহীত উপাত্ত ও সিদ্ধান্ত যাচাই করতে হবে।

৭। অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাইয়ের জন্য নিরপেক্ষভাবে যথার্থ কৌশল অনুসরণ করে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে।

৮। সংগৃহীত উপাত্তকে পরিমাণগত বা সংখাগতভাবে সুসংগঠিত করতে হবে।

৯। গবেষণার জন্য দরকার ধৈর্য ও ধীরস্থির স্বভাব।

১০। গবেষককে হতে হবে সাহসী ও নিরপেক্ষ। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বা প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে হলেও সাহসের সাথে তা প্রকাশ করতে হবে।

১১। গবেষণার ফলাফলকে নিরপেক্ষভাবে সতর্কতার সাথে রেকর্ড ও বর্ণনা করতে হবে।

১২। সতর্কতা ও নিরপেক্ষতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সার্বিকীকরণ করতে হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

Objectives of Research

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার করাই গবেষণার কাজ। গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো এমন লুক্কায়িত সত্যের আবিষ্কার যা এখন পর্যন্ত

আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং কোনো গবেষণার উদ্দেশ্যকে আমরা নিচের মতো করে লিখতে পারি।

(ক) কোনো ঘটনা বা প্রতিভাসের সঙ্গে পরিচিতি লাভ অথবা তা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন। (এই উদ্দেশ্যে সম্পাদিত গবেষণাকে বল হয় অনুসন্ধানমুখী বা formulative গবেষণা)।

(খ) কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, কোনো অবস্থা বা কোনো দল বা গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের সঠিক চিত্রাঙ্কন (এই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন গবেষণাকে বর্ণনামূলক গবেষণা বলা হয়)।

(গ) কোনো কিছু কতবার ঘটছে এবং কোনো কিছুর সাথে গবেষণাটি কতটুকু সম্পর্কযুক্ত। (এই উদ্দেশ্যে সম্পাদিত গবেষণাকে বলা হয় লক্ষণ নিরূপক বা diagonostic গবেষণা)।

(ঘ) চল বা পরিবর্তিতগুলোর কার্যকারণ সম্পর্কের অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই। (এ ধরনের গবেষণাকে বলা হয় 'অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই' বা hypothesis testing গবেষণা)।

গবেষণার প্রকারভেদ

Types of Research

কোনো সমস্যার পর্যাপ্ত সমাধান লাভের লক্ষ্যে ব্যবহৃত পদ্ধতিগত ও পরিশীলিত কৌশলকে গবেষণা বলা যায়। গবেষণা একটি সমস্যা নিয়ে শুরু হয়, উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে এবং প্রকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে। গবেষণা নামক বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়াটি শত শত বছরে বিকাশ লাভ করেছে। এর উদ্দেশ্য ও কাঠামো চিরকালেই পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সর্বদাই করেছে সত্যের অনুসন্ধান।

গবেষণা হলো, জ্ঞান-অনুসন্ধানের আদর্শায়িত বা মানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ, সুসংগঠিত জ্ঞানের আবিষ্কার ও বিকাশের লক্ষ্যে নিবেদিত পদ্ধতিগত কর্মকাণ্ড। গবেষণা সব সময়ই কোনো না কোনো সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিবেদিত। এর জন্য প্রয়োজন নির্ভুল পর্যবেক্ষণ, সঠিক বর্ণনা, কুশলী, সঠিক ও পদ্ধতিগত অনুসন্ধান। গবেষণা হবে যুক্তিযুক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক। গবেষককে হতে হবে সাহসী ও নিরপেক্ষ; তার থাকতে হবে ধৈর্য ও ধীরস্থির স্বভাব।

গবেষণাকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১। মৌলিক গবেষণা (Basic of Fundamental research)

২। ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা (Applied research)

গবেষণাকে উপরোক্ত দু ভাগে ভাগ করা হলেও তাদের মধ্যে বিভক্তি সুস্পষ্ট নয়, কোনো কোন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে।

১। মৌলিক গবেষণা : মৌলিক গবেষণা হলো মূল বা আদি (original) গবেষণা। একে বিশুদ্ধ গবেষণাও বলা হয়। একে সাধারণীকরণ (generalization) ও তত্ত্ব তৈরি এবং শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞানানুসন্ধান বা জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার গবেষণা বলা যেতে পারে। কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা বা বিশুদ্ধ গণিত বা কোনো মৌলিক সমস্যা বা প্রধান বিতর্কিত বিষয় বা ইস্যু সম্পর্কিত গবেষণাকে মৌলিক গবেষণা হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। এ ধরনের গবেষণায় নিম্নোক্ত দুটি কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

(ক) কোনো নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার : মৌলিক গবেষণা থেকে এমন জ্ঞান আবিষ্কৃত হতে পারে যা সম্পূর্ণ নতুন এবং যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না। এ আবিষ্কার হতে পারে গবেষকের নিজস্ব ধারণা বা কল্পনা থেকে। যে গবেষক যত বেশি প্রতিভাবান, যতবেশি মেধাবী তার আবিষ্কৃত জ্ঞান ততবেশি উৎকৃষ্ট। অনেক গবেষক আছেন যারা জন্মগত ভাবেই প্রতিভাবান, প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, অসীম যাদের জ্ঞান পিপাসা এবং যারা অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, তারা এ ধরনের গবেষণা দ্বারা বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারেন, বিশ্বকে দেখাতে পারেন আলোর পথ। এ প্রসঙ্গে গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইনের অবদান সম্পর্কে বলা যেতে পারে। তাঁদের অবদান মৌলিক এবং স্ব স্ব ধারণাজাত বা কল্পনাপ্রসূত। এ গবেষণা তাই তাত্ত্বিক গবেষণা।

(খ) বর্তমান বা প্রচলিত তত্ত্বের উন্নয়ন : কোনো প্রচলিত তত্ত্বের কিছু কিছু অনুমানকে (assumption) সংশোধন বা পরিমার্জন করে এ ধরনের গবেষণা প্রচলিত তত্ত্বটির উন্নতিসাধন করে। কখনও কখনও এ ধরনের গবেষণা পুরনো তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নতুন তত্ত্বের বিকাশ ঘটায়। তত্ত্ব যেহেতু অনুমিতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে তাই অনুমিতির পরিবর্তন, হ্রাস শিথিল করা অথবা এক প্রস্থ নতুন অনুমিতির সাহায্য নেয়ার যথেষ্ট সুযোগ এ গবেষণায় থাকে। প্রচলিত তত্ত্বের পূর্ণব্যাখ্যার সুযোগ এ গবেষণায় থাকে এবং গবেষক প্রচলিত তত্ত্ব থেকে নতুন তত্ত্ব লাভ করতে পারেন। তবে যেকোনো তত্ত্বেরই অনুমিতিগুলো হতে হবে সুসংজ্ঞায়িত এবং আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত। অনুমিতির সংখ্যা হ্রাস, অনুমিতির পরিবর্তন এবং নতুন অনুমিতি গ্রহণ এদের সব কিছুই নির্ভর করে প্রচলিত তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। যেকোনো গতিশীল সমাজের ক্ষেত্রে গবেষক ধরে নিতে পারেন যে, পূর্ববর্তী অনুমিতিগুলো সেকেলে অথবা এগুলো পর্যাপ্তভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি। মৌলিক গবেষণার লক্ষ্য হলো এমন কোনো মৌলিক সত্য বা নিয়মের আবিষ্কার যার তাৎক্ষণিক এবং বাস্তব প্রয়োগ খুব একটা থাকে না। সামাজিক বিজ্ঞানে সাধারণীকরণের জন্য মানব আচরণ সম্পর্কিত গবেষণাকে মৌলিক গবেষণা বলা যায়। 'উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপ' 'বংশগতি ও পরিবেশের ভূমিকা', 'শিক্ষাগত মূল্যবোধ', 'শিক্ষার লক্ষ্য', ও 'শিক্ষাক্রম' বিষয়ক গবেষণা

মৌলিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। মৌলিক গবেষণার জন্য প্রয়োজন জটিলতর সমস্যা, পদ্ধতি, উত্তম উপকরণ, উচ্চতর নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্লেষণ।

২। **ফলিত গবেষণা** : কোনো সমাজ, শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলোর তাৎক্ষণিক সমাধান বের করাই ফলিত গবেষণার লক্ষ্য। এ গবেষণাকে বাস্তবক্ষেত্র বা মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা যায়। এর জন্য এ গবেষণাকে 'মাঠ পর্যায়ের গবেষণা'ও (field-study) বলা হয়। বাস্তবক্ষেত্রে মানব কল্যাণের জন্য এর প্রত্যক্ষ প্রয়োগ রয়েছে। সুতরাং অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মানুষ ও সমাজের কল্যাণে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার গবেষণাকে ফলিত গবেষণা বলা যেতে পারে। মৌলিক গবেষণা যে তত্ত্ব, নীতি ও নিয়ম প্রদান করে তা বাস্তবক্ষেত্রে বহুলাংশে প্রয়োগ করা যায়, তবে ফলিত গবেষণায় নিয়ন্ত্রণ (control) ও সঠিকতা বা নির্ভুলতাকে (precision) কিছুটা ত্যাগ করতে হয়।

শিক্ষণের উপর বিভিন্ন কৌশল বা উপকরণ ব্যবহারের প্রভাব, পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার, পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন, লাইব্রেরি ও ল্যাবেরেটরির সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয় ফলিত গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

ফলিত গবেষণা সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাজসমূহের মাধ্যমে অবদান রাখতে পারে :

(১) সমাজের উপকার সাধনের জন্য সমাজ থেকে যেসব বিষয়ের জন্য সমর্থন প্রয়োজন তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ফলিত গবেষণা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস জন্মানোর ব্যবস্থা করে।

(২) ফলিত গবেষণা তথাকথিত মৌলিক গবেষণায় ব্যবহৃত কৌশলের উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করে।

(৩) সাধারণীয়করণ (generalization) প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য উপাত্ত ও ধারণা/প্রত্যয় সরবরাহ করে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে ফলিত গবেষণার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশসমূহ মৌলিক বা বিশুদ্ধ গবেষণার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় না করে, প্রচলিত তত্ত্বসমূহ প্রয়োগ করে তাদের আর্থ-সামাজিক আচরণের মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করে অধিক উপকৃত হতে পারে। তবে মৌলিক গবেষণাকে একেবারে বাদ দিলে চলবে না, এরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

গবেষণাসমূহকে বর্তমানে নিম্নোক্তভাবেও (Categories) ভাগ করা হয়–

(ক) বিগতকালীন বিষয়ে প্রযুক্ত গবেষণা (Ex-post facto. research)

(খ) পরীক্ষণমূলক বা পরীক্ষাগার গবেষণা (Experimental or laboratory research)

(গ) মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা (Field investigation research)

(ঘ) জরিপ গবেষণা (Survey research)

(ঙ) মূল্যায়ন গবেষণা (Evalutation research)

(চ) কার্যোপযোগী গবেষণা (Action research)

(ক) বিগতকালীন বিষয়ে গবেষণা : এ গবেষণা হলো এমন ধরনের পদ্ধতিগত পরীক্ষামূলক গবেষণা যাতে অনির্ভরশীল বা অনপেক্ষ (independent) চলের উপর গবেষক বা বিজ্ঞানীর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এর কারণ হলো, এসব চলের সুস্পষ্টতা পূর্বেই ঘটে যায় অথবা এ চলগুলো অন্তর্নিহিতভাবেই পরিবর্তনযোগ্য নয়। এ ধরনের গবেষণা নির্ভরশীল ও অনির্ভরশীল চলের বিজ্ঞানসম্মত ও বিশ্লেষণধর্মী পরীক্ষার ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্ভাব্য ও আপাত ন্যায়সংগত সম্পর্ক জানার জন্য এ গবেষণার অনির্ভরশীল চলগুলো পূর্ব থেকেই পর্যালোচনা করা হয়। অনির্ভরশীল চলের পরিবর্তন এক বা একাধিক নির্ভরশীল চলের সৃষ্টি করে।

সমাজবৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনির্ভরশীল ও নির্ভরশীল চলকে এককভাবে বা দলগতভাবে সনাক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে গবেষণার উপযোগিতা অনুসারে গবেষণা চালানোর স্বীকৃত মডেল তৈরি করা যায়। গবেষকের অনুসন্ধানের প্রকৃতি এবং গবেষণা কৌশলের উপর নির্ভর করে এ ধরনের গবেষণা সীমিত বা বৃহদাকারে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

এ গবেষণার কিছু দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এগুলো হলো-

(১) এ গবেষণায় অনির্ভরশীল চলের পরিবর্তনশীল প্যাটার্ন বা বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

(২) এ ধরনের গবেষণায় লব্ধ ফলাফলের ভুল ব্যাখার ঝুঁকি (risk) থাকে। এ সব সীমাবদ্ধতা থাকলেও সমাজবিজ্ঞানে এ ধরনের গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

(খ) পরীক্ষণমূলক গবেষণা : এ ধরনের গবেষণা কেবল ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ গবেষণার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে অনির্ভরশীল চলকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভবনা এবং আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সংগত ব্যাখ্যার জন্য এদের প্রভাবকে পৃথক করার ব্যবস্থা বর্তমান। সামাজিক বিজ্ঞানে এ ধরনের গবেষণার প্রয়োগ খুবই সীমিত। কারণ, সামাজিক বিজ্ঞানের চলগুলোকে পরস্পর আলাদা করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এমন অবস্থা যদি সৃষ্টি করা যায় যেখানে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অপ্রাসঙ্গিক চলগুলোর পরিবর্তন সর্বনিম্ন রাখা যায়, তাহলে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিকে সামাজিক গবেষণায় প্রয়োগ করা সম্ভব হতে পারে। পরীক্ষণমূলক গবেষণা সম্বন্ধে স্টুয়ার্ট চ্যাপলিন অবশ্য বলেন, মানুষকে যদিও স্বেচ্ছাকৃতভাবে অথবা ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করা যায় না তবুও নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় মানব সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ করার কোনো বাধা নেই।

(গ) মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানমূলক গবেষণা : মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা হলো সে ধরনের গবেষণা যেখানে গবেষক কোনো বাস্তব পরিস্থিতিতে (realistic situation) সতর্কতার অনুমোদন সাপেক্ষে বা ঐ পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় এক বা একাধিক নিরপেক্ষ চলকে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে পারেন। পরীক্ষাগার গবেষণায় সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ থাকে, কিন্তু মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানমূলক গবেষণায় অপেক্ষাকৃত কম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়। মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানমূলক গবেষণার সীমাবদ্ধতা অনেকটা ব্যবহারিক প্রকৃতির। নিয়ন্ত্রণকে সুদৃঢ় বা খুব বেশি করে প্রয়োগ করা যায় না। এর কারণ হলো, সামাজিক ঘটনাবলিকে কোনোরূপ পরিবর্তন না করে ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটছে গবেষক সেগুলোকে সেভাবেই পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করেন। পর্যবেক্ষণীয় ঘটনার উপর অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলোর প্রভাবকে অনির্ভরশীল চলের প্রভাব থেকে খুব একটা আলাদা করে দেখতে পারেন না।

মাঠ-পর্যায়ে অনুসন্ধানমূলক গবেষণার সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

(১) বাস্তব পরিস্থিতিতে কাজ করা যায় বলে এ ধরনের গবেষণায় চলগুলো পরীক্ষাগার গবেষণায় ব্যবহৃত চলের অধিকতর জোরালোভাবে বা কার্যকরীভাবে কাজ করে।

(২) এ গবেষণায় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র দলের আন্তঃসম্পর্কের (inter-relationship) গতিময়তা বা গতীয়অবস্থা (dynamics) ফলপ্রসূভাবে অনুসন্ধানের সুবিধা পাওয়া যায়।

(৩) এ ধরনের গবেষণায় তত্ত্ব যাচাইয়ের যেমন সুবিধা থাকে তেমনি বাস্তব সমস্যা সমাধানেরও সুযোগ থাকে।

(৪) এ ধরনের গবেষণার পরিধি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। অর্থাৎ প্রায় সব ধরনের সমস্যা নিয়েই মাঠ-পদ্ধতি অনুসন্ধান করা যায়।

সুতরাং, ফলিত গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, মাঠ-পর্যায়ে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা। মাঠ-পর্যায়ে অনুসন্ধানমূলক গবেষণার একটি সীমাবদ্ধতা হলো যে, মাঠ পর্যায়ে কোনো নির্দিষ্ট সমগ্রক (population) এর মধ্য থেকে নির্বিচার নমুনায়ন (random sampling) বেশ কঠিন। নমুনা যদি নৈর্ব্যক্তিক (objective) এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্বাচন না করা হয় তাহলে গবেষকের প্রাপ্ত ফলাফল ভ্রান্ত হতে পারে।

(ঘ) জরিপ গবেষণা : কোনো নির্দিষ্ট সমগ্রকের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চলের আন্তঃসম্পর্ক ও তাদের প্রাসঙ্গিক প্রভাব আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে বর্তমানে জরিপ গবেষণা বেশ জনপ্রিয়। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। যে কোনো ছোট নমুনা বা সমগ্রক নিয়ে এ ধরনের গবেষণা করা যেতে পারে। কোনো সমগ্রক থেকে

নমুনা নির্বাচন করে তাদের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চলের বিন্যাস/বণ্টন ও আন্তঃসম্পর্ক আবিষ্কার করা যায়। যেহেতু অধিকাংশক্ষেত্রে একটি বৃহদাকার সমগ্রক থেকে নমুনা নির্বাচনের মাধ্যমে এ ধরনের গবেষণা হয়; সুতরাং এ ধরনের গবেষণাকে নমুনা জরিপও বলা যেতে পারে। জরিপ গবেষণার জন্য যেসব ধাপ মেনে চলতে হয় তা হলো (ক) জরিপের লক্ষ্য বর্ণনা (খ) নমুনার জন্য জনসংখ্যার সীমানা নির্ধারণ (গ) যেসব উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহ করা হবে তা নির্ধারণ (ঘ) পরিমাপ-পদ্ধতি নির্ধারণ (ঙ) নমুনায়নের একক নির্বাচন (চ) নমুনা নির্বাচন (ছ) মাঠ পর্যায়ের কাজের সংগঠন (জ) সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ ও (ঝ) ভবিষ্যতে জরিপ চালানোর জন্য প্রাপ্ত তথ্যের ব্যবহার।

এ ধরনের গবেষণার অসুবিধা হলো :

(ক) এ ধরনের গবেষণায় ভাসা ভাসা তথ্য পাওয়া যায়, সুস্পষ্ট বা সুগভীর সত্য উদ্‌ঘাটন করা যায় না।

(খ) সর্তকতার সাথে তথ্য সংগৃহীত না হলে নমুনায়নের ভ্রান্তি ব্যাপকভাবে দেখা দিতে পারে।

(গ) এ পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সকল ক্ষেত্রে থাকে না।

(ঘ) এ গবেষণায় গবেষকের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ কম।

(ঙ) যেহেতু ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও মতামতের ভিত্তিতে তথ্য সংগৃহীত হয়, তাই ব্যক্তিগত অনীহা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অসতর্কতার প্রভাব সংগৃহীত তথ্যে পড়ে।

এতসব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে জরিপ গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ঙ) মূল্যায়ন গবেষণা : গবেষণার শ্রেণিতে মূল্যায়ন গবেষণা একটি সাম্প্রতিক সংযোজন। সাম্প্রতিককালে এত ব্যাপক হারে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া হয়েছে যে, এসব প্রকল্প ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাফল্য মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে; ফলে মূল্যায়ন গবেষণা জন্মলাভ করেছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অধিকতর জোর দিয়েছে, ফলে এসব দেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বা অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের সাফল্য বা অকৃতকার্যতা নিরূপণের জন্য এ ধরনের গবেষণার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রোগ্রামের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রকল্পগুলো বিভিন্ন সময়ে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রকল্পসমূহের ভৌত অগ্রগতি, সমাজজীবনে তাদের প্রভাব, এর প্রতি জনসাধারণের মনোভাব, আগ্রহ, এগুলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কতটুকু সফল ইত্যাদি সবকিছুই বর্তমানে মূল্যায়ন গবেষণার আওতাভুক্ত।

মূল্যায়ন গবেষণা প্রধানত তিন রকমের :

(১) সহগামী মূল্যায়ন,
(২) পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন,
(৩) প্রান্তিক মূল্যায়ন।

(১) **সহগামী মূল্যায়ন** : কোনো চলমান প্রকল্পের নিরন্তর (continuous) মূল্যায়ন হলো সহগামী মূল্যায়ন। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ও অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে মূল্যায়ন চলতে থাকে। এ ধরনের গবেষণা শুধু যে, প্রকল্পের সাফল্য বা অকৃতকার্যতা মূল্যায়ন করে তা নয়, সম্ভাব্য দুর্বলতা নিরূপণ করে তা কাটিয়ে উঠার জন্য নির্দেশনা দান করে।

(২) **পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন** : প্রকল্প চলাকালীন সময়ে নির্দিষ্ট সময় পর পর বা ধাপে ধাপে প্রকল্পের সাফল্য বা অকৃতকার্যতা মূল্যায়নের জন্য এ ধরনের গবেষণা সম্পাদিত হয়। ধাপে ধাপে বা নির্দিষ্ট সময় পর পর মূল্যায়ন ও ফলাফলের উপর নির্ভর করে পরবর্তী ধাপগুলোর সমন্বয়সাধন করা যায়।

(৩) **প্রাপ্তির মূল্যায়ন** : এটি হলো চূড়ান্ত মূল্যায়ন। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বা সমাপ্ত হওয়ার পর তার সার্বিক মূল্যায়ন করে দেখা হয়, সে তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কতটুকু অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ ধরনের গবেষণায় গবেষকের অবশ্যই প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে।

(চ) **কার্যোপযোগী গবেষণা** : এ ধরনের গবেষণা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে একটি সাম্প্রতিক সংযোজন। কোনো কার্যকর সমাধান লাভের উদ্দেশে এ গবেষণা সুনির্দিষ্ট দিকাভিমুখী কর্মপন্থা নিয়ে অগ্রসর হয়।

ফলিত গবেষণা ও কার্যোপযোগী গবেষণার মধ্যে অনেক দিক দিয়েই মিল রয়েছে, তবে এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা বৃহত্তর নমুনা নিয়ে করা হয় এবং এর ফলাফল অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য। কিন্তু কার্যোপযোগী গবেষণা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে হাতের কাছে বা স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রতর নমুনা নিয়ে করা হয়। কার্যোপযোগী গবেষণা অব্যবহিত প্রয়োগ নিয়ে কাজ করে, কোনো তত্ত্বের বিকাশ বা ব্যাপক নিয়ে কাজ করে না। স্থানীয় পরিবেশে স্থানীয় সমস্যার প্রতি এ গবেষণা গুরুত্বারোপ করে। স্থানীয়ভাবে প্রয়োগযোগ্যতা দিয়ে এর মূল্যায়ন হয়। ফলিত গবেষণা বিশেষজ্ঞ দ্বারাও পরিচালিত হতে পারে, কিন্তু কার্যোপযোগী গবেষণা মাঠকর্মীগণ (field workers) পরিচালনা করেন। এই গবেষণা অধিকতর সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে বুঝিয়ে থাকে। সকল স্তরের বাস্তবতার সংস্পর্শে থেকে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার পদ্ধতি হলো কার্যোপযোগী গবেষণা।

এ গবেষণায় সাধারণত জরিপ পদ্ধতি ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ব্যবহৃত হয়। তবে ব্যক্তিগত মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক বিজ্ঞানীর অন্যগ্রহ ও উত্তরদাতার সহজ প্রাপ্যতার অভাবে এ গবেষণায় সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

এছাড়াও গবেষণাকে বর্ণনামূলক (descriptive) ও বিশ্লেষণমূলক (analytical) অথবা গুণবাচক (qualitative) ও পরিমাণবাচক (quantitative) অথবা ধারণাভিত্তিক (conceptual) ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক (empirical) হিসেবে ভাগ করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের জরিপ এবং তথ্য বা ঘটনার জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধান বর্ণনামূলক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যমান অবস্থার বর্ণনা, রেকর্ডকরণ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকে বর্ণনামূলক গবেষণা বলা হয়। এ ধরনের গবেষণায় চলের উপর গবেষকের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, কি ঘটেছিল বা কি ঘটছে তিনি শুধু তা বলতে পারেন। চলের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও তিনি এসব ঘটার কারণ আবিষ্কার করতে পারেন। এ ধরনের গবেষণা সাধারণত জরিপ পদ্ধতিতে করা হয়। এছাড়া তুলনামূলক গবেষণায় গবেষক প্রাপ্ত সত্য ও তথ্যকে ব্যবহার করেন এবং এগুলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর সূক্ষ্ম মূল্যায়ন করেন।

পরিমাণ বা সংখ্যাবচক গবেষণার ভিত্তি হলো কোনো সংখ্যা বা পরিমাণগত তথ্য। যেসব ঘটনা সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় সেসব ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা হয়। গুণবাচক গবেষণা গুণবাচক ঘটনা বা প্রতিভাস (যেসব ঘটনা গুণের সাথে সম্পর্কযুক্ত) নিয়ে কাজ করে। গুণবাচক গবেষণা বিশেষ করে আচরণ বিজ্ঞানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো মানব আচরণের উদ্দেশ্য বা প্রেরণা আবিষ্কার করা। মানুষের কোনো নির্দিষ্ট বা বিশেষ আচরণের পেছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে বা কোনো জিনিসকে মানুষ কেন পছন্দ বা অপছন্দ করে এ গবেষণার সাহায্যে তা বিশ্লেষণ করা যায়।

ধরণাভিত্তিক গবেষণা কোনো বিমূর্ত ধারণা বা তত্ত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কোনো নতুন তত্ত্বের বিকাশ বা বিদ্যমান তত্ত্বের পুনঃব্যাখ্যা দানের জন্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ এ ধরনের গবেষণা ব্যবহার করে থাকেন। এটি উপাত্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এমন সিদ্ধান্ত প্রদান করে যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা যাচাইযোগ্য। একে পরীক্ষণমূলক (experimental) গবেষণাও বলা হয়ে থাকে। কোনো চলকে নিয়ন্ত্রণ করা হলে কি ঘটবে তা এ ধরনের গবেষণা বর্ণনা করে থাকে। এতে প্রধান দৃষ্টি থাকে চলগুলোর মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যে। কোনো চল অন্য চলের উপর প্রভাব বিস্তার করে কি-না তা নির্ণয়ের জন্য এ ধরনের গবেষণা করা হয়।

এছাড়াও আরেক ধরনের গবেষণা আছে যাকে বলা হয় ঐতিহাসিক গবেষণা (historical research)। অতীতে কি ছিল তা এ ধরনের গবেষণা বর্ণনা করে থাকে। এ ধরনের গবেষণায় অতীতের উৎস যেমন- দলিলপত্র, ধ্বংসাবশেষ, ঘটনার অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে যাতে অতীতকে বুঝতে পারা যায়,

তার আলোকে বর্তমানকে উপলব্ধি করা যায় এবং কোনো কোন ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

মৌলিক গবেষণা ও কার্যোপযোগী গবেষণার তুলনা

নিচের ছকটি থেকে মৌলিক ও কার্যোপযোগী গবেষণার পার্থক্য নিরূপণ করা যায় :

বিষয়/দিক	মৌলিক গবেষণা	কার্যোপযোগী গবেষণা
১। উদ্দেশ্য	এর উদ্দেশ্য হলো তত্ত্বের বিকাশ ও যাচাই এবং সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য নীতি বা নিয়ম বের করা।	অর্জিত জ্ঞান স্থানীয় পরিবেশে প্রয়োগযোগ্য। এটি অনেকটা মাঠ-কর্মীদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের মতো।
২। বিশেষজ্ঞ	পরিমাণ, গবেষণার পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।	সাধারণ প্রতিক্ষণ হলেই চলে। এ ধরনের গবেষণা মাঠ-কর্মী বা শ্রেণিকক্ষের সাধারণ শিক্ষকরাই করতে পারেন।
৩। গবেষণার সমস্যার অবস্থান নির্দেশ বা সনাক্তকরণ	গবেষণার সমস্যার অবস্থান নির্দেশের জন্য ব্যাপকভাবে বিস্তৃত' পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।	স্থানীয়ভাবে, যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণির শিক্ষণ প্রক্রিয়া থেকেই সমস্যা সনাক্ত করতে পারেন।
৪। জড়িত থাকা	গবেষক গবেষণার জন্য তার নির্বাচিত সমস্যার কাজের সাথে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত নাও থাকতে পারেন।	গবেষককে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে জড়িত থাকতে হবে।
৫। অনুমিত সিদ্ধান্ত	অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও সুবিবৃত অনুমিত সিদ্ধান্ত তৈরি ও গ্রহণ করা হয়।	সমস্যার সুনির্দিষ্ট বিবৃতি অনুমিত সিদ্ধান্ত হিসেবে কাজ করে।
৬। আনুষঙ্গিক গবেষণা ও বইপত্রের পর্যালোচনা	এর জন্য আনুষঙ্গিক গবেষণার ব্যাপক পর্যালোচনা প্রয়োজন যাতে এ বিষয়ের জ্ঞান	এর বিষয় সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান ও উপলব্ধি থাকলেই চলে, কোনো ব্যাপক পাঠ ও

	ভাণ্ডার সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা যায়।	আনুষঙ্গিক গবেষণার পর্যালোচনার প্রয়োজন হয় না।
৭। নমুনায়ান	দৈবচয়িতভাবে (random) নমুনায়িত বা নিরপেক্ষভাবে চয়নকৃত নমুনা ব্যবহৃত হয়।	বিশেষ পরিবেশের বা বিশেষ কাজের জন্য নমুনা ব্যবহৃত হয়। যেমন শ্রেণি কক্ষেল শিক্ষার্থীরা নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
৮। নক্‌শা	ত্রুটি ও পক্ষপাতিত্ব হ্রাস করে তুলনাযোগ্য অবস্থা আনয়নে সর্তক দৃষ্টি রাখা হয়।	কার্যধারার পরিকল্পনা সাধারণভাবে নেওয়া হয়।
৯। উপাত্ত বিশ্লেষণ	কখনও কখনও জটিল বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়।	বিশ্লেষণের জন্য সরল ও সহজ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
১০। পরিসংখ্যাগত বিশ্লেষণ	নৈর্ব্যক্তিকতার জন্য উপাত্তের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের প্রতি জোর দেয়া হয়।	নৈর্ব্যক্তিকতা ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের প্রতি ততটা জোর দেয়া হয় না।
১১। গবেষণার ফলাফলের প্রয়োগ	গবেষণালব্ধ ফলাফল রিপোর্ট ও বইপত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, বাস্তব ক্ষেত্রে খুব একটা প্রয়োগ হয় না।	গবেষণালব্ধ ফলাফল স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

উত্তম গবেষণার বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Good Research

জেমস হ্যারল্ড ফক্স তার "Criteria of Good Research" প্রবন্ধে একটি উত্তম গবেষণার নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেন–

১। উত্তম গবেষণায় উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হবে এবং এতে সহজ ধারণা (concept) ব্যবহৃত হবে।

২। গবেষণার পদ্ধতি যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হতে হবে যাতে অন্য গবেষকগণ যা করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির লক্ষ্যে এর পুনরাবৃত্তি করতে পারেন।

৩। উত্তম গবেষণা হবে সুসংবদ্ধ। এই গবেষণার ডিজাইন বা নকশা হবে সুপরিকল্পিত যাতে প্রাপ্ত ফলাফল যতটুকু সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক হয়।

৪। গবেষক তার প্রতিবেদনে গবেষণার কার্যধারা, ডিজাইন, সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করবেন এবং ফলাফলে এই সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা কি প্রভাব ফেলতে পারে তারও ব্যাখ্যা দেবেন।

৫। পর্যাপ্তভাবে উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে হবে যাতে এর তাৎপর্য প্রকাশ পায় এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ কৌশল হবে যথোপযুক্ত। উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা সতর্কতার সাথে যাচাই করতে হবে।

৬। গবেষণার উপাত্তের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সেই সীমার মধ্যে থাকতে হবে যার জন্য উপাত্ত পর্যাপ্ত ভিত্তি বা সমর্থন প্রদান করে থাকে।

গবেষণার প্রস্তাবপত্র

Research Proposal

স্নাতকোত্তর বা পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য থিসিস বা ডিসারটেশন বা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখার সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে এর জন্য একটি প্রস্তাবপত্র তৈরি করা। প্রায়ই দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা গবেষণার কোনো সুসংজ্ঞায়িত বা সুনির্দিষ্ট সমস্যা বা গবেষণার কোনো সুন্দর প্রস্তাব হাতে না রেখেই পিএইচ.ডি স্নাতকোত্তর ডিগ্রির কোর্সে ভর্তির আশা পোষণ করে। যেসব প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রির চাহিদা পূরণের জন্য থিসিস বা গবেষণামূলক প্রবন্ধ বাধ্যতামূলক সেখানে নিয়মানুসারে গবেষণার প্রস্তাবপত্র পূর্বেই জমা দিতে হয়। গবেষণার এই প্রস্তাবপত্র উপদেষ্টা শিক্ষক কর্তৃক গৃহীত ও সুপারিশকৃত না হলে বিভাগে ভর্তির অনুমোদন পাওয়া যায় না। কোনো শিক্ষার্থী যদি গবেষণার প্রস্তাবপত্র তৈরি না করে কোনো উপায়ে ভর্তি হন এবং ভর্তি হওয়ার পরও তাদের যদি গবেষণার সমস্যা সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে তারা খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোর্স ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে তাই ভর্তির পূর্বেই পরিকল্পিত অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে গবেষণার প্রস্তাবপত্র তৈরি ও গবেষণার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে। 'সুন্দর ও সুপরিকল্পিত যাত্রা অর্ধেক যুদ্ধ জয়ের সমান– এ কথা থিসিস লেখার জন্য

সর্বাধিক প্রযোজ্য। একটি নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা প্রস্তাবপত্রের মাধ্যমে যদি শুরু করা যায় তাহলে গ্রহণযোগ্য গবেষণা উপহার দেওয়া সহজ হয় এবং ডিগ্রিলাভ হয় ত্বরান্বিত। এখন দেখা যাক, গবেষণার প্রস্তাবপত্র বলতে কী বোঝায়? কোনো গবেষণা করার জন্য প্রস্তাবিত গবেষণার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, অনুমিত সিদ্ধান্ত, পদ্ধতি, অর্থবাজেট ও সময়ের বণ্টন ইত্যাদি দেখতে কোনো কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের কাছে গবেষণার অনুমতি চেয়ে যে প্রস্তাবপত্র উপস্থাপন করা হয় তাকে গবেষণার প্রস্তাবপত্র বলে। অন্য কথায়, প্রস্তাবিত গবেষণার বিভিন্ন ধাপে সুলিখিত প্রবন্ধকে গবেষণার প্রস্তাবপত্র বলা হয়। গবেষণার প্রস্তাবপত্রকে গবেষণার নীলনকশা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

গবেষণার প্রস্তাবপত্রের বিভিন্ন অংশ

গবেষণার প্রস্তাবপত্রের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো (গবেষণাভেদে পৃথক হতে পারে) সাধারণত অন্তর্ভুক্ত থাকে–

১। গবেষণার (সমস্যার) শিরোনাম (Title of the problem)

২। গবেষণার ভূমিকা (Introduction)

৩। গবেষণার সমস্যার বিবৃতি (Statement of the problem)

৪। যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য (The Rationale and significance of the study)

৫। সংশ্লিষ্ট গবেষণার উল্লেখ (Review of related literature)

৬। গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the study)

৭। গবেষণায় ব্যবহৃত পদসমূহের সংজ্ঞাদান (Definition of the term used)

৮। অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)

৯। গবেষণার পদ্ধতি (Methodology of the study)

১০। সময় বণ্টন (Time schedule)

১১। বাজেট (Budget)

১২। থিসিসের সংগঠন (Organization of thesis)

১৩। তথ্যপঞ্জি (Bibliography)

নিচে গবেষণার প্রস্তাবপত্রের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা প্রদান করা হলো।

১। **গবেষণার শিরোনাম** : গবেষণার জন্য নির্বাচিত সমস্যার শিরোনাম হবে সুস্পষ্ট ও সঠিক। শিরোনামটি অত্যন্ত বড়, ব্যাপক ও দ্ব্যর্থক হবে না। শিরোনামটি আবার

খুব সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ অর্থেরও হবে না। শিরোনাম লেখার প্রচলিত নিয়ম হলো এটি পূর্ণাঙ্গ না লিখে বাগধারার আকারে লিখতে হবে। প্রস্তাবিত গবেষণার ধরন ও প্রকৃতি শিরোনাম থেকেই বোঝা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, শিরোনামটি যদি শুধুই গবেষণার বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেটি অসম্পূর্ণ হবে। নিচের নামকরণ দুটি তুলনা করা যেতে পারে "বাংলাদেশের বিভিন্ন কমিউনিটি স্কুলের সংগঠন ও প্রশাসন" এবং "বাংলাদেশের কমিউনিটি স্কুলের সংগঠন ও প্রশাসনের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা"। শেষোক্ত শিরোনামটি থেকে অধিকতর নির্দিষ্ট ও সঠিকভাবে গবেষণার বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। গবেষণার নামকরণের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর প্রার্থীদের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে এবং এটি কোনো অভিজ্ঞ গবেষক অথবা নির্দেশনাকারী অধ্যাপককে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

২। **গবেষণার ভূমিকা :** প্রস্তাবিত গবেষণার একটি ভূমিকা থাকবে। গবেষণার বিষয়কে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করার জন্য গবেষণা সম্পর্কে একটি বিবরণ দিতে হয়। গবেষণার বিষয়টির গুরুত্ব, এ বিষয়ে গবেষণা কেন প্রয়োজন ইত্যাদির বিবরণ এখানে থাকে।

এছাড়া, প্রস্তাবিত গবেষণার একটি সুস্পষ্ট শিরোনাম লেখার পর গবেষককে বিস্তারিতভাবে সমস্যার বিবরণ দিতে হবে। এরকম বক্তব্যে দুটি বিষয় তুলে ধরতে হয়–একটি সমস্যার সঠিক প্রকৃতির ব্যাখ্যা এবং অপরটি গবেষণার পরিধি। প্রয়োজনানুযায়ী কোনো কোনো সময় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ, পদ ও ধারণার সংজ্ঞা দিতে হয়। মানবিকশাখা ও সমাজবিজ্ঞানে কোনো বিষয়ের উপর সর্বজনীন পরিভাষা নেই বলে এ ধরনের গবেষণায় পদগুলো সংজ্ঞা দিয়ে দেয়া যুক্তিসংগত। এক্ষেত্রে অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সব সময়ই কোনো নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা কি বোঝাবে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয় অথবা গবেষণায় ব্যবহৃত প্রতিটি পদের সংজ্ঞা দেয়া হয়। যাতে গবেষকের ব্যবহৃত পদগুলো নৈর্ব্যক্তিকভাবে পরিমাপ এবং বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করা সহজতর হয়। থিসিসের প্রস্তাবপত্রের এই অংশে গবেষণার অনুমতি (assumption) ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যেতে পারে। গবেষণার পরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট আরও দুটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। এগুলো হলো গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য।

৩। **গবেষণার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য :** এখানে প্রস্তাবিত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, গবেষণা, প্রবন্ধ ইত্যাদির পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞতাপূর্ণ সুযুক্তির মাধ্যমে এর ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে হবে। তার গবেষণা কিভাবে অতীতে সুসম্পন্ন অন্যান্য গবেষণা থেকে পৃথক, প্রস্তাবিত গবেষণার মহৎ অবদান কিভাবে এ বিষয়ের

জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে ইত্যাদি গবেষককে যুক্তিযুক্তভাবে উপস্থাপন করতে হবে। প্রস্তাবিত গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো গবেষণা যদি না থাকে তাহলে গবেষককে আরও বিজ্ঞতাপূর্ণ যুক্তির সাহায্যে তার গবেষণার যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রস্তাবিত গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ যেমন বিভিন্ন অভীক্ষা (test), স্কেল, অথবা পরিমাণ ও মূল্যায়নের যেকোনো উদ্দেশ্যনিষ্ঠ উপকরণকে এদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে তাদের ব্যবহারের যৌক্তিকতা দেখাতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণার সাহায্য নেয়া যেতে পারে। গবেষক বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্যাপক পাঠ ও পর্যালোচনা করে প্রস্তাবিত গবেষণার সপক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শন করবে।

৪। **সমস্যার বিবৃতি :** গবেষক প্রস্তাবিত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, যৌক্তিকতা, তাৎপর্য ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করার পর গবেষণার সমস্যার বর্ণনা দেবেন। এখানে তিনি সংক্ষেপে গবেষণার পরিধি, সীমাবদ্ধতা ও অনুমিতি সম্পর্কে বলতে পারেন এবং কি কি অংশে গবেষণাটি বিভক্ত তাও উল্লেখ করেন। প্রয়োজনবোধে গবেষণায় ব্যবহৃত শব্দ ও পদসমূহের ধারণাও এখানে তিনি প্রকাশ করতে পারেন।

৫। **সংশ্লিষ্ট গবেষণার উল্লেখ :** গবেষণার ভূমিকা ও যৌক্তিকতায় গবেষণার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য সংক্ষেপে প্রস্তাবিত গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণার উল্লেখ করতে হয়। এখানে সংশ্লিষ্ট গবেষণার একটি তালিকা ও বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া যেতে পারে। ঐসব গবেষণার পদ্ধতি ব্যবহৃত হাতিয়ার বা উপকরণ ও প্রাপ্ত ফলাফলের উপর এখানে একটি বর্ণনাও থাকতে পারে তবে থিসিস লেখার সময় সংশ্লিষ্ট গবেষণা সম্পর্কে যত ব্যাপক ও বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হয় এখানে তেমন ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

৬। **গবেষণার উদ্দেশ্য :** গবেষণার প্রস্তাবপত্রে গবেষণার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যের নির্দেশ থাকবে যাতে গবেষণাটির একটি দিকনির্দেশ পাওয়া যেতে পারে। গবেষণার উদ্দেশ্য শুধু গবেষকের জন্য তাৎপার্যপূর্ণ নয়, যিনি গবেষণাটি পাঠ বা পর্যালোচনা করবেন তার জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ। গবেষণার উদ্দেশ্য যদি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট না হয় তাহলে গবেষণার কার্যধারা ও পদ্ধতি নির্ভুল হয় না এবং নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হয় না। গবেষককে উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণে সতর্ক হতে হবে কারণ, গবেষণার উদ্দেশ্য হলো এমন প্রতিশ্রুতি যা অবশ্যই তাকে পালন করতে হবে। সুতরাং গবেষক তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে যা করতে পারবেন তার চেয়ে বেশি উচ্চাভিলাষী যেন না হন। খুব বেশিসংখ্যক উদ্দেশ্য লেখা ঠিক হবে না এবং যথোপযুক্ত শব্দের দ্বারা এদের বর্ণনা করতে এবং ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হবে। গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা করছেন সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।

৬। গবেষণায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের কার্যকরী সংজ্ঞাদান : গবেষণার সময় গবেষক কোনো শব্দ বা পদকে বিশেষ অর্থে বা সীমায়িত অর্থে ব্যবহার করতে পারেন অথবা কোনো শব্দের উপর একটি নির্দিষ্ট অর্থ আরোপ করতে পারেন। গবেষণায় ব্যবহৃত এসব পদ ও শব্দের সংজ্ঞা অবশ্যই গবেষণার প্রস্তাবপত্রে থাকতে হবে। অনেক গবেষক ভূমিকায় বা গবেষণার সমস্যার বিবৃতিতে এসব পদের সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন এবং সেখানে গবেষণার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও উল্লেখ করেন। অনেক গবেষক আবার 'গবেষণার সীমাবদ্ধতা' শিরোনামেরও গবেষণার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে থাকেন। এটি নির্ভর করে গবেষণার প্রকৃতি, পরিধি ও উদ্দেশ্যের উপর।

৭। অনুমিত সিদ্ধান্ত : সকল বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায়ই অনুমিত সিদ্ধান্ত থাকে। এটি কখনও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় আবার কখনও গবেষণার উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত থাকে। অনুমিত সিদ্ধান্ত হলো কোনো প্রতিভাস বা ঘটনার বর্তমান অবস্থার আলোকে অস্থায়ী বা আপাতভাবে সত্য বলে গৃহীত বিবৃতি, যা নতুন সত্য অনুসন্ধানের ভিত্তি বলে বিবেচিত হয়। গবেষক যা খুঁজছেন তারই অনুমিত সিদ্ধান্ত। এটি এমন প্রতিজ্ঞা (proposition) যার সত্যতা নিরূপণের জন্য বিভিন্নভাবে যাচাই করা যেতে পারে। পরীক্ষণমূলক গবেষণায় নির্ভরশীল ও স্বাধীন চলের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে অনুমিত সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা হয়। এখানে গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনার খুব একটা প্রয়োজন হয় না, কারণ অনুমিত সিদ্ধান্ত থেকেই তা প্রতিফলিত হয়।

কোন প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব, কোনো সাধারণ নিয়ম অথবা গবেষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ অথবা যেসব গবেষক একই রকম অথবা তার গবেষণার আনুষঙ্গিক গবেষণা করেছেন তাদের পর্যবেক্ষণ অথবা কোনো সাদৃশ্য অনুমিত সিদ্ধান্তের ভিত্তি বা উৎস। অনুমিত সিদ্ধান্ত বর্ণনামূলক, ব্যাখ্যামূলক, পরিসংখ্যানগত অথবা নাস্তি (nul) হতে পারে। নাস্তি অনুমিত সিদ্ধান্তে ধরা হয়, দুই বা ততোধিক ব্যবস্থার (treatment) কার্যকারিতার মধ্যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই বা ব্যবস্থাগুলো সমানভাবে কার্যকর। সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে এই ধরনের অনুমিত সিদ্ধান্ত অবস্থা বিশেষে গৃহীত বা বাতিল বলে গণ্য হয়।

অনুমিত সিদ্ধান্ত গবেষণায় গবেষক যে নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন তাকে চিন্তন ও আবিষ্কার প্রক্রিয়ায় গাইড বা নির্দেশনাকারী বলা যেতে পারে। অনুমিত সিদ্ধান্ত গবেষককে অন্ধভাবে গবেষণা পরিচালনা থেকে বিরত রেখে গবেষকদের সম্মুখে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হাজির করে। এটি গবেষককে তার গবেষণাটি সুস্পষ্টভাবে বুঝতেও সহায়তা করে। অনুমিত সিদ্ধান্ত হবে যুক্তিযুক্ত, জ্ঞাত সত্য বা তত্ত্বের সাথে

সঙ্গতিপূর্ণ। একে যতটুকু সম্ভব সহজভাবে বিবৃত করতে হবে এবং এই বিবৃতি এমন হবে যাতে একে যাচাই করা যায় এবং সম্ভাব্যভাবে সত্য বা মিথ্যা বলা যায়।

৮। গবেষণার পদ্ধতি : গবেষণা পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ ব্যতীত কোনো প্রস্তাবপত্রই সম্পূর্ণ হয় না। আসলে, গবেষণার পদ্ধতিকে গবেষণা প্রকল্পের প্রাণ বলা যেতে পারে। গবেষক যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রস্তাবিত গবেষণার পদ্ধতিগত ধারাগুলোর সুনির্দিষ্ট রূপরেখাকে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান বা উপলব্ধি করতে না পারেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে কাজটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। গবেষণার পদ্ধতির মধ্যে নিচের বিষয়গুলো সাধারণত অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(ক) তথ্যানুসন্ধানের পদ্ধতি (ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, পরীক্ষণমূলক ইত্যাদি)।

(খ) গবেষণার হাতিয়ার বা উপকরণ ও ব্যবহৃত অভীক্ষা।

(ঘ) উপাত্ত সংগ্রহ।

(ঙ) উপাত্ত বিশ্লেষণ কৌশল ইত্যাদি।

সকল গবেষণায় হয়তো উপরোক্ত প্রতিটি বিষয় নাও থাকতে পারে তবে এদের অধিকাংশই থাকে। গবেষণার পদ্ধতি গবেষণার পুরো নকশার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গবেষণার উদ্দেশ্য ও অনুমিত সিদ্ধান্তের সাথে এর নিবিড় ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং গবেষণা কর্মটি হাতে নেয়ার পূর্বে যেকোনো স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীকে এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করতে হবে। নির্দিষ্ট গন্তব্যে পদ্ধতিগতভাবে পৌছার জন্য গবেষণার পদ্ধতি গবেষককে পথ নির্দেশ দেয়। গবেষণার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা যত স্বচ্ছ হবে, গবেষণা কর্মটি তত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

৯। সময় বণ্টন : নির্দিষ্ট সময়ে গবেষণা সমাপ্ত করা এবং সময় ও শক্তিকে কার্যকরভাবে ব্যবহারের জন্য গবেষণা প্রকল্পটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে প্রতিটি অংশ সমাপনের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে নিতে হয়। গবেষণার অনেক ধাপ আছে যা শুরু করতে হলে পূর্ববর্তী ধাপগুলো সম্পূর্ণ করে আসতে হয়। গবেষণার কিছু কিছু অংশ যেমন সংশ্লিষ্ট গবেষণার পর্যালোচনা–এটি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করার সময়ের মধ্যেই চূড়ান্তভাবে তৈরি ও টাইপ করা যেতে পারে। ডিগ্রি অর্জনের জন্য যেসব গবেষণা করা হয় সেসব গবেষণার প্রতিবেদন জমা দেয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে সময়ের পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যার সংজ্ঞাদান, সমস্যার সীমায়িতকরণ, উৎস, তথ্য পাঠ ও পর্যালোচনা, প্রশ্নমালা বা অভীক্ষা তৈরি, প্রশ্নমালার ট্রাই-আউট বা পূর্ব পরীক্ষা. প্রশ্নমালার চূড়ান্ত রূপদান ও তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য শতকরা ৬০ ভাগ সময়

ব্যয় করা যেতে পারে। এই ৬০ ভাগ সময়কে আবার বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নিতে হবে। তথ্য বিশ্লেষণ ও খসড়া প্রতিবেদন তৈরির জন্য শতকরা ২০ ভাগ সময় ব্যয় করা যেতে পারে। খসড়া প্রতিবেদনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, উৎকর্ষ সাধন, এবং পাদটীকা ও তথ্যপঞ্জি, লেখা এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি, টাইপ করা, প্রুফ দেখা ও বাঁধাইয়ের জন্য শতকরা ২০ ভাগ সময় রাখা যেতে পারে। এই সময় নির্দিষ্ট অনুপাতে অংশ বিশেষে ভাগ করে নিতে হয়।

১০। **বাজেট :** যেকোনো গবেষণা সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থের হিসাব খাত অনুযায়ী দেখাতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে গবেষণা সমাপ্ত করা জন্য বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। অর্থের অভাবে যাতে মাঝ পথে গবেষণা কর্ম থেমে না যায় সে কথা মনে রেখে তথ্য সংগ্রহ, টাইপ করা কাগজ, কালি কার্বন ও বাঁধাইয়ের কথা বিবেচনা করে পূর্বেই একটি বাজেট তৈরি করতে হবে।

১১। **থিসিসের সংগঠন :** সম্পূর্ণ থিসিসটি কিভাবে সংগঠিত হবে তা এখানে উল্লেখ করতে হবে। থিসিসটি কয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত হবে, এই অধ্যায়গুলো কিভাবে সম্পর্কযুক্ত হবে, এগুলো কিভাবে সাজানো হবে, অধ্যায়গুলো এরকম ধারাবাহিক কেন সাজানো হবে ইত্যাদি এই অংশে থাকে। এছাড়া গবেষক এখানে প্রতিটি অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ উল্লেখ করতে পারেন। বেশ কিছু গবেষণাকাজের অভিজ্ঞতা না থাকলে থিসিসের বিভিন্ন অধ্যায় সাজানো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। প্রথমে তাই, মোটামুটিভাবে অধ্যায়গুলোকে সাজাতে হবে এবং গবেষণাটি অগ্রসর হতে হতে যখন পূর্ণাঙ্গরূপ পেতে থাকবে তখন এসব অধ্যায়ের সমন্বয় সাধন করতে হবে।

১২। **তথ্যপঞ্জি :** প্রস্তাবপত্রের বর্ণনামূলক অংশটি যখন লেখা শেষ হয় তখন এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ, গবেষণা, প্রবন্ধ, সাময়িকী, জার্নাল (যেসব থেকে গবেষণার প্রস্তাবপত্র তৈরিতে সাহায্য নেয়া হয়েছে) ইত্যাদির একটি নির্বাচিত তালিকা সংযোজন করতে হবে। এসব রেফারেন্স গবেষণার সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে এবং এগুলো প্রস্তাবপত্র তৈরির জন্য গবেষক অবশ্যই পড়েছেন অথবা পর্যালোচনা করেছেন। যেসব প্রস্তাবপত্র যথোপযুক্ত রেফারেন্স দ্বারা সমর্থিত হয় যেসব প্রস্তাবপত্রকে সুচিন্তিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও পদ্ধতিগত বলে বিবেচনা করা হয়।

উপরে বর্ণিত অংশসমূহের তালিকা সকল গবেষণার প্রস্তাবপত্রের অংশসমূহের জন্য চূড়ান্ত তালিকা নয়। গবেষণার ধরন, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এই তালিকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যেতে পারে।

একটি গবেষণা প্রস্তাবপত্রের নমুনা* ।

শিরোনাম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স সিস্টেম প্রবর্তন ও শিক্ষকদের সমস্যা

ভূমিকা

গতিশীল জগতে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনধারা, ধ্যানধারণা, সমাজ-সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা প্রভৃতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। জীবন ও জগতের এ পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখেই দেশ ও জাতির জীবন দর্শন নিরূপিত হচ্ছে।

জাতীয় জীবন দর্শন অপরিবর্তনীয় নয়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে জাতীয় জীবন দর্শনেরও পরিবর্তন হয়। জীবনের চরম উৎকর্ষতা ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যে জাতি যখন যে ভাবধারা পোষণ করে শিক্ষাও তদানুযায়ী নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

প্রাচীনকালে শিক্ষাদর্শন ছিল ঈশ্বর সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান-চর্চা ও আদর্শ চরিত্র গঠন। গির্জা-মন্দির-মসজিদকে কেন্দ্র করেই সে যুগের লেখাপড়া গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ ভারতের শাসনামলের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা জনজীবনের চাহিদা ও আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। নিজেদের প্রয়োজনে এবং স্বার্থে "কেরানী তৈরি করা" এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য "রাজভক্ত কর্মচারী" সৃষ্টি করাই ছিল তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ দেশের জনস্বার্থের অনুকূলে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা রূপায়নে চেষ্টা করেনি। ব্রিটিশ পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠির শাসন থেকে আমরা আজ মুক্ত। আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌক শাসকগোষ্ঠির শাসন থেকে আমরা আজ মুক্ত। আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের অধিবাসী।

বিজাতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি পরিহার করে রাষ্ট্রীয় আদর্শের অনুসরণে জাতীয় জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য গণমুখী, কর্মমুখী এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরির নিমিত্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় এসেছে।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার জাদুস্পর্শেই মানুষের মনুষ্যত্ব লাভ হয়, প্রাণশক্তির উন্মেষ সাধন ঘটে ও জাতীয় জীবন সমৃদ্ধিশালী হয়। বিগত ব্রিটিশ তথা পাকিস্তানি সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জাঁতাকলে আমাদের জাতীয় জীবন এবং শিক্ষাব্যবস্থা রুদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর কৃষক,

---

* সৌজন্যে চিত্তরঞ্জন সরকার।

শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী তথা ত্রিশ লক্ষ মেহনতি মানুষের তাজা রক্তের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। তাই জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত ও পুনর্গঠিত করতে হবে। বিগত ঔপনিবেশিক শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে "উপরে থেকে নিচে"। বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যাপ্তি লাভ করবে সম্পূর্ণ "নিচ থেকে উপরে"। শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রভৃতি আজ এমনভাবে রচিত হতে হবে যাতে মানুষের প্রত্যক্ষ প্রয়োজনই শুধু মিটবে না, সামাগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের আদর্শও পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

কারণ, জাতীয় উন্নয়ন সুপরিকল্পিত শিক্ষার সাথে সরাসরি জড়িত অর্থাৎ "জাতীয় উন্নতির হাতিয়ার সুপরিকল্পিত শিক্ষা"। ১৯৭৪ সালের ড. কুদরত- ই-খুদা "শিক্ষাকমিশন রিপোর্ট" অনুযায়ী আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাথমিক স্তর (I-V, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়), মাধ্যমিক স্তর (VI-VIII, নিম্ন মাধ্যমিক ; IX-X মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়), উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতকোত্তর (XI-XII এবং বি, এ; বি. এসসি; বি. কম; যা কলেজে পড়ানো হয়) ও উচ্চশিক্ষাস্তর (বি, এ, বি, এসসি; বি, কম সম্মান; এম, এ; এম, এসসি; এম. কম; যা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পড়ানো হয়) ইত্যাদি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকৌশল, কৃষি এবং চিকিৎসাবিদ্যারও ব্যবস্থা রয়েছে।

তবে যেহেতু প্রস্তাবিত গবেষণা "কোর্স সিস্টেম" প্রবর্তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অসুবিধা "চিহ্নিতকরণ" এর উপর তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করা যাক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষা পদ্ধতি ও তার মূল্যায়ন পদ্ধতি ছিল প্রচলিত পদ্ধতিতে। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণিতে কতগুলি পাঠ্যবিষয় পড়ানো হতো। নির্দিষ্ট সময় শেষে রচনাধর্মী কয়েকটি প্রশ্নের দ্বারা ৩/৪ ঘণ্টার একটি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হতো। কখনও কখনও নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি শেষ না করতে পেরে শিক্ষকগণ প্রয়োজনীয় অংশটুকু পড়াতেন এবং তার মধ্য থেকে প্রশ্ন নির্দিষ্ট করে দিতেন। ফলে শিক্ষার্থীগণ সারা বছর পড়াশুনা না করে সীমিত অংশের সীমিত পড়াশুনা করে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন। তাছাড়া, কোনো বিষয়ে কয়েক বছরের গতানুগতিক প্রশ্ন বাছাই করে ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সহজে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস পেতেন।

এই ধরনের পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর মুখস্থবিদ্যাকে উৎসাহিত করা হয়। এতে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অগ্রগতি সমস্যা ও সমস্যা সমাধানে উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত

অভীক্ষার প্রয়োগ সাধন ঘটিয়ে শিক্ষা ও জীবন বিকাশের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। তদুপরি স্বাধীনতা উত্তরকালে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয়দান, মুদ্রাস্ফীতি, সামাজিক অনিয়ম ও দুর্নীতি, বিশেষ রাজনৈতিক দলের মদদ ও ব্যবহার শিক্ষার্থীদের উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। ফলে শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার চরম অবনতি ঘটে। নকলের প্রবণতা বেড়ে যায় ফলে, পাসের হারও বেড়ে যায়।

তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির ধারা বদলাতে সচেষ্ট হন। শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও অর্জিত বিষয়বস্তুর তথ্যজ্ঞান আত্মীকরণের সার্থক পরিমাণের জন্য ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে সর্বপ্রথম শিক্ষার নতুন পদ্ধতি "কোর্স সিস্টেম" চালু করা হয়। এরপর প্রায় সবগুলি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে পুরনো পদ্ধতির পরিবর্তে কোর্স-সিস্টেম চালু করা হয়েছে।[২]

প্রস্তাবিত গবেষণার যৌক্তিকতা, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা

জীবন, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি কোনো কিছুই পরিপূর্ণ নয়। পূর্ণতা আনয়নে মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। অন্তরে রয়েছে অনন্ত চাহিদা ও অভাববোধ। আর এ অনন্ত চাহিদা ও অভাববোধ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে মানুষের জীবনের পরিবর্তনশীল শিক্ষা, এ পরিবর্তনশীলতার জনক। কিন্তু, যে কোনো পরিবর্তনকেই শিক্ষার পদবাচ্য বলা যায় না। শিক্ষার দ্বারা যে পরিবর্তন আসবে তা হবে প্রধানত বিকাশমূলক। তবে সর্বদেশে সর্বকালে দেখা গেছে যে, যেকোনো নতুন মত বা চিন্তা ধারা যেখানে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে সেখানেই আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এমনকি প্রবক্তাদের শাস্তি এবং মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হয়েছে। পরে অবশ্য তা সাদরে গ্রহণও করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৪ সালে যখন বিজ্ঞান অনুষদে প্রথম "কোর্স সিস্টেম" চালু করা হয়ে তখনও স্বাভাবিকভাবেই উদ্যোগী অধ্যাপকগণ সমালোচনার শিকার হন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যে, পুরাতন পদ্ধতির চেয়ে প্রবর্তিত নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন যথার্থ হয় এবং "টার্ম" অনুযায়ী নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা সম্ভব। অর্থাৎ নতুন পদ্ধতিতে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই অধিক। তখন অন্যান্য অনুষদের বিভিন্ন বিভাগেও "কোর্স সিস্টেম" চালু করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পিঠস্থান। এখানে যাঁরা শিক্ষাদান করেন তাঁদেরকে বিশেষজ্ঞ বলে ধরা হয়। দেশের প্রথম শ্রেণির নাগরিক তাঁদের হাত দিয়েই বের হন। তাঁদের গবেষণালব্ধ চিন্তাধারা দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য।

তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "কোর্স সিস্টেম" প্রবর্তন করতে গিয়ে শিক্ষকগণ সম্ভাব্য যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তা সনাক্তকরণের জন্যই এই প্রস্তাবিত গবেষণার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যেমন–জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্বাবিদ্যালয়েও "কোর্স সিস্টেম" প্রবর্তনের পরিকল্পনা চলছে।

কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম "কোর্স সিস্টেম" চালু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নতুন পদ্ধতির প্রবর্তনের ফলে শিক্ষকগণ যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তা সনাক্ত করতে পারলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে "কোস সিস্টেম" চালু করার সময় যাতে এসব অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা নেয়া যায় এবং কার্যকরীভাবে কোর্স সিস্টেম চালু করা যায় তার জন্যই এই প্রস্তাবিত গবেষণা।

এছাড়াও পরবর্তী সময়ে যাঁরা "কোর্স সিস্টেমের" উপর গবেষণা করতে আগ্রহী হবে তাঁদের সাহায্যকারী "তথ্যপেপার" হিসাবে এটি কাজ করবে।

সমস্যার বিবরণ

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স সিস্টেম প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের অসুবিধা।" এই গবেষণাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) পুরনো পদ্ধতির সাথে নতুন পদ্ধতির তুলনা এবং (খ) কোর্স সিস্টেমের অসুবিধাসমূহের সনাক্তকরণ ও তা দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবন।

সংশ্লিষ্ট গবেষণার উল্লেখ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স সিস্টেম প্রবর্তনের পর শিক্ষকদের সুবিধা-অসুবিধা বা কোর্স সিস্টেমের প্রতি শিক্ষকদের মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। শিক্ষার্থীদের নিয়ে কয়েকটি গবেষণা হয়েছে। শামীম ফারুক (১৯৮৬) শীক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও কোর্স সিস্টেমেরে প্রতি তাদের মনোভাব বিষয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। এই গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ শিক্ষার্থী কোর্স সিস্টেমের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এবং তারা মনে করেন কোর্স সিস্টেম তাদের শিক্ষাজীবনের জট ছাড়িয়ে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা জীবন সমাপ্তিতে সহায়তা করবে। ফলাফলে আরও দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও কোর্স সিস্টেমেরে প্রতি তাদের মনোভাবের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক নেই। কুণ্ড (১৯৮২) কোর্স সিস্টেম প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীদের সমস্যা শীর্ষক একটি গবেষণা সমাপ্ত করেন। তার গবেষণা থেকে দেখা যায় যে কোর্স সিস্টেম প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীরা বইয়ের অভাব, বাসস্থান সংকট, পরীক্ষার আগে

সময়ের অভাব ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হন। তবুও তারা কোর্স সিস্টেমকে পছন্দ করেন। শিক্ষকদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি বলে প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটি হাতে নেয়া হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান দান, শিক্ষণীয় বিষয়ে তার জীবনে ব্যবহারিক উপযোগিতা, তার জ্ঞানের গভীরতা, প্রয়োগ ক্ষমতা, যোগ্যতার উন্নতি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি, শ্রেণি সংগঠন ও শৃঙ্খলা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যসূচি সমাপ্তিকরণ এবং সঠিক মূল্যায়ন কোর্স সিস্টেমের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই প্রস্তাবিত গবেষণার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অসুবিধাসমূহ সনাক্ত করতে হবে। তাছাড়া, প্রস্তাবিত গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো হলো :

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "কোর্স সিস্টেম" প্রবর্তনে উদ্ভূত সাধারণ অসুবিধাসমূহ নির্ণয়করণ।

(খ) বিদেশ ও স্বদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অসুবিধাসমূহ জানা।

(গ) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও গ্রেডিং পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষকদের অসুবিধাসমূহ সনাক্তকরণ।

(ঘ) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদান সংক্রান্ত অসুবিধাসমূহ নির্ণয় করা।

(ঙ) পদবি অনুযায়ী (প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক) শিক্ষকগণের অসুবিধাসমূহ জানা।

৫। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় পদ ও শব্দের সংজ্ঞা

কোর্স : কোর্স বলতে আমরা বুঝি এমন একটি সংগঠিত বিষয় যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকে।

শিক্ষক : শিক্ষক বলতে এখানে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ধরা হয়েছে।

কোর্স সিস্টেম : নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের ব্যবস্থাকে কোর্স সিস্টেম বলা যেতে পারে।

সীমাবদ্ধতা

প্রস্তাবিত গবেষণার জরিপ কাজ শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে এবং বিভিন্ন বিভাগের ১০০ জন শিক্ষকের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সময়ের স্বল্পতার জন্যই প্রস্তাবিত গবেষণার ক্ষেত্রকে ছোট করা হবে।

গবেষণার অনুমিত সিদ্ধান্ত

"কোর্স সিস্টেম" প্রবর্তনে-

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

(খ) পদবি অনুযায়ী শিক্ষকগণ ভিন্নতর অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

(গ) একই বিভাগের শিক্ষকগণ একই রকম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

(ঘ) মূল্যায়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষকগণ বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

(ঙ) বিদেশ ও স্বদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ ভিন্ন রকম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

গবেষণার পদ্ধতি

(ক) গবেষণার ক্ষেত্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেই গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে ধরা হবে।

(খ) নমুনা নির্বাচন : প্রস্তাবিত গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ১০০ জন শিক্ষককে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা হবে। নমুনায়নের জন্য দৈবচয়িত নমুনায়ন ব্যবহৃত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত ১০০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে পদবির সংখ্যা অনুপাতে নির্বাচন করা হবে। এই নির্বাচনের জন্য স্তরিত দৈবচয়িত নমুনায়ন ব্যবহৃত হবে।

(গ) প্রশ্নমালা তৈরি : প্রথমে একটা খসড়া প্রশ্নমালা তৈরি করে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরি করা হবে।

(ঘ) উপাত্ত সংগ্রহ : তথ্য সংগ্রহের জন্য চূড়ান্ত প্রশ্নমালা নির্বাচিত ১০০ জন শিক্ষকদের মধ্যে বিলি করা হবে এবং উত্তরপত্র সংগ্রহ করা হবে। প্রয়োজনে গবেষক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন এবং প্রশ্নমালা ব্যাখ্যা করবেন।

(ঙ) উপাত্ত বিশ্লেষণ কৌশল : শিক্ষকগণের প্রদত্ত উত্তর ও মতামতের গড়, শতকরা হিসাব এবং পারস্পরিক সম্পর্ক পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে সারণি আকারে উপস্থাপন করা হবে। লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই করা হবে।

প্রয়োজনীয় সময়

১০.১। আনুষঙ্গিক বইপত্র, গবেষণা ইত্যাদি অধ্যয়ন ও গবেষণার তত্ত্বগত ভিত্তি তৈরি	২ মাস
১০.২। গবেষণার প্রস্তাবপত্র তৈরি	১ মাস
১০.৩। প্রশ্নমালা তৈরি, পূর্ব-পরীক্ষা ও চূড়ান্তকরণ	২ মাস
১০.৪। উপাত্ত সংগ্রহ	২ মাস
১০.৫। উপাত্ত বিশ্লেষণ ও খসড়া রিপোর্ট তৈরি	২ মাস
১০.৬। চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি, টাইপ, প্রুফ দেখা ও বাঁধাই	২ মাস
	মোট ১২ মাস

গবেষণার বাজেট

১। আনুষঙ্গিক বইপত্র, গবেষণা ইত্যাদি সংগ্রহ ও পাঠ	৫০০.০০ টাকা
২। গবেষণার প্রস্তাবপত্র তৈরি, টাইপ ও বাঁধাই	৩০০.০০ টাকা
৩। খসড়া প্রশ্নমালা ছাপা	৫০০.০০ টাকা
৪। চূড়ান্ত প্রশ্নমালা ছাপা	৫০০.০০ টাকা
৫। তথ্য সংগ্রহ	৬০০.০০ টাকা
৬। উপাত্ত বিশ্লেষণ ও খসড়া প্রতিবেদন তৈরি	৫০০.০০ টাকা
৭। চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি, টাইপ ও বাঁধাই	১৫০০.০০ টাকা
৮। পরিবহন	১০০০.০০ টাকা
৯। স্টেশনারি ও বিবিধ	৩০০.০০ টাকা
	মোট ৫,৭০০.০০ টাকা

গবেষণার সংগঠন

প্রস্তাবিত গবেষণাটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হবে এগুলো হলো:

১। ভূমিকা।

২। সংশ্লিষ্ট গবেষণার পর্যালোচনা।

৩। গবেষণার পদ্ধতি।

৪। উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা।

৫। সার সংক্ষেপ, ফলাফল ও সুপারিশ।

তথ্যপঞ্জি

১। শামীম ফারুক, শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিও কোর্স সিস্টেমের প্রতি মনোভাব নির্ণয়, অপ্রকাশিত এম.এড. থিসিস, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

২। সুবলচন্দ্র সাহা, শিক্ষানীতির সারকথা, কোলকাতা: নিউ বুক স্টল, ১৯৭৫।

৩। Best, John W., *Research in Education*, New York; Englewood Chiff, N.J. Prentice Hall, Inc, 1960.

৪। Natarajan, V., *Monograph On Semester System for Universities*, New Delhi; Association of Indian Universities, 1979.

পঞ্চম অধ্যায়
সামাজিক গবেষণা
SOCIAL RESEARCH

সামাজিক গবেষণা কি

What is Social Research

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। নিজের প্রয়োজনেই সে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। এই সামাজিক জীবনে মানুষের থাকে বিভিন্ন সমস্যা এবং তাকে এসব সমস্যা সমাধান করতে হয়। সামাজিক গবেষণা হলো সমাজে মানুষের আচরণ, তার সামাজিক জীবন, সামাজিক জীবনে তার বিভিন্ন সমস্যা ও এদের সমাধান, ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া, পদ্ধতিগতভাবে তথ্যানুসন্ধান এবং এসব বিষয়ের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ লাভ। অন্য কথায়, সামাজিক গবেষণা হলো পদ্ধতিগত উপায়ে অব্যাখাত সামাজিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা, অনুসন্ধান, সন্দেহজনক বা দ্বিধাগ্রস্ত ঘটনাসমূহের সুস্পষ্টকরণ এবং সমাজজীবন সম্পর্কিত ভুল ধারণার পরিবর্তন ও সংশোধন। কোনো তত্ত্ব বিকাশে বা কোনো শিল্পকলা অনুশীলনে জ্ঞানের বিস্তৃতি, সংশোধন ও যাচাইয়ের লক্ষ্যে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলি অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ধ্যান ধারণা মূর্তকরণের সুসংবদ্ধ পদ্ধতিকে সামাজিক গবেষণা বলা যেতে পারে। ইয়ঙ (Pauline V. Young) এর মতে, "সামাজিক গবেষণা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হলো যুক্তিযুক্ত ও সুসংবদ্ধ কৌশলের মাধ্যমে–

(ক) নতুন সত্য বা ঘটনার আবিষ্কার এবং পুরনো সত্য বা ঘটনা যাচাই।

(খ) এসব ঘটনার ধারাবাহিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং যথোপযুক্ত তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে উদ্ভূত (derived) কার্যকারণ ব্যাখ্যা।

(গ) নতুন উপকরণ, ধারণা ও তত্ত্বের বিকাশসাধন, যা মানব আচরণের নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ পর্যলোচনাকে সহজ করবে।

৩.২। সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন ধাপ

Steps in Social Research

সামাজিক গবেষণা হলো সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ, তার সামাজিক জীবন এবং সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কিত সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিক

অনুসন্ধান প্রক্রিয়া। যেকোনো গবেষণার মতো সামাজিক গবেষণারও বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। এসব ধাপ অনুসরণ করলে কার্যকরভাবে গবেষণা পরিচালিত করা যায়। এসব ধাপ অনুসরণ না করলে এমন অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে যার পরিণাম হিসাবে গবেষণা কর্মটি চালিয়ে নেয়া সম্ভব হয় না।

সামাজিক গবেষণার ধাপগুলো নিম্নরূপ–

১। পর্যবেক্ষণ (Observtion)
২। গবেষণার জন্য সমস্যা নির্বাচন (Selection of the research problem)
৩। আনুষঙ্গিক বইপত্র, গবেষণা, জার্নাল ইত্যাদির পর্যালোচনা (Review of related literature)
৪। গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ (Determining the aims and objectives of research.)
৫। ব্যবহৃত ধারণা, চল ও পদসমূহের বিশ্লেষণ (Analysis of concepts, variable and term used)
৬। অনুমিত সিদ্ধান্ত তৈরি (Developing the hypothesis)
৭। গবেষণার নকশা তৈরি (Preparing research design)
৮। নমুনার নকশা নিরূপণ (Determining sample design)
৯। গবেষণার উপকরণ তৈরি (Preparation of tools for research)
১০। তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ (Collecting data)
১১। তথ্য বা উপাত্ত বিশ্লেষণ (Analysis of data)
১২। অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই (Hypothesis testing)
১৩। সাধারণীকরণ ও ব্যাখ্যা দান (Generalization and interpretation)
১৪। প্রতিবেদন তৈরি বা ফলাফল উপস্থাপন (Preparation of the report of presentation of the results)

১। **পর্যবেক্ষণ** : সামাজিক গবেষণার জন্য পর্যবেক্ষণ স্তরটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধাপে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন চাহিদা ও সমস্যা সনাক্ত করা হয় এবং এদের সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যাতে পরবর্তীতে গবেষণার জন্য একটি উত্তম সমস্যা নির্বাচন করা যায়।

২। **গবেষণার সমস্যা নির্বাচন** : গবেষণার জন্য সমস্যা নির্বাচন সামাজিক গবেষণার দ্বিতীয় ধাপ। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত চাহিদা ও সমস্যাগুলো থেকে গবেষক তার সমস্যা নির্বাচন করতে পারেন। এ ব্যাপারে গবেষক তার সহকর্মী বা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলাপ -আলোচনা করতে পারেন। শিক্ষার্থী গবেষকগণ তার

গাইড এর পরামর্শ নিয়েও সমস্যা নির্বাচন করতে পারেন। অনেক সময় গবেষণার ব্যয়ভার বহনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নির্দিষ্ট সমস্যা গবেষণার জন্য দিয়ে থাকেন।

৩। আনুষঙ্গিক গবেষণা ও বইপত্র পর্যালোচনা : সমস্যা নির্বাচনের পর এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পড়াশুনা করতে হবে। গবেষকের গবেষণার বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত গবেষণা প্রতিবেদন, বইপত্র, জার্নাল, পত্রপত্রিকা তাকে পড়ে নিতে হবে। এই ব্যাপক পাঠ সমস্যার প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে বুঝতে সহায়তা করে। এই পাঠ থেকে অর্জিত জ্ঞান গবেষককে গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যোপযোগী অনুমিত সিদ্ধান্ত, গবেষণার নকশা প্রণয়ন ইত্যাদিতে সহায়তা করে থাকে।

৪। গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেকোনো গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো গবেষণাই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। গবেষণার পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট না হলে গবেষণা কাজ সঠিক ও নিষ্কণ্টক ভাবে অগ্রসর হতে পারে না। এই উদ্দেশ্য প্রণয়নে গবেষককে অতি উচ্চাভিলাষী হলে চলবে না কারণ, তাকে এসব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে। গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে কার্যোপযোগী অনুমিত সিদ্ধান্ত লেখা হয়।

৫। ব্যবহৃত পদ, ধারণা ও চলসমূহের বিশ্লেষণ : এই ধাপে গবেষণায় ব্যবহৃত ধারণা ও চলসমূহের বিশ্লেষণ করা হয় এবং সংজ্ঞা দেয়া হয়। গবেষণার সমস্যা সুস্পষ্টকরণের জন্য এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৬। অনুমিত সিদ্ধান্ত তৈরি : এরপর গবেষককে যা করতে হয় তা হলো কার্যোপযোগী অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন। এই অনুমিত সিদ্ধান্ত হবে সুস্পষ্ট। অনুমিত সিদ্ধান্ত হলো এমন বিবৃতি যাকে গবেষণার শুরুতে নির্বাচিত বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের ভিত্তিতে অস্থায়িভাবে সত্য বলে ধরে নেয়া হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে তথ্যানুসন্ধান করা হয়। এটি জ্ঞান ও তত্ত্ব থেকে সাময়িকভাবে নির্মিত এক ধরনের অনুমিত বা বর্তমানে অজ্ঞাত অন্যান্য সত্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে। অনুমিত সিদ্ধান্ত গবেষণার দিক নির্দেশ করে থাকে, চিন্তন প্রক্রিয়া ও আবিষ্কার প্রক্রিয়ার গাইড হিসাবে কাজ করে, এটি অন্ধভাবে গবেষণা পরিচালনায় বাধা প্রদান করে এবং গবেষকের সামনে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উপস্থাপন করে। এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের রূপরেখা হিসাবেও কাজ করে।

সমস্যার উৎস এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, সহকর্মী বা গাইড শিক্ষকের আলোচনা অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠনে সহায়তা করে। পূর্ববর্তী গবেষকদের উপাত্ত, রেকর্ড, ফলাফল বা আনুষঙ্গিক গবেষণা ইত্যাদির পর্যালোচনাও অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠনের সহায়ক। এছাড়া সীমিত পর্যায়ে ব্যক্তিগত বা মাঠ পর্যায়ের সাক্ষাৎকার অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠনে সহায়তা করে।

৭। গবেষণার নকশা তৈরি : গবেষণার সমস্যা নির্বাচন এবং এর সুস্পষ্ট বিবরণদানের পর গবেষককে তার গবেষণার একটি নকশা তৈরি করতে হয়। গবেষণার নকশাকে গবেষণা পরিচালনার ধারণাভিত্তিক কাঠামো বা নীলনকশা (blueprint) বলা যেতে পারে। গবেষণার এই ধাপটি গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল ধাপ। এই নকশা অনুসারে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণার নকশা গবেষককে ন্যূনতম প্রচেষ্টা, সময় ও আর্থিক ব্যয় দ্বারা উপাত্ত সংগ্রহে সহায়তা করে। নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করে গবেষণার নকশা তৈরি করা হয়–

(ক) গবেষণার উদ্দেশ্য; (খ) গবেষণার প্রকৃতি; (গ) তথ্য সংগ্রহের উপায়; (ঘ) গবেষণার নমুনা; (ঙ) গবেষকের ও তার সাহায্যকারী স্টাফদের (যদি থাকে) দক্ষতা ও যোগ্যতা; (চ) গবেষণার জন্য প্রাপ্ত সময়; (ছ) গবেষণার জন্য ব্যয় এবং আর্থিক সাহায্যের সম্ভাবনা।

৮। নমুনার নকশা নিরূপণ : গবেষণার জন্য নমুনা নির্বাচন গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। অনুসন্ধানের বিষয়ের সবকিছু মিলে তৈরি হয় তথ্যবিশ্ব (universe) বা সমগ্রক (population)। সমগ্রক বা তথ্যবিশ্ব থেকে নমুনা নির্বাচনকে বলা হয় নমুনায়ন (sampling), নমুনা নির্বাচনের উপায়কে বলা হয় নমুনার নকশা প্রণয়ন। কোনো নির্দিষ্ট তথ্যবিশ্ব থেকে নমুনা সংগ্রহের পূর্বে যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়া হয় তাই গবেষণার নমুনার নকশা। নমুনায়ন পদ্ধতি বা নমুনার নকশা বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন–

(ক) স্বেচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নমুনায়ন : (purposive sampling)-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা ইচ্ছাকৃতভাবে নমুনায়ন।

(খ) দৈবচয়িত নমুনায়নে বা অক্রম নমুনায়ন : (random sampling) এখানে তথ্যবিশ্বের সকলের নির্বাচিত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে।

(গ) রীতিবদ্ধ নমুনায়ন : কোনো তথ্যবিশ্বকে ক্রমানুসারে বা কোনো বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাজিয়ে যেমন, কোনো তালিকার প্রত্যেক দশটি নামের পর ১টি নাম নির্বাচন ইত্যাদিকে বলা হয় রীতিবদ্ধ নমুনায়ন।

(ঘ) স্তরিত নমুনায়ন : এই পদ্ধতিতে তথ্যবিশ্বকে কতগুলো উপতথ্যবিশ্বে বা স্তরে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি ভাগ থেকে নমুনা নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি ভাগ থেকে দৈবচয়িক নমুনায়নের মাধ্যমে যদি নমুনা নির্বাচন করা হয় তাহলে তাকে স্তরিত দৈবচয়িত নমুনায়ন বলে।

(ঘ) গুচ্ছ নমুনায়ন : তথ্যবিশ্বকে দলে বা গুচ্ছে ভাগ করে নমুনায়নের মাধ্যমে যদি দলকে নির্বাচন করা হয় তাহলে তাকে গুচ্ছ নমুনায়ন বলে।

৯। গবেষণার উপকরণ তৈরি : গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য উপকরণ তৈরি সামাজিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। গবেষণার উপকরণ সঠিক, কার্যকরী,

যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য না হলে ঐ উপকরণ দ্বারা যে তথ্য সংগৃহীত হয় তা দিয়ে গবেষণার অর্জিত হয় না। নির্ভরযোগ্য ও পক্ষপাতহীন তথ্য পেতে হলে গবেষণার উপকরণ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ হতে হবে। প্রশ্নমালা, সিডিউল ইত্যাদি গবেষণার উপকরণ।

১০। তথ্য সংগ্রহ সামাজিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সামাজিক জীবনের কোনো সমস্যা নিয়ে গবেষণা করতে গেলে প্রায়ই দেখা যায় হাতের কাছে যে তথ্য পাওয়া যায় তা খুবই অপর্যাপ্ত, এজন্য যথোপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। বিভিন্ন উপায়ে এই তথ্য সংগ্রহ করা যায় তবে এটি নির্ভর করে গবেষণার প্রকৃতির উপর। যেমন–

(ক) পর্যবেক্ষণ : কোনো উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ না করে গবেষক নিজের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই তথ্য বা উপাত্ত (data) সংগ্রহ করেন।

(খ) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার : পূর্ব নির্ধারিত কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে নমুনায়িত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে এই পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

(গ) টেলিফোন সাক্ষাৎকার : টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতি খুব একটা ব্যবহৃত হয় না।

(ঘ) ডাকে প্রশ্নমালা প্রেরণ ও গ্রহণ : অনেক সময় গবেষক উত্তরদাতাদের নিকট ডাকে প্রশ্নমালা প্রেরণ করেন এবং উত্তরদাতাদের প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানান। এভাবে পূরণকৃত প্রশ্নমালার সাহায্যে উপাত্ত বা তথ্য সংগৃহীত হয়।

(ঙ) সিডিউলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ : এই পদ্ধতিতে একদল কর্মীকে নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং তাদের দিয়ে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রশ্নমালা পূরণ করিয়ে আনা হয়।

(চ) কেসস্টাডি : কোনো বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে জানার জন্য এই ধরনের ব্যাপক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

১১। উপাত্ত বিশ্লেষণ : এই ধাপে সংগৃহীত উপাত্ত বা তথ্যকে বিশ্লেষণ করা হয়। এই ধাপে উপাত্তের শ্রেণিকরণ (classification), সম্পাদনা (editing), সংকেতায়ন বা কোডিং (coding) ও সারণীকরণ করা হয় এবং ব্যাখ্যা দেয়া হয়। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত কৌশল ব্যবহৃত হয়। খুব বেশি উপাত্ত হলে তা কমপিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

১২। অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই : তথ্য বিশ্লেষণের পর গবেষক তার অনুমিত সিদ্ধান্ত (যদি তিনি পূর্বে করে থাকেন) যাচাই করেন। অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন অভীক্ষা (test) যেমন কাই-বর্গ অভীক্ষা, t অভীক্ষা, F অভীক্ষা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এসব অভীক্ষার মাধ্যমে অনুমিত সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট স্তরে বাতিল হতে পারে অথবা গৃহীত হতে পারে।

১৩। সাধারণীকরণ ও ব্যাখ্যাকরণ : অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষক কোনো বিষয় সম্পর্কে সাধারণীকরণ করতে পারেন। গবেষক যদি অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে থাকেন তাহলে কোনো তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি তার ফলাফলকে ব্যাখ্যা করতে পারেন। একে বলা হয় ব্যাখ্যাকরণ (interptetation)।

১৪। প্রতিবেদন তৈরি ও ফলাফল প্রকাশ : এটি গবেষণার সর্বশেষ ধাপ। গবেষক যা করেছেন তা তাকে প্রতিবেদন বা থিসিস আকারে লিখতে হয় এবং এর মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

সামাজিক গবেষণার উপযোগিতা

Utility of Social Research

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। প্রত্যেক মানুষই চায় একটি সুখী ও সুন্দর সমাজে বসবাস করতে। তাই তার আকাঙ্ক্ষা থাকে সমাজটাকে উন্নত করতে, আদর্শরূপে গড়ে তুলতে। কিন্তু, সমাজের পরিবর্তন সাধন করতে হলে, এর বিভিন্ন দিকগুলোকে মনমতো করে গড়ে তুলতে হলে, আগে জানতে হবে সমাজের বর্তমান অবস্থাটা কি? এর অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অংশের বাস্তব অবস্থা, সম্পর্ক, কার্যকারণ, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে সমাজ উন্নয়নের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ বা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। গবেষণার একটি দিক হলো নতুন জ্ঞানের অনুসন্ধান। সামাজিক গবেষণা সমাজ সম্পর্কে আমাদের নতুন জ্ঞান দান করে সামাজিক বাস্তবতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি খুলে দেয়। সমাজের রহস্য ও অন্ধকার দিকগুলোকে উন্মোচনে সহায়তা করে।

সামাজিক বিজ্ঞানের একজন গবেষকের কাজ হলো কোনো সামাজিক ঘটনার ও সামাজিক ব্যবস্থায় প্রয়োগযোগ্য সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিক আচরণের প্যাটার্ন ও সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আবিষ্কার করা। এ ছাড়া সামাজিক বিজ্ঞানের একজন গবেষক সামাজিক অবস্থা, ব্যক্তি অথবা দল এর প্রকারভেদ ও শ্রেণি নিয়ে কাজ করেন। মানুষের মৌলিক চাহিদা ও কল্যাণের সাথে তার জ্ঞানানুসন্ধানের সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং সামাজিক গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক গবেষণার উপযোগিতা নিম্নরূপ :

১। সামাজিক পরিকল্পনার নির্দেশ জনগণের দায়দায়িত্ব এবং সামাজিক সম্পদ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পদ্ধতিগত ও সুসংবদ্ধ জ্ঞানের উপর সামাজিক পরিকল্পনা নির্ভর করে। কোনো কল্পিত উপাত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো পরিকল্পনা কখনও সফল হতে পারে না। সুতরাং সামাজিক গবেষণায় খরচের চেয়ে লাভই বেশি।

২। সামাজিক গবেষণা সামাজিক সংগঠন, সমাজের কর্মকাণ্ড ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিভাস (Phenomenon) বা ঘটনার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দান করে।

৩। জ্ঞান মানুষকে কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে। সামাজিক গবেষণা সমাজের কুসংস্কার ও খারাপ দিকগুলো (যদি থাকে) সনাক্ত ও দূরীকরণে সহায়তা করে।

৪। সমাজের কল্যাণসাধনে সামাজিক গবেষণার প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। সব সমাজেই কম বেশি অসংগতি বর্তমান। সামাজিক গবেষণার দ্বারা এসব অসংগতি সম্পর্কে জ্ঞান ও উপলব্ধির মাধ্যমে এগুলো দূর করা সম্ভব।

৫। যেকোনো সমাজের উন্নয়নের জন্য ঐ সমাজ ও অন্যান্য সমাজ সম্পর্কে নিবিড় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সামাজিক গবেষণা স্ব স্ব সমাজ ও অন্যান্য সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মানুষকে সমাজ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

সামাজিক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

Methods of Data Collection in Social Research

গবেষণার বিষয় (সমস্যা) নির্বাচন ও বর্ণনা এবং গবেষণার নকশা প্রণয়নের পর তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়। দু'রকমের তথ্য সংগৃহীত হতে পারে (ক) প্রাথমিক উপাত্ত (Primary data) ও (খ) মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় প্রকার উপাত্ত (secondary data)। প্রাথমিক উপাত্ত হলো মূল উপাত্ত বা প্রথমবার গবেষক কর্তৃক সরাসরি সংগৃহীত। মাধ্যমিক উপাত্ত হলো অন্যের সংগৃহীত ও পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষিত উপাত্ত যা থেকে গবেষক তার নিজের গবেষণার জন্য উপাত্ত সংগ্রহ করেন।

জরিপ ও বর্ণনামূলক গবেষণার প্রাথমিক উপাত্ত বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলো হলো (ক) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (observation method) (খ) সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (interview method) (গ) প্রশ্নমালার মাধ্যমে (through questionnaire) (ঘ) সিডিউলের দ্বারা (through schedule) (ঙ) যান্ত্রিক পদ্ধতি (through mechanical device) (চ) প্রক্ষেপ পদ্ধতি (projective technique) (ছ) কেসস্টাডি (case study) ও (জ) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (content analysis)।

(ক) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি : তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসাবে বিশেষ করে আচরণ বিজ্ঞানের (behavioural science) যেমন মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বহুল প্রচলিত। আমরা প্রতিনিয়তই আমাদের চারপাশের জিনিসি পর্যবেক্ষণ করি। এ ধরনের পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ নয়, উদ্দেশ্যবিহীন পর্যবেক্ষণ। উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ তখনই বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার বা উপকরণ ও পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হবে যখন এটি গবেষণার উদ্দেশ্যে, পদ্ধতিগত, পরিকল্পিত ও রেকর্ডকৃত হবে এবং যথার্থতা ও নির্ভরতার যাচাই ও নিয়ন্ত্রণে স্পষ্ট হবে। এই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষক উত্তরদাতাদের অজান্তে নিজে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এই পদ্ধতির সুবিধা হলো সঠিকভাবে উপাত্ত সংগৃহীত হলে

এতে ব্যক্তি পক্ষপাতিত্ব থাকে না। দ্বিতীয়ত চলতি ঘটনার তথ্য সংগৃহীত হয় তাই অতীত ও ভবিষ্যৎ মনোভাব বা ইচ্ছা দ্বারা এটি জটিল হয়ে পড়ে না। এতে উত্তরদাতার উত্তরদানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয় না। তবে পর্যবেক্ষকের যথেষ্ট ধৈর্য থাকতে হয়। এই পদ্ধতি ব্যয়বহুল। এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত উপাত্তের সীমাবদ্ধতা থাকে এবং অনেক ব্যক্তিকে বিভিন্ন কারণে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না।

এই পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহে গবেষককে অবশ্যই ঠিক করে নিতে হবে তিনি কী পর্যবেক্ষণ করবেন? এই পর্যবেক্ষণ কি ভাবে রেকর্ড করতে হবে? পর্যবেক্ষণের সঠিকতা কি ভাবে নিশ্চিত করতে হবে?

সমস্যা ও প্রকৃতি অনুসারে নিম্নোক্ত ধরনের পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা যায়। যেমন, কাঠামোগত বা সংগঠিত পর্যবেক্ষণ (sturctured observation), কাঠামোহীন বা অসংগঠিত পর্যবেক্ষণ (unstructured observation), নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ (controlled observation) ও অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের জন্য সাধারণত সিডিউল, মনোভাব পরিমাপক স্কেল, মানচিত্র, চিত্রগ্রহণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

(খ) সাক্ষাৎকার পদ্ধতি : তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী ও উত্তরদাতা (সাক্ষাৎকারদানকারী) এর মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাকে সাক্ষাৎকার বলা যেতে পারে। এটি ব্যক্তি সাক্ষাৎকার বা টেলিফোন সাক্ষাৎকার হতে পারে। গবেষক ব্যক্তিগতভাবে মাঠপর্যায়ে গিয়ে উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারেন বা টেলিফোনের মাধ্যমেও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারেন। তবে দ্বিতীয় পদ্ধতি খুব একটা ব্যবহৃত হয় না। সিডিউলের মাধ্যমেও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সাক্ষাৎকার যদি কাঠামোগত বা সংগঠিত উপায়ে গ্রহণ করা হয় তাহলে তাকে সংগঠিত সাক্ষাৎকার বলে। পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্ন ও আদর্শায়িত রেকর্ডকরণ পদ্ধতিতে এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। অসংগঠিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব নির্ধারিত কোনো প্রশ্ন থাকে না এবং সাক্ষাৎকার রেকর্ড করার কোনো আদর্শায়িত পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয় না।

এই পদ্ধতির সুবিধা হলো :

(১) এই পদ্ধতিতে অনেক বেশি ও ব্যাপকতর তথ্য সংগ্রহ করা যায়। (২) সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তার দক্ষতার গুণে উত্তরদাতার প্রদত্ত প্রতিবন্ধকতা (যদি থাকে) কাটিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারেন। (৩) এই পদ্ধতিতে বিশেষ করে অসংগঠিত সাক্ষাৎকারের বেলায় প্রশ্নগুলো পুনর্গঠিত করা যায়। (৪) উত্তরদাতার ভাষা ও শিক্ষার স্তরের সাথে খাপ খাইয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে।

অসুবিধা হলো :

(১) ব্যয়বহুল। বিশেষ করে অনেক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নমুনায়ন করলে এই অসুবিধা হয়। (২) সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর পক্ষপাতিত্ব এর উপাত্তের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। (৩) সময় বেশি ব্যয় হয়। (৪) উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎকারের জন্য সময় নাও দিতে পারেন। (৫) সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর উপস্থিতি উত্তরদাতাদের অতি উৎসাহী করতে পারে।

(গ) প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ : উপাত্ত সংগ্রহের এই পদ্ধতি খুবই জনপ্রিয়। গবেষণার নমুনা যখন খুব ব্যাপক হয় এবং তাদের অবস্থান যদি কাছাকাছি না হয় তখন সাধারণত প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত প্রশ্নমালা ডাকযোগে উত্তরদাতার নিকট পাঠানো হয়, উত্তরদাতা প্রশ্নমালাটি পূরণ করে ফেরত পাঠান। অবশ্য প্রয়োজনবোধে লোক মারফতও প্রশ্নমালা পাঠানো হয়।

সাধারণত তথ্য সংগ্রহের বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলি সিডিউলের মতো প্রশ্নমালায় পরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত করা হয় এবং কোনো প্রশ্নের একাধিক উত্তর থেকে উত্তরদাতার শুধু একটি উত্তর নির্বাচনের সুযোগ থাকে। এই ধরনের প্রশ্নমালাকে সংগঠিত প্রশ্নমালা (structured questionnaires) বলা হয়। অসংগঠিত প্রশ্নমালার প্রশ্নের কোনো নির্দিষ্ট উত্তর দেয়া থাকে না, উত্তরদাতা স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের সুবিধা হলো : (১) খুব বড় বা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে নমুনা নির্বাচন করলেও এই পদ্ধতিতে অর্থ ব্যয় কম হয়। (২) এটি সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর পক্ষপাত থেকে মুক্ত। (৩) উত্তরদাতা সময় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে উত্তর দিতে পারেন। (৪) যাদের নিকট সাক্ষাৎকারের জন্য যাওয়া সম্ভব নয়, তাদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা যায়। (৫) নমুনা অনেক বড় হওয়ায় তথ্য অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হয়।

এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলো হলো : (১) উত্তরদাতাগণ খুব কম প্রশ্নমালাই ফেরত পাঠান। (২) উত্তরদাতা শিক্ষিত হলে এবং সহযোগিতা করলেই এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব। (৩) প্রশ্নমালা পাঠানোর পর এর উপর গবেষকের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। (৪) দ্ব্যর্থক উত্তর পাওয়া যেতে পারে, কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়তে পারে। (৫) উত্তরদাতা প্রকৃতপক্ষে তথ্যবিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী কিনা তা বোঝার উপায় নেই। (৬) এটি সবচেয়ে ধীরগতির পদ্ধতি।

(ঘ) সিডিউলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ : এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের মতোই; পার্থক্য এইটুকু যে, প্রশ্নমালা উত্তরদাতা নিজে পূরণ করেন আর সিডিউল পূরণ করেন গবেষক কর্তৃক নিয়োগকৃত কোনো ব্যক্তি।

প্রশ্নমালা ডাকে পাঠানো হয় কিন্তু সিডিউল নিয়ে নিয়োগকৃত ব্যক্তি গবেষণার স্থানে যান এবং সিডিউলের নির্দিষ্ট জায়গায় উত্তরদাতার উত্তর রেকর্ড করেন। কখনও কখনও সিডিউল উত্তরদাতাকে দিয়েও পূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে নিয়োগকৃত ব্যক্তি প্রয়োজনবোধে তাকে সাহায্য করেন এবং গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে উত্তরদাতার নিকট ব্যাখ্যা দেন যাতে তিনি সঠিক জবাব দিতে পারেন। তথ্য সংগ্রহের এই পদ্ধতি ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য খুবই ভালো এবং নির্ভরযোগ্য কিন্তু এই পদ্ধতি খুব ব্যয়বহুল।

(ঙ) যান্ত্রিক পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে পরোক্ষ উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য ক্যামেরা, সাইকোগ্যালনোমিটার ও চলচ্চিত্র ব্যবহৃত হয়। এছাড়া টেপরেকর্ডারও ব্যবহৃত হতে পারে। উন্নত দেশসমূহে এই পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

(চ) প্রক্ষেপ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিকে পরোক্ষ সাক্ষাৎকার কৌশলও বলা হয়। সাধারণত মনোবিজ্ঞানীগণ ব্যবহার করে থাকেন। উত্তরদাতার কোনো অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, প্রেরণা, মনোভাব, উত্তেজনা বা প্ররোচনা ও ইচ্ছা, যা উত্তরদাতা প্রকাশে বাধা পান বা প্রকাশ করতে সক্ষম নন তা জানার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে উত্তরদাতা তার অজ্ঞাতে বিষয়টি সম্পর্কে তার নিজের মনোভাব ও অনুভব প্রকাশ করেন। প্রেরণা ও মনোভাব বিষয়ক গবেষণায় এই পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসূ। এই পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়।

(ছ) কেসস্টাডি : এই পদ্ধতি বিশ্লেষণের জন্য খুবই জনপ্রিয়। কোনো সামাজিক ইউনিট, যেমন-কোনো ব্যক্তি, কোনো পরিবার, কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো সাংস্কৃতিক দল বা পুরো সমাজ বা সম্প্রদায় এর সতর্ক ও পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণকে কেসস্টাডি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে সমস্যার নমুনাকে বিস্তৃত না করে গভীরতম ভাবে পর্যালোচনা করা হয়। কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক ঘটনা বা অবস্থা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর এই গবেষণা গুরুত্বারোপ করে।

এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো : (১) এই পদ্ধতিতে গবেষক গবেষণার জন্য একটিমাত্র ইউনিট নির্বাচন করেন। (২) নির্বাচিত ইউনিটের গভীর ও নিবিড় অনুসন্ধান করেন। (৩) এই পদ্ধতি গুণগত, পরিমাণগত নয়। (৪) এই পদ্ধতিতে কার্যকারণ নিয়ামকের পারস্পরিক সম্পর্ক জানার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। (৫) নির্বাচিত ইউনিটের আচরণ-বিন্যাস (behaviour pattern) কোনো পরোক্ষ বা বিমূর্ত পদ্ধতিতে অনুসন্ধান না করে প্রত্যক্ষভাবে করা হয়।

এই পদ্ধতির সুবিধাগুলো হলো : (১) কেসস্টাডি সামাজিক ইউনিটের গভীর ও নিবিড় পর্যালোচনা বা অনুসন্ধান, তাই এই পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট ইউনিটের আচরণিক

বিন্যাস পূর্ণাঙ্গভাবে উপলব্ধিতে সহায়তা করে। (২) কেসস্টাডির মাধ্যমে গবেষক তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রকৃত ও সমৃদ্ধিশালী রেকর্ড পেতে পারেন, এমন কোনো আচরণের প্যাটার্নকে গ্রহণ করতে পারেন যা মানুষের অন্তর্নিহিত, টেনশন ও প্রেষণাকে প্রকাশ করে। এই পদ্ধতি গবেষককে সামাজিক ইউনিটিটির স্বাভাবিক ইতিহাস এবং এর সাথে সামাজিক নিয়ামক ও তার পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের সম্পর্ক বের করতে সহায়তা করে। (৪) উপাত্তের সাথে প্রাসঙ্গিক অনুমিত সিদ্ধান্ত তৈরিতে এই পদ্ধতি সহায়তা করে, ফলে উপাত্তগুলো অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাইয়ে সহায়তা করে। (৫) এই পদ্ধতি সামাজিক ইউনিটের সুগভীর অনুসন্ধানে সহায়তা করে যা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বা সিডিউলের মাধ্যমে সম্ভব নয়। (৬) ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে গুরুত্ব দেয় বলে এই পদ্ধতি সামাজিক ইউনিটটির অতীত জানতে সহায়তা করে। (৭) এই পদ্ধতি গবেষকের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে, ফলে গবেষকের বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

এই পদ্ধতির অসুবিধা হলো : ১। এতে অনেক বেশি সময় লাগে এবং পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল। ২। এই পদ্ধতি বিভিন্ন অনুমিতির ভিত্তির উপর কাজ করে যা সব সময়ে বাস্তবসম্পন্ন নাও হতে পারে, ফলে এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত উপাত্ত সন্দেহমুক্ত হয় না। ৩। এই পদ্ধতি শুধু সীমিত পরিসরে ব্যবহার করা যায়, কোনো বড় সমাজে এই পদ্ধতির ব্যবহার সম্ভব নয়।

(ঝ) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি : দলিলপত্র, বই, সাময়িকী, সংবাদপত্র এবং অন্যান্য মৌখিক বিষয় (কেউ বলেছেন বা লেখা আছে) এর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণকে বলা হয় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ। বার্নাড বেলেসনের মতে, "গণসংযোগের মাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়ের রীতিবদ্ধ, বস্তুনিরপেক্ষ ও বিষয়ে গবেষণার পর্যালোচনা প্রকাশিত গবেষণার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু নয়।" কোনো পত্র-পত্রিকা, পুস্তক, সাময়িকী ইত্যাদির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে :

(ক) বিশ্লেষণের শ্রেণিবিভাগের মাধ্যমে বিষয়সমূহকে শ্রেণিবদ্ধ করতে হবে যাতে সকল গবেষক শ্রেণিগুলোকে উপসংহার যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারেন।

(খ) অন্যান্য বিষয়ের সাথে তুলনা করার জন্য পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রকাশিত বিষয়গুলোর উপর প্রাপ্ত বিভিন্ন ধারণার গুরুত্ব পরিমাপ করতে হবে।

বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণার সমস্যা

Problem Related to Social Research in Bangladesh

গবেষণা হলো নতুন জ্ঞান অনুসন্ধানের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া। সামাজিক গবেষণা হলো সামাজিক পরিবেশ, মানুষের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, সামাজিক পরিবেশ

নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন নিয়ামক ইত্যাদি সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান। সামাজিক গবেষণা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। সুতরাং বাংলাদেশের জন্য সামাজিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করতে হলে একজন গবেষককে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যা হলো :

১। **অশিক্ষিত, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠী** : আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক অশিক্ষিত। অশিক্ষার কারণে সমাজ, সংস্কার ও সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। অশিক্ষা-কুশিক্ষার দরুন বিভিন্ন কুসংস্কার তাদের নিত্যসঙ্গী। এসব কারণে তারা সামাজিক গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই তারা সঠিক তথ্য সরবরাহে দায়িত্বশীল হয় না। এরকম সামাজিক অবস্থা গবেষণা পরিচালনায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অশিক্ষিত জনগণ কোনোকিছু গুছিয়ে বলতে পারে না। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তা গুলিয়ে দেখেন বলে মূল বক্তব্যই বদলে যায়।

২। **জনসাধারণ সাহায্য পাবার আশায় অতিরঞ্জিত তথ্য পরিবেশন করে** : আমাদের দেশে বিভিন্ন দুর্যোগের সময় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জনগণকে সাহায্য করা হয়। ফলে জনগণ সম্পর্কে কোনো তথ্য নিতে গেলে সাহায্য পাবার আশায় তারা তাদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা না করে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করে, ফলে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

৩। **অর্থের অভাব** : যেকোনো গবেষণা পরিচালনার জন্য অর্থ অপরিহার্য কিন্তু, এদেশে গবেষণা পরিচালনার জন্য অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয় না। যেসব প্রতিষ্ঠানে গবেষণার জন্য অর্থ প্রদান করা হয় তা হয় নিতান্তই অপ্রতুল।

৪। **অর্থের অপব্যবহার** : এদেশে গবেষণার জন্য যে অপর্যাপ্ত অর্থ প্রদান করা হয় তার বেশিরভাগ অর্থের অপব্যবহার হয়। কোনো গবেষণায় তথ্যসংগ্রহের (যদি মাঠ পর্যায়ের গবেষণা হয়) জন্য অর্থের একটি প্রধান অংশ ব্যয়িত হওয়া উচিত কিন্তু, দেখা যায় যারা তথ্যসংগ্রহ করেন তাদের প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ প্রদান করা হয় না। এতে তারা তথ্যসংগ্রহে যত্নবান হয় না। বিশেষ করে বিদেশি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যে গবেষণা করার বেলায় গবেষণা কাজের প্রতি যত্নবান না হয়ে গবেষকগণ অর্থের হিসাবটাই বেশি করেন। এছাড়া গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কোনো রকম সমন্বয় না থাকায় একাধিক প্রতিষ্ঠান একই গবেষণা করেন, ফলে অর্থের অপচয় হয়।

৫। **গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা** : বাংলাদেশে গবেষণা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের খুবই অভাব কারণ, এদেশে গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যথার্থরূপে স্বীকৃত

নয়। যে অল্পসংখ্যক গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে সুষ্ঠুভাবে গবেষণা পরিচালিত হয় না।

৬। **দক্ষ গবেষক ও কর্মীর অভাব :** এদেশে যেহেতু গবেষণা করার সুযোগ কম তাই গবেষণার মতো একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য দক্ষ গবেষক ও কর্মীর খুবই অভাব। এখানে গবেষণা কর্মীদের প্রশিক্ষণের তেমন ব্যবস্থা নেই, তাই যাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন অদক্ষ কর্মীকে সামান্য প্রশিক্ষণ দিয়ে গবেষণার কাজে নিয়োগ করা হয়। ফলে যে উদ্দেশ্যে গবেষণা পরিচালিত হয়, যথোপযুক্ত তথ্যের অভাব ও বিশ্লেষণের ত্রুটির কারণে সেই উদ্দেশ্য সফল হয় না।

৭। **তথ্যসংগ্রহের অসুবিধা :** অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ঢাকায় অবস্থিত বলে প্রায় সকল গবেষণার তথ্যই আশেপাশের এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়, তাই একই ব্যক্তি বহুবার সাক্ষাৎদান করেন, ফলে অনেক সময় বিরক্ত হয়ে সাক্ষাৎকার দানে অস্বীকৃতি জানায় বা ভুল তথ্য প্রদান করে থাকে। এছাড়া গ্রামের মাতব্বর ও নেতা শ্রেণির ব্যক্তিগণ সাধারণত দরিদ্র গ্রামবাসী সাক্ষাৎকার প্রদান করুক সেটা পছন্দ করেন না ফলে তথ্যানুসন্ধানকারী ঐসব নেতৃস্থানীয় লোকদের দ্বারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। গ্রামের জনসাধারণ সরকারি নীতি সরকারি কর্মচারীদের প্রতি খুব একটা আস্থাবান নয় বলে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে সরকারি লোক ভেবে সাক্ষাৎকার দিতে চায় না। এছাড়া আয়কর দিতে হবে এই ভয়ে কেউ প্রকৃত আয় প্রকাশ না করে কমিয়ে বলে। অনেকে তাদের সম্পর্কে সঠিক ধারণাও দিতে সক্ষম হয় না।

৮। **যাতায়াতের অসুবিধা :** বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের খুবই অসুবিধা বিশেষ করে বর্ষাকালে নৌকা ছাড়া যাতায়াত প্রায় অসম্ভব, ফলে উত্তরদাতাদের সাথে যোগাযোগ করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ে। তাই অনেক সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নিয়োগকৃত ব্যক্তি মাঠপর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ না করে নিজে নিজে প্রশ্নমালা বা সিডিউল পূরণ করে থাকে।

৯। **সাক্ষাৎকার গ্রহণে অসুবিধা :** উত্তরদাতার সাথে 'যোগাযোগ সম্ভব হলেও সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় অধিক লোকের জমায়েত সাক্ষাৎকার গ্রহণে অসুবিধার সৃষ্টি করে। এসব অবাঞ্ছিত লোক উত্তরদাতাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়া পর্দা প্রথার কারণে পুরুষ অনুসন্ধানকারীর পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষাৎকার নেয়া সম্ভব হয় না। অনেক পরিবার আছে যেখানে মহিলা অনুসন্ধানকারীকেও সাক্ষাৎকার গ্রহণে অনুমতি দেয়া হয় না।

১০। **উত্তরদাতার সচেতনতার অভাব :** প্রশ্নপত্রের দ্বারা তথ্যসংগ্রহের বেলায় ডাকযোগে প্রশ্নমালা প্রেরণ করা হলে অধিকাংশ উত্তরদাতাই প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরত পাঠান না। ব্যক্তির মাধ্যমে প্রশ্নমালা পাঠালেও কোনো সময় নিয়োগকৃত

ব্যক্তি প্রশ্নমালা ফেরত আনতে গিয়ে দেখেন যে উত্তরদাতা প্রশ্নমালা হারিয়ে ফেলেছেন। এ ছাড়াও সচেতনার অভাবে ভুলতথ্য পরিবশেন করেন অথবা মনে যা আসে লিখে দেন।

১১। ভাববিনিময় বা যোগাযোগে বাধা : গ্রামের অধিকাংশ জনসাধারণ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত, ফলে শিক্ষিত অনুসন্ধানকারীর পক্ষে ভাষাগত কারণে ভাববিনিময়ে বাধার সৃষ্টি হয়, ফলে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। আঞ্চলিক ভাষায় অনেক শব্দ আছে যার অর্থ অনুসন্ধানকারীর পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভব হয় না, আবার অনুসন্ধানকারীর ব্যবহৃত অনেক শব্দ গ্রামবাসীদের হয়তো অজানা থাকে। এতে যোগাযোগ ব্যাহত হয়।

১২। অর্থ সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ : যারা গবেষণার জন্য অর্থ প্রদান করে থাকেন অধিকাংশ গবেষককে ঐ কর্তৃপক্ষের মর্জিমাফিক গবেষণা চালাতে হয়। এসব প্রতিষ্ঠান গবেষণার ফলাফলে তাদের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটাতে চান, ফলে গবেষণার ফল পরিবর্তনেও অনেক সময় গবেষকের উপর চাপ প্রয়োগ করে থাকেন। এতে গবেষক পক্ষপাতদুষ্ট ফলাফল প্রকাশে বাধ্য হন।

১৩। বহিঃস্থ অনুদান ও সাহায্য : অনেক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যারা বহিঃস্থ বা বিদেশি কোনো সংস্থার কাছ থেকে অনুদান বা সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রাম চালিয়ে থাকেন। এসব কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে গবেষক বা মূল্যায়নকারীর উপর চাপ প্রয়োগ করে অগ্রগতি দেখানো হয়। অগ্রগতি হোক বা না হোক এই অগ্রগতি দেখাতেই হয় কারণ, সাহায্যকারী সংস্থাকে খুশি করতে না পারলে ভবিষ্যতে অনুদান বা সাহায্য পাওয়া যাবে না। ফলে গবেষণার দ্বারা আসল চিত্রটি কখনই ফুটে উঠে না।

১৪। রক্ষণশীল মনোভাব : রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা, রক্ষণশীল মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি দাম্পত্য ও যৌনজীবন সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই, এসব ক্ষেত্রে তথ্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উদ্ধৃতির ব্যবহার

USE OF QUOTATIONS

ভূমিকা

থিসিসে সব সময়ই কোনো না কোনো উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে হয়। কোনো তথ্য পরিবেশন বা কোনো স্বীকৃত বিশেষজ্ঞের কথা ব্যবহার করে কোনো বিষয়বস্তুর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন অথবা একই বিষয়ে যারা একই রকম অথবা ভিন্নমত পোষণ করেন তাদের চিন্তাধারা উপস্থাপন করে কোনো আলোচনার ব্যাখ্যা দানের জন্য উদ্ধৃতি দেয়া হয়।

গবেষণার কাজে নোট নেয়ার সময় গবেষক কোনো না কোনো বই বা গবেষণা থেকে হুবহু কপি করে থাকেন। গবেষক গবেষণার এই কাজটি এই উদ্দেশ্যে করেন যে, উদ্ধৃতিগুলি পরবর্তীতে তার গবেষণা রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করবেন। প্রথম নোট নেয়ার সময় গবেষক প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃতি গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরির সময় এসব উদ্ধৃতি থেকে বিচার বিবেচনা করে খুব সংযতভাবে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি ব্যবহার করা উচিত। খুব বেশি উদ্ধৃতি দেয়াও ঠিক নয়। কারণ, বেশি উদ্ধৃতি দুর্বল যুক্তির সামিল বলে বিবেচিত হয়। যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ধৃতি নির্বাচন করা হয় তা হলো, উদ্ধৃতিটি প্রাসঙ্গিক কিনা? উদ্ধৃতির দৈর্ঘ্য উদ্ধৃতি নির্বাচনের বেলায় বিবেচনা করতে হবে। খুব বেশি দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যুক্তিসংগত নয়। এতে পাঠক খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন। উদ্ধৃতি ব্যবহারের কিছু নিয়মকানুন রয়েছে।

কখন উদ্ধৃতি দিতে হবে

When to Quote

উদ্ধৃতি কখন ব্যবহার করা হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গবেষণার সমস্যা ও গবেষকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। তবুও এ বিষয়ে কিছু নির্দেশাবলি অনুসরণ করা যেতে পারে। যা একজন গবেষককে তার সিদ্ধান্তে পৌছতে সাহায্য করবে। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সরাসরি উক্তি ব্যবহার করা যায়।

(১) কোনো গ্রন্থকারের মূল বক্তব্য যদি সংক্ষেপে সুস্পষ্ট ও সন্দেহনাশকভাবে বলা থাকে এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে এর কোনো উন্নতি সম্ভব নয় শুধু তখনই প্রত্যক্ষ বা সরাসরি উদ্ধৃতি ব্যবহার করা উচিত। এসকল ক্ষেত্রে গবেষণা প্রবন্ধ বা থিসিসকে আরও জোরালো বা উন্নত করতে উদ্ধৃতি সাহায্য করে।

(২) যখন কোনো বড় বা প্রধান যুক্তিকে দলিল হিসাবে ব্যবহার করতে হয় এবং পাদটীকার ব্যবহার যথেষ্ট হয় না তখন প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে হবে।

(৩) যখন কেউ অন্য লেখকের লেখার উপর মন্তব্য করতে চান অথবা ঐ লেখকের যুক্তি খণ্ডন করতে চান অথবা ঐ লেখকের ভাবধারা বিশ্লেষণ করতে চান।

(৪) যখন কোনো বক্তব্যকে শব্দান্তরে বা পরিবর্তিতরূপে প্রকাশ করলে ভুল ব্যাখ্যার অথবা ভুল বুঝবার সম্ভাবনা থাকে তখন প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা উচিত। যথা–কোন আইনের কথা উদ্ধৃত করার সময়, পার্লামেন্টের বিতর্ক উদ্ধৃত করার সময় বা সরকারের কোনো প্রকাশনা উদ্ধৃত করার সময় লেখক প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি দিতে পারেন।

(৫) কোন গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্য যেকোনো সূত্র উদ্ধৃত করার সময় প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ব্যবহার করা উচিত।

(৬) অপ্রকাশিত বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না। তবে থিসিসটি যদি প্রকাশিতব্য হয় তাহলে স্বত্বাধিকারের প্রশ্ন থাকে, তখন প্রথম প্রকাশক ও লেখকের অনুমতির প্রয়োজন হয়।

কি কি উদ্ধৃত করা যায়

What to Quote

উদ্ধৃতি কখন দিতে হবে সে ব্যাপারে বেশ কিছুটা নমনীয়তা থাকলেও কি করে করা হবে তার জন্যও বেশ কঠোর নীতিমালা মেনে চলতে হয়।

(১) কোন গ্রন্থকারের হুবহু (exact) বক্তব্য এবং অফিস সংক্রান্ত প্রকাশনার কোনো অংশ হুবহু ব্যবহার করলে অবশ্যই উদ্ধৃতি আকারে তা লিখতে হবে। হুবহু বা যথাযথ বলতে বোঝায় মূল পুস্তকে ব্যবহৃত একই অক্ষর, একই বানান, একই যতিচিহ্ন ও একই বড় হাতের অক্ষর (ইংরেজির বেলায়) এবং একই স্টাইল ব্যবহার করা। খুব যত্ন সহকারে এই উদ্ধৃতি লিখতে হবে যাতে একই রকম হয়। এর জন্য সম্পূর্ণ নির্ভুলতা প্রয়োজন।

(২) উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যবহৃত কাল যদি উদ্ধৃতির সূচনার সাথে না মিলে অথবা অনির্ধারিত সর্বনাম থাকে তখন উদ্ধৃতির মধ্যে-প্রক্ষেপ (interpolation)

ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এইসব প্রক্ষেপ অবশ্য বর্গাকার বন্ধনীর [square braket] মধ্যে থাকতে হবে। সাধারণ বা প্রথম বন্ধনী দিয়ে এগুলো ব্যবহার করা যাবে না। যাতে বোঝা যায় মূল কথাগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে বা নতুন কোনো কথা যোগ করা হয়েছে।

(৩) যখন কোনো উদ্ধৃতি দীর্ঘ হয় অথবা যখন কোনো শিক্ষার্থী কোনো অনুচ্ছেদের অংশবিশেষ কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করতে চান তখন মূল অনুচ্ছেদের কিছু অংশ বাদ দেয়া যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে সাধারণত শব্দলোপ বলা হয়। তবে খুবই সতর্কতার সাথে এই কাজটি করতে হবে যাতে মূল বিষয়বস্তুর অর্থ ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত না হয়। তিনটি ফুল স্টপ বা বিন্দু (...) চিহ্ন পর পর সন্নিবেশিত করে শব্দ লোপ করা হয়।

কিভাবে উদ্ধৃতি দিতে হবে

How to Quote

এই ব্যাপারে বিভিন্ন বিভাগ বা অনুষদের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকলেও উদ্ধৃতি ব্যবহারের বেলায় নিচের সাধারণ পদ্ধতিগুলো মেনে চলা যেতে পারে :

(১) সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি বনাম দীর্ঘ উদ্ধৃতি

উদ্ধৃতির দৈর্ঘ্য দ্বারা এর মূল রূপটি নির্ণীত হয়।

(ক) সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি (চার লাইন পর্যন্ত)

(১) লেখার প্রবাহ ব্যাহত না করে কোনো বাক্য ও অনুচ্ছেদের মধ্যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) উদ্ধৃতির প্রথমে এবং পরে দ্বি-উদ্ধৃতি চিহ্ন (double quotation) (“ ”) ব্যবহার করতে হবে।

(৩) মূল বইতে যে পরিমাণ জায়গা রেখে লেখা আছে সেই রকম ভাবেই উদ্ধৃতি লিখতে হবে (দুই বা দেড় লাইন পরিমাণ জায়গা বাদ দিয়ে)।

উদাহরণ :

> মনোভাব বিকাশের গুরুত্ব বিচার করে শরীফা খাতুন বলেছেন, “জ্ঞান আহরণে নৈপুণ্য ও দক্ষতা বিকাশে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করা ছাড়াও তাদের মূল্যবোধ, মনোভাব ও অনুভূতির উন্নয়ন সাধন করে ব্যক্তিত্ব বিকাশ করা সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব।”

এই উদ্ধৃতির স্বীকৃতি দু'ভাগে দেয়া যেতে পারে। উদ্ধৃতির শেষ শব্দটিতে একটি শিরসংখ্যা দিয়ে।

যেমন,

..........ব্যক্তিত্ব বিকাশ করা সামাজিক বিজ্ঞানে শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব। প্রথমত,

এই উৎসটা পাদটীকায় দেওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, সংক্ষেপে আরও প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে উদ্ধৃতির স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে।

যেমন,

"...ব্যক্তিত্ব বিকাশ করা সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্ব"।[১]

(খাতুন, ১৯৭৪, পৃ ২৯৮)

এই উদাহরণ পাদটীকায় ব্যবহার না করে প্রথমে গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশনার তারিখ এবং পাতার নম্বর উদ্ধৃতির শেষে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে লিখতে হবে।

(খ) দীর্ঘ উদ্ধৃতি (পাঁচ অথবা বেশি লাইনবিশিষ্ট উদ্ধৃতি)

(১) উদ্ধৃতির প্রথমে এবং শেষে কোটেশন বা উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় না।

(২) প্রতিটি লাইনের মাঝে এক লাইন পরিমাণ জায়গা (single space) ফাঁক রাখতে হয়।

(৩) যথোপযুক্তভাবে উদ্ধৃতিটি লিখতে হবে।

(৪) মার্জিন থেকে অন্যান্য লাইন অপেক্ষা কিছুটা ভিতরে সরিয়ে উদ্ধৃতি আরম্ভ করতে হবে।

খাতুন (১৯৭৪) সমাজ পাঠ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও মনোভাব বিষয়ক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন–

> সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বিষয় সংশ্লিষ্ট কতকগুলো মূল্যবোধ ও মনোভাবের সহিত পরিচয় করানো অপরিহার্য। এই জাতীয় উদ্দেশ্যগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। আচরণ বিষয়ক. কার্যপ্রণালি বিষয়ক ও বিষয়বস্তু বিষয়ক মূল্যবোধ। সামাজিক বিজ্ঞানের সকল প্রকারের উদ্দেশ্যের মধ্যে মূল্যবোধ ও মনোভাববিষয়ক উদ্দেশ্যগুলো মূল্যায়ন সর্বাপেক্ষা দুরূহ। সাধারণত শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে আলোচনার সময় এবং সমস্যা সমাধানমূলক পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ ও মনোভাবের ব্যবহারিক প্রকাশ দেখা যায়।

(খাতুন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা, ১৯৭৪, পৃ ৪৫)।

শব্দলোপ

Ellipses

খুব দীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার না করে তার প্রয়োজনীয় অংশ ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু জায়গা বাদ রেখে তিনটি ফুলস্টপ বা বিন্দু দিয়ে আগে ও পরে শব্দলোপ নির্দেশ করা হয়। প্রত্যেক বিন্দু বা ফুলস্টপের আগে ও পরে জায়গা থাকবে। শব্দলোপ উদ্ধৃতির প্রথমে হতে পারে আবার শেষেও হতে পারে।

উদাহরণ–

মাটি, পানি ও বায়ুর উপর আমরা বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল, তাই পরিবেশকে জানা ও সুন্দর রাখা সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত জিনিস বিদূষিত বা কলুষিত হচ্ছে।... প্রাকৃতিক উপায়ে এই বিদূষণের উপর মানুষের হাত নেই কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে যে বিদূষণ হচ্ছে তার জন্য মানুষ দায়ী। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে গাছপালা কেটে পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলছে। (সম্পাদকীয়, সংবাদ, জুলাই ১৪, ঢাকা ১৯৮১)।

প্রক্ষেপ

Projection

যখন গবেষক কোনো উদ্ধৃতি সংশোধন করতে চান বা ব্যাখ্যা দিতে চান তখন তাকে চারকোনা বর্গাকার ব্রাকেটের মধ্যে দিতে হবে।

(ক) Sic : যদি উদ্ধৃতির মধ্যে ভুল থাকে তাহলে প্রক্ষেপের মাধ্যমে Sic দ্বারা দেখাতে হবে। গবেষক বুঝতে পারেন যে তার আসল উদ্ধৃতির কোথাও ভুল আছে।

উদাহরণ:·

১৯৭১ সালের তদানিন্তন (Sic) পাকিস্তানে উন্নতমানের কারিগর তৈরির চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানমনস্কতা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারটি ছিল অবহেলিত।"

এখানে গবেষক Sic দ্বারা বুঝাতে চান যে "তদানিন্তন" শব্দটির বানান ভুল এবং একটি "তদানীন্তন" হবে।

(খ) ব্যাখ্যা বা মন্তব্য : উদ্ধৃতির কোনো শব্দ বা কোনো অংশ সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য উদ্ধৃতিতে প্রক্ষেপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

উদাহরণ:

"গরম পানিতে শোধনের জন্য প্রথমে গম বীজকে সাধারণ ঠাণ্ডা পানিতে প্রায় চারঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা হয়। এরপর বীজগুলোকে তুলে অল্প গরম পানিতে (৫৫ সে.) দশ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। পরে সেখান থেকে নিয়ে বীজগুলিকে শুকানো হয়।"

এই উদাহরণটিতে প্রক্ষেপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(গ) পূর্ববর্তী ঘটনার উল্লেখ (Supplying an antecedent)

যখন উদ্ধৃতিতে অস্পষ্ট সর্বনাম থাকে তখন এতে উপযুক্ত শব্দ সন্নিবেশিত করে সুস্পষ্ট করা যায়।

উদাহরণ :

"তিনি {রবীন্দ্রনাথ} শুধু শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন না, শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকও ছিলেন। তাঁর ছোট গল্পের তুলনা হয় না।"

বিশেষ উদ্ধৃতি

Special Quotation

কোন কোনো বিষয়ের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয়। নিচে এমন কিছু উদাহরণ দেয়া হলো যাতে এসব ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি প্রদানের সময় একটা সংগতিপূর্ণ প্যাটার্ন গড়ে উঠতে পারে।

(ক) উদ্ধৃতির ভিতরে উদ্ধৃতি : কোনো ছোট উদ্ধৃতির ভিতরে যদি কোনো উদ্ধৃতাংশ উদ্ধৃত করা হয় তাহলে সাধারণত সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি দ্বি-উদ্ধৃতি চিহ্ন দ্বারা আবদ্ধ করা হয় এবং ভিতরের উদ্ধৃতাংশ একটিমাত্র (Single) উদ্ধৃতি চিহ্ন দ্বারা আবদ্ধ করা হয়। আমরা জানি উদ্ধৃতি বড় হলে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার না করে সাধারণত মার্জিন থেকে অন্যান্য লাইন অপেক্ষা কিছুটা ভিতরে সরিয়ে উদ্ধৃতি লিখতে হয়। এক্ষেত্রে ভিতরের উদ্ধৃতির জন্য দ্বি-উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। কোনো উদ্ধৃতির ভিতরে উদ্ধৃতি দানের জন্য একটিমাত্র উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে।

উদাহরণ : (উদ্ধৃতি ছোট হলে)

বাংলাদশের বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে শাহজাহান তপন বলেন,

> "বাংলাদেশের দুঃখ দুর্দশা জর্জরিত দশ কোটি মানুষের দারিদ্র্য মোচন করে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমে এক নতুন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এদেশেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটাতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার মাধ্যমে 'যুথবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক সমাজ চেতনায়' বিপ্লব আনতে হবে।"

(শাহাজাহান তপন, ১৯৮৫, পৃ ৯৪)

উদাহরণ : (উদ্ধৃতি বড় হলে)

নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষা কমিশন বলেন যে,

> প্রাথমিক স্তরে "পরিবেশের পরিচিতি" বিষয় পাঠের মাধ্যমে শিশুর অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ রেখে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে "সাধারণ বিজ্ঞান"-এর সমন্বিত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য প্রভৃতি গ্রুপ বাতিল করে সকল

> শিক্ষার্থীর জন্য সাধারণ শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করা হচ্ছে। নিম্ন মাধ্যামিক স্তর ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য বর্তমান। তাহলো নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের সমন্বিত পাঠ্যসূচিভিত্তিক "সাধারণ বিজ্ঞান" পড়ানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে "বিজ্ঞান" সমন্বিত বিজ্ঞান না হয়ে পরস্পর সম্পৃক্ত হবে। (শাহজাহান তপন, ১৯৮৫, পৃ ৩৭-৩৮)।

(খ) কবিতায় উদ্ধৃতি : উদ্ধৃতির দৈর্ঘ্যের উপর কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহার করার পদ্ধতি নির্ভর করে। ছোট উদ্ধৃতি (একটি লাইন অথবা একটি লাইনের অংশ) লেখার মধ্যেই দ্বি-উদ্ধৃতি চিহ্ন দ্বারা আবদ্ধ করতে হবে।

উদাহরণ : বাংলা আমাদের প্রিয় ভাষা; আমাদের মাতৃভাষা। তাই অতি আবেগে কবি গেয়েছেন-"মোদের গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা"।

দুটি লাইন উদ্ধৃত করার বেলায় দুটো লাইনের মধ্যে একটি আড়াআড়ি চিহ্ন (/) ব্যবহার করতে হবে, যাতে দুটি লাইনের বিভক্তি বোঝা যায়।

উদাহরণ : রবীন্দ্রনাথের স্নিগ্ধ ললিত মধুর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহজ কাব্য যে নব জাগরণকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে নাই, নজরুল কাব্যে সেই জাগরণ ভাষা পেয়েছে, "বল বীর, চির উন্নত মম শির/শির নেহারি আমারি, নত শির ঐ শিখর হিমাদ্রীর"।

পদ্যের উদ্ধৃতি যখন বড় হবে তখন উদ্ধৃতির চিহ্নের কোনো প্রয়োজন নেই, এক লাইন পরিমাণ জায়গা (Sinlge space) ফাঁকা রেখে লিখতে হবে এবং মার্জিন থেকে অন্যান্য লাইন অপেক্ষা কিছুটা ভিতরে সরিয়ে উদ্ধৃতিটি লিখতে হবে। উদ্ধৃতিগুলো একটি কোলন (ঃ) চিহ্ন দ্বারা আরম্ভ করতে হবে।

উদাহরণ : খেলাফত যুগের বিশিষ্ট আবহাওয়ায় নজরুলের আবির্ভাব হলেও খেলাফতের পরবর্তী যুগের চিন্তা সম্পদই তাঁর রচিত কাব্য ও সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। তুর্কি বীর মোস্তফা কামাল পাশার উদ্ধারের সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে তিনি লিখেছেন :

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,

অসূরপুরে সোর উঠেছে জোরসে কামাল ভাই, কামাল ভাই।

কামাল, তুনে কামাল কিয়া ভাই।

হো হো! কামাল, তুনে কামাল কিয়া ভাই।

(গ) বক্তৃতার উদ্ধৃতি : কোনো বক্তৃতা থেকে অথবা কোনো ব্যক্তিগত কথোপকথন থেকে কোনো বক্তব্য থিসিসে ব্যবহার করা হলে কোনো ভুল বা ভুল উপস্থাপন বা ভুল ব্যাখ্যা যাতে না উপস্থাপন করা হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। প্রয়োজনে যে ব্যক্তির বক্তৃতা থেকে এটি গ্রহণ করা হয়েছে তার কাছে এটি দাখিল করতে হবে। এই ব্যবস্থা উদ্ধৃতিতে ভুলের মাত্রা কমিয়ে দেয়, সঠিক উদ্ধৃতির নিশ্চয়তা

প্রদান করে এবং যার উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে তার বিশ্বাস ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না। এই রকম উদ্ধৃতির স্বীকৃতি থিসিসের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে দেয়া যেতে পারে।

উদাহরণ :

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর শামসুল হক বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র ও শিক্ষকদের এক যৌথ সভায় বলেছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় গুণ্ডাদের আস্তানা হতে পারে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গুণ্ডা থাকবে, না হয় আমি থাকব।"

(ঘ) পাদটীকায় উদ্ধৃতি : যখন পাদটীকার কোনো উদ্ধৃতি দেয়া হয় তখন দ্বি-উদ্ধৃতি চিহ্নের মাধ্যমে তা করা হয় এবং মূল গ্রন্থে যে যতিচিহ্ন দেয়া থাকে ঠিক সেরকম ভাবেই তা দেয়া হয়।

উদাহরণ :

> ওয়াকারের মতে, "রাসায়নিক, ভৌতিক ও জৈবিক কারণে পরিবেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের যেকোনো পরিবর্তন হলো দূষণ।"

(ঙ) পরোক্ষ উদ্ধৃতি : যখন কোনো ব্যক্তির হুবহু বক্তব্য ব্যবহার না করে তার বক্তব্যের ভাবধারা ব্যবহার করা হয় তখন প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতির ন্যায় তাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে হয়। পরোক্ষ উদ্ধৃতি চিহ্ন দ্বারা আবদ্ধ করতে হয় না। মূল থিসিসে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ থাক বা না থাক পাদটীকায় তার স্বীকৃতি দিতে হবে। উদ্ধৃতির নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের জন্যও এর প্রয়োজন।

উদাহরণ–

> বর্তমানে পরিবেশ নিয়ে যত লোক চিন্তা-ভাবনা করেছেন অতীতে এ নিয়ে এত কেউ মাথা ঘামায়নি। বর্তমানের মতো অতীতে পরিবেশ এত কলুষিত ছিল না। বর্তমানের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো চিন্তিত। পরিবেশের এসব উপাদানের প্রতি জরুরি ভিত্তিক নজর দেয়া উচিত। বাংলাদেশের শিক্ষা পরিবেশ বিদূষণ নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য (আলম, ১৯৭৯, পৃ ৫)।

সর্বশেষে এই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, অন্য লেখকের উদ্ধৃতি ব্যবহার করলে তাঁর পূর্ণ স্বীকৃতি না দিলে কোনো থিসিসকে সম্পূর্ণ বলা যায় না।

সপ্তম অধ্যায়
সামাজিক গবেষণা
SOCIAL RESEARCH

কৌতূহল মানব মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এটি মানুষকে তাহার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে বাধ্য করে। পারিপার্শ্বিক জগতের বিভিন্ন বিষয়, ঘটনা ও তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে মানুষ চিরদিনই আগ্রহী। এই অনুসন্ধানে মানুষ তাহার উদ্যম, শক্তি ও সময় ব্যয় করিয়াছে। ফলে সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে বহু গবেষণা কার্য পরিচালিত হইয়াছে। সমাজ-বিজ্ঞানীরা সামাজিক আচার-আচরণ ও ঘটনাবলির কার্য-কারণ অনুসন্ধানের প্রতি গুরুত্বারোপ করিয়াছেন। তাহারা শুধুমাত্র কোনো স্থানের একটি বিশেষ ঘটনার নির্দিষ্ট বা যথাযথ বিবরণই চান না–বরঞ্চ সেই ঘটনা বিশেষ কি কারণে সংঘটিত হইতেছে তা জানতে আগ্রহী। অধিকন্তু যে পরিবেশে ঘটনা সংঘটিত হয় উহার সহিত ঘটনার কি সম্পর্ক তাহাও জানিতে প্রয়াসী।

মানুষ সর্বদাই জটিল সমস্যায় জর্জরিত সমাজে বাস করে। এই সমস্ত সমস্যা অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানকল্পে সমাজবিজ্ঞানীরা সমস্যার উপরে বস্তুনিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। তাহারা সামাজিক সমস্যাকে ভাল বা মন্দ হিসাবে জানিতে চান না–বরং ব্যাপকভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে উহার প্রকৃতি, প্রভাব, কারণ ও সমাধান অনুসন্ধান করিতে চান। সামাজিক সমস্যাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে অনুসন্ধান করিবার জন্য গবেষকগণ মানসম্মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার করেন। তাই গবেষণা সম্পর্কে আলোচনার প্রথমেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি এবং উহার বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। কারণ এই পদ্ধতির প্রয়োগই সামাজিক তথ্যানুসন্ধানকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Scientific method)

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হইতেছে বিজ্ঞানের ভিত্তি। প্রকৃতি বা সমাজ সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ, সঠিক ও সুসংবদ্ধ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলে। প্রকৃতি বা সমাজ সম্পর্কে সঠিক, নিরপেক্ষ ও সুসংবদ্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্য আবশ্যক মানসম্মত পদ্ধতির। এই পদ্ধতিই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত। এই পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞানী যেকোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা গবেষণার কাজ পরিচালিত করেন, তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে সুষ্ঠু

ধারণা ব্যতীত গবেষণার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য। কারণ গবেষণা হইল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে কোনো গবেষণা সমস্যার বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তবসম্মত সমাধানের লক্ষ্যে পরিচালিত অনুসন্ধান। তাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই কোনো গবেষণার ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে নূতন নূতন নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রমাণ করিয়াছে, বর্তমানের পর্যবেক্ষণকৃত ঘটনাবলির উপর ভিত্তি করিয়া নিশ্চিতরূপে সর্বদা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। তথাপি এ-যাবৎ সত্য ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য যত পদ্ধতি মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে তাহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই সবচাইতে নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। Pearson (১৯১১) 'Grammer of Science' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, সত্যানুসন্ধানের কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নাই এবং বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভিন্ন কোনো পথ নাই। বিজ্ঞানের সব শাখাতেই এই পদ্ধতির প্রকৃতি একই এবং ইহা সমস্ত যুক্তিসম্মত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনের নিকট স্বীকৃত পদ্ধতি। এই প্রসঙ্গে Thoules (১৯৪৬) বলিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হইল কতগুলি কলা-কৌশলের সমষ্টি, বিভিন্ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন ভাবে পার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও, সাধারণ তত্ত্ব আবিষ্কারের লক্ষ্যে যাহার একই সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে (Scientific method is a system of techniques, differing in many respects in different sciences, although retaining the same general character for attaining the end of discovering general laws)। বিজ্ঞানের মধ্যে যে একতা (unity) রহিয়াছে তাহা এই পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত, বিজ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে নয়। যে ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করিয়া যেকোনো প্রকারের ঘটনাবলির পর্যবেক্ষণ করেন, তাহা শ্রেণিবদ্ধ করেন, এই সমস্ত ঘটনাবলির অন্তর্গত সম্পর্ক নিরূপণ করেন এবং তাহাদের পারম্পর্য ব্যাখ্যা করেন, তাহাদেরকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগকারী বা বিজ্ঞানী বলা হয়। এই ঘটনাবলি প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নানা প্রকারের হইতে পারে। ঘটনা বা বিষয় বিজ্ঞান নয় ; বরং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে ঘটনা বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তাহাকেই বিজ্ঞান বলে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিতে অনুসন্ধানের সেই সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকে বুঝায় যাহার দ্বারা ধারাবাহিক, বস্তুনিষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়।

George Lundberg বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা এমন একটি পদ্ধতি–সুশৃঙ্খল পর্যবেক্ষণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ ও তথ্যের বিশ্লেষণ যাহার অন্তর্ভুক্ত। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করি এবং তাহা হইতে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই, সেই ফলাফল হইতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আহরিত ফলাফলের পার্থক্য হইল যে, ইহা অধিকতর সচেতন, সুশৃঙ্খল, কষ্টসাপেক্ষ, যাচাইকৃত, নিরপেক্ষ, সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ইহা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য স্বীকৃত পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হইয়াছে।

Aristotle এই পদ্ধতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইহা তখনই শুরু হয় যখন অনেকগুলি অভিজ্ঞতা হইতে একটি সাধারণ অভিজ্ঞতায় উপনীত হওয়া যায় এবং সেই ধারণা একই প্রকারের অন্যান্য বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

Cohen and Nager-এর মতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা কোনো কিছু চাপাইয়া দেয় না। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থা যেমন আছে তাহাকে তেমনিভাবেই অনুসন্ধান করে। সত্য উদ্‌ঘাটনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলাফল গবেষকের মতামতের বা অনুমানের পক্ষে বা বিপক্ষে, পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় যাহাই হউক না কেন, বাস্তব অবস্থা যাহা এই পদ্ধতির সাহায্যে তাহা আবিষ্কার করাই উদ্দেশ্য।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ইহার নিয়মতান্ত্রিকতা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের সমস্ত কিছু নিয়ম-নীতি মানিয়া চলে এবং ঘটনাপ্রবাহও একটি সুনির্দিষ্ট ছাঁচ বা নিয়ম মানিয়া চলে। মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ব্যবহারের মধ্যেও সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। এই সমস্ত ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় এবং উক্ত পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। বিজ্ঞানের কাজ হইল এই নিয়ম বা ছাঁচগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা। এই অনুসন্ধান তখনই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হইবে যখন তাহা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।

অনুসন্ধানের ফলাফল সঠিক হওয়ার তাগিদে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অপর বৈশিষ্ট্য হইল তাহা যাচাই সাপেক্ষ হওয়া। অর্থাৎ একই পদ্ধতি বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা একই ধরনের গবেষণায় পুনঃপুন ব্যবহৃত হইয়া যদি একই ধরনের ফলাফল দেয়, তখন সেই পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মর্যাদা দেওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসন্ধানের বিভিন্ন পর্যায়ে উপযুক্ত ও মানসম্মত পদ্ধতির ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। গবেষণার বিষয় নির্বাচন, অনুমান (Hypothesis) গঠন, গবেষণার পদ্ধতি নির্ধারণ, নমুনায়নের নক্সা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নিরূপণ, তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত হাতিয়ার (সামাজিক গবেষণায় প্রশ্ন-পত্র, অনুসচি ইত্যাদি) প্রস্তুতকরণ, তথ্য বিশ্লেষণের জন্য সংখ্যাতাত্ত্বিক বা গুণাত্মক পদ্ধতির যুক্তিযুক্ত নির্বাচন, ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত গবেষক প্রতি পর্যায়ে কতগুলি সুনির্দিষ্ট ও মানসম্মত পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। এই সমস্ত পদ্ধতির ব্যবহারই গবেষণাকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দেয়।

এই পদ্ধতির অপর বৈশিষ্ট্য হইল ইহা মূল্যবোধের উর্ধ্বে। মূল্যবোধ ও বাস্তব ঘটনা দুইটি পৃথক ব্যাপার। মূল্যবোধ বলিতে ভালোমন্দ, গ্রহণযোগ্য–অগ্রহণযোগ্য, ঠিক-ভুল ইত্যাদি বুঝায়। বিজ্ঞান কোনো বিষয় বা ঘটনাকে ভালো-মন্দ, গ্রহণীয়-অগ্রহণীয় ইত্যাদি ভাবে অনুসন্ধান করে না। গবেষণার বিষয় বা সমস্যাকে সমাজ ভালো বা মন্দ যাহাই মনে করুক, বৈজ্ঞানিক নির্দিষ্ট পদ্ধতির ব্যবহার করিয়া উহাকে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান

করেন। এই পদ্ধতির গবেষককে নিজ মূল্যবোধের উর্ধ্বে থাকিয়া অনুসন্ধান করিতে সাহায্য করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বড় গুণই হইল যে, যদি ইহার দাবি সঠিকভাবে পূরণ করা হয়, তবে গবেষণা নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন হইতে বাধ্য।

এই পদ্ধতির অপর বৈশিষ্ট্য হইল ইহা তত্ত্বের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইতে হইবে। গবেষণার মাধ্যমেই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, যাচাই হয় ও পরিবর্তিত হয়। গবেষণার ফলাফল তত্ত্ব গঠনে সাহায্য করে, অপরদিকে তত্ত্বের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করা ও উহার প্রয়োগযোগ্যতা ইত্যাদি যাচাইয়ের জন্য গবেষণা পরিচালিত হয়। তত্ত্ব ও গবেষণা একে অপরের পরিপূরক হিসাবে জ্ঞানের বিকাশ সাধন করে। তাই গবেষণার সহিত তত্ত্বের গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে। বলা হয় যে, তত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট ও নির্দেশিত নয় যে-গবেষণা তাহা মূল্যহীন এবং তত্ত্ব যদি গবেষণার তথ্যভিত্তিক না হয় তবে তাহাও নির্ভরযোগ্য নয়।

এই পদ্ধতির অপর বৈশিষ্ট্য হইল, সাধারণীকরণের যোগ্যতা। বিজ্ঞান একটি বিশেষ ব্যক্তি, ঘটনা বা বিষয় লইয়া ব্যাপৃত নহে বরং ঘটনার ধারা প্রকৃতি, শ্রেণি, কার্য-করণ সম্পর্ক ইত্যাদি লইয়া ব্যাপৃত থাকে, যাহাতে একই প্রকারের ঘটনা ও সমস্যা সম্পর্কে সাধারণীকরণ করা যায়। সাধারণীকরণ বলিতে নমুনার কয়েকটি ঘটনাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত ফলাফল গবেষণার সমগ্রকের উপর প্রযোজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে বুঝায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কড়াকড়ি প্রয়োগই এই সাধারণীকরণের সঠিকতা নিরূপণ করে। সামাজিক বিজ্ঞানে সামাজিক বিষয়াবলির বিভিন্নতার কারণে এই সাধারণীকরণ সুনির্দিষ্ট বা সম্পূর্ণভাবে করা সম্ভব হয় না যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়। তথাপি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া সামাজিক বিজ্ঞানেও যতদূর সম্ভব সাধারণীকরণ করিবার চেষ্টা করা হয়।

ইহার অপর বৈশিষ্ট্য হইল যে, বর্তমান গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যদ্বাণীকরণ। কোনো বিষয়, ঘটনা ও তাহার কার্যকরণ সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের আলোকে এই পদ্ধতির সাহায্যে যথেষ্ট নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়।

গবেষণা (Research)

গবেষণা এক প্রকারের জ্ঞান অন্বেষণ যাহা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ নীতিমালার দ্বারা পরিচালিত। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগে প্রশ্নসমূহের উত্তর অনুসন্ধানই ইহার লক্ষ্য।

গ্রিনের মতে, "জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য মানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগকেই গবেষণা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।" (Research is definable as the use of standarize procedures in the search for knowledge-Green)।

মেরী. ই. ম্যাকডোনালের মতে, "গবেষণা এমন একটি সুবিন্যস্ত অনুসন্ধান যাহার উদ্দেশ্য বোধগম্য যাচাইসাপেক্ষ জ্ঞান দ্বারা প্রচলিত জ্ঞানের উন্নতি সাধন"। (Research may be defined as systematic investigation intended to add to available knowledge in a form that is communicable and verifiable-Marry E. Macdonal)।

সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান (Fesibility Study)

সামাজিক উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করিবার প্রথম পদক্ষেপ হইল ইহা জানা যে, উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা, যে এলাকার বা যে জনগোষ্ঠির জন্য কর্মসূচি প্রণীত হইয়াছে, তাহা উক্ত এলাকার চাহিদা অনুযায়ী কিনা এবং জনগণ ঐ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করিবে কি না। এই জন্য কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বে সম্ভাব্যতা অনুসন্ধানের মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করিতে হইবে। কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন সম্ভব কি না এবং সম্ভব না হইলে তাহা কি কারণে তাহা খুঁজিয়া বাহির করাই এ ধরনের গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া কোনো কর্মসূচি ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য। অপরদিকে এরূপ সম্ভাব্যতা যাচাই ব্যতীত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা নানা প্রকার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সাধারণত নমুনা জরিপের মাধ্যমেই সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান করা হয়। কারণ নমুনা জরিপের মাধ্যমেই স্বল্প সময়ে বিস্তীর্ণ এলাকা বা জনগোষ্ঠী হইতে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ইহা ছাড়া প্রয়োজনবোধে গবেষণার অন্যান্য পদ্ধতির প্রয়োগও এই ধরনের অনুসন্ধানের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

কর্মমুখী গবেষণা (Action research)

সামাজিক গবেষণায় কর্মমুখী গবেষণা (action research) একটি নতুন সংযোজন। কোনো সমস্যার কার্যকরী সমাধান লাভের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য হইল বঞ্চিত সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রাপ্ত অর্থ ও সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে উপযুক্ত উপায় আবিষ্কার করা। কোনো কর্মসূচি কিভাবে ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করা যায় বা কোনো সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় ইহাই কর্মমুখী গবেষণার লক্ষ্য। এখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার মুখ্য নয়, কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন, সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নই মুখ্য।

এ-গবেষণা কয়েকটি পর্যায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রথমত যে জনগোষ্ঠী বা এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে বা যে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে কর্মপন্থা গৃহীত হইবে তাহার উপর প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য (base-line survey) জরিপ কার্য পরিচালনা করিতে হয়। এই প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহ জরিপ গবেষককে গবেষণার বিষয়, এলাকা বা জনগোষ্ঠীর বর্তমান বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে। এই বাস্তব জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে কি প্রকারের কর্মপন্থা উপযুক্ত তাহা সুপারিশ ও পরিকল্পনা করা হয়: এবং

সে অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচি বাস্তবে প্রণয়নের পর মূল্যায়ন গবেষণার মাধ্যমে গৃহীত কর্মপন্থার উপযুক্ততা, কার্যকারিতা, সমস্যা, ইত্যাদি মূল্যায়ন করা হয়। কর্মমুখী গবেষণার মধ্যে তাই সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান, (fesibility study), প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ জরিপ (base-lirne survey), এবং মূল্যায়ন (evaluation study) গবেষণা অন্তর্ভুক্ত। মূল্যায়নের ভিত্তিতে গৃহীত কর্মসূচিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন সাধন করিয়া উহাকে অধিকতর কার্যোপযোগী করিয়া তোলা হয়।

অন্য কথায়, একটি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বা সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মপন্থা অবলম্বনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যে-সমস্ত জরিপ ও মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয় তাহাদের সমষ্টিই হইল কর্মমূখী গবেষণা। এই জন্য কর্মমুখী গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। এই গবেষণা সরাসরি কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। কর্মমুখী গবেষণা কোনো কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বে উক্ত বিষয়ে অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করিতে সাহায্য করে ও উপযুক্ত পদ্ধতি প্রক্রিয়া সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ধারণা দান করে।

মূল্যায়ন গবেষণা (Evaluation research)

কোনো কর্মসূচি বা কার্যক্রমের কার্যকারিতা, সার্থকতা বা প্রভাব মূল্যায়নের জন্য যে গবেষণা করা হয় তাহাকে মূল্যায়ন গবেষণা বলে। যে-কোনো কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের তিনটি পর্যায় থাকে : ১. পরিকল্পনা পর্যায়, ২. বাস্তবায়ন পর্যায় ও ৩. মূল্যায়ন পর্যায়। একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া কোনো কর্মসূচি পরিকল্পনা করা হয়। অতঃপর উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়িত কর্মসূচি কতখানি পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের সফল হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক। এই জন্য অবশ্যই উক্ত কর্মসূচি সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক, যে-তথ্যের ভিত্তিত কর্মসূচির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা করা হয় এবং যে-উদ্দেশ্যে ও যে-অর্থ ব্যয়ে উক্ত কর্মসূচি প্রণীত ও বাস্তবায়িত হইয়াছে উহা বিচার করা হয়। কোন্ কোন্ কারণে কর্মসূচিটির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয় নাই বা বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় নাই, তাহা খুঁজিয়া বাহির করাও এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত অসুবিধা চিহ্নিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ তাহা ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত অসুবিধা দূর করিয়া কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের পথ নির্দশ করে। এই মূল্যায়ন 'Feed-back mechanism' হিসাবে পরবর্তী পরিকল্পনা প্রণয়নে ও তাহার যথাযথ বাস্তবায়নে বা কর্মসূচির পরিবর্তনে সহায়তা করে। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো কর্মসূচির সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণে, উপযুক্ত ও যথাযথ কর্মপন্থা বা কৌশল অবলম্বনে সহায়তা করা মূল্যায়ন গবেষণার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

কৌশলগত গবেষণা (Engineering research)

আধুনিককালে বিজ্ঞানসম্মত নানা কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এই সমস্ত কৌশলের প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে

বা পরিস্থিতিতে উহাদের প্রয়োগ যোগ্যতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে সঠিক ও বাস্তবসম্মত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। গবেষণার মাধ্যমে এইরূপ নানা কৌশল বা পদ্ধতি যে-উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তাহার কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় ও ঐ তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ঐ সমস্ত কৌশল বা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা যাচাই করা হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা হয় বা নূতন পদ্ধতির সূত্রপাত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমাজ কর্মে বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তি, দল, জনগোষ্ঠি বা এলাকার সমস্যা সমাধান ও উন্নতির চেষ্টা করা হয়। পাশ্চাত্যে আবিষ্কৃত ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এই সব পদ্ধতিগুলি আমাদের দেশের ব্যক্তিগত, দল বা সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কতটুকু উপযোগী তাহা অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এই জন্য আবশ্যক এই সমস্ত বিদেশে উদ্ভাবিত পদ্ধতি ও কলা-কৌশলের এই দেশে প্রয়োগযোগ্যতা, প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা যাচাই করা। নতুবা এই সমস্ত পদ্ধতি বা কলাকৌশল অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। কৌশলগত গবেষণা উন্নয়নমূলক নানা পদ্ধতির কার্যকারিতা ও প্রয়োগযোগ্যতা লইয়া অনুসন্ধান করে এবং বাস্তব অবস্থার আলোকে উহাকে অধিকতর উপযুক্ত ও কার্যকরী করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করে। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে বিদেশে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির ব্যবহার অহরহ করা হইতেছে সেই ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত প্রযুক্তির কার্যকারিতা বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করা একান্ত অপরিহার্য। এই কারণে বাংলাদেশে কৌশলগত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

এই কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, উপরক্ত গবেষণাগুলি এক একটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির না-ও হইতে পারে বরং ইহাদের যে-কোনো এক প্রকারের গবেষণায় অন্য প্রকারের গবেষণার বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে। যেমন, কোনো কর্মমুখী গবেষণার প্রথম পর্যায় হইতে পারে সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান। তেমনি একটি মূল্যায়ন গবেষণা কর্মসূচির মূল্যায়নের সাথে সাথে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য পরিচালিত হইতে পারে। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এই সব গবেষণার প্রকৃতি নির্ধারণ হয়।

সামাজিক গবেষণা (Social Research)

বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সামাজিক গবেষণা নানাবিধ কারণে সম্পন্ন হয়। ইহার মধ্যে রহিয়াছে অজানার প্রতি কৌতূহল, সামাজিক সমস্যার কারণ ও ক্ষতিকর প্রভাব অনুসন্ধান, প্রয়োজনীয় ও মৌলিক জ্ঞান অর্জনের প্রবণতার মধ্যে নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার ও পুরাতন পদ্ধতি নিরীক্ষা করিবার প্রয়াস।

পলিন ভি. ইয়াং-এর মতে, সামাজিক গবেষণা বলিতে আমরা এমন একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে বুঝি যাহা দ্বারা যুক্তি ও প্রণালিবদ্ধ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে নূতন তথ্য আবিষ্কার ও পুরাতন তথ্যের সত্যতা যাচাই, তাহাদের পর্যাযক্রম, পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়, কারণ ব্যাখ্যা ও যে প্রাকৃতিক নিয়মে উহা পরিচালিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করা

প্রতিটি গবেষণাই সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে পরিচালিত। জ্ঞানের যে-ক্ষেত্রেই গবেষণা করা হউক না কেন, তাহার একটি প্রভাব সমাজের উপর থাকেই। সামাজিক জীবন জটিল বিধায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতো শতকরা একশত ভাগ সঠিকভাবে সামাজিক গবেষণার ফলাফলকে ঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তথাপি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সামাজিক গবেষণার এমন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া আবিষ্কার করা হইয়াছে, যাহাতে ইহার ফলাফল বহুলাংশে সঠিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

সমাজ, তাহার প্রকৃতি ও কার্যাবলি ইত্যাদিকে জানিবার অদম্য আগ্রহের ফলেই সামাজিক গবেষণার উৎপত্তি হইয়াছে। তাই সামাজিক বিষয়াবলি সামাজিক গবেষণার বিষয়বস্তু। সমাজজীবন জটিল। সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান, কার্যাবলি দেশ-কাল ভেদে বিভিন্ন। সমাজে সামাজিক সমস্যার শেষ নাই, এ সমস্ত সমস্যাও কোনো একটি কারণে নয়, বরং নানা কারণে সৃষ্টি হয়, ফলে সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে সমাজজীবনকে সুষ্ঠুভাবে জানা বা সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা যেমন আবশ্যক অন্যদিকে তেমনি সমাজজীবন, তার প্রকৃতি ও সমস্যা সম্পর্কেও বাস্তবসম্মত ও সুষ্ঠু ধারণা থাকা আবশ্যক। সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে, জটিল সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সমস্যার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব ও পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। জটিলতার ভিতর হইতে একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সহজবোধ্য সম্পর্ক বা রীতি সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। ফলে যদিও সমাজবিজ্ঞানীরা প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের মতো ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারেন না, তথাপি প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সমাজে পরিবর্তনের ধারা চিহ্নিত করিতে পারেন, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়া সেই সমস্ত বিষয়ের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ লাভ করিবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে এবং সীমিত পর্যায়ে ভবিষ্যদ্বাণীও করিতে পারেন। ফলে এই জ্ঞান সমাজজীবন হইতে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করিতে ও সমাজকে পরিকল্পিতভাবে ও বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত করিতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞানের যে-কোনো শাখার ন্যায় সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণাও মানব কল্যাণের জন্য অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। নূতন জ্ঞান, নূতন পদ্ধতি ও নূতন আবিষ্কার মানব সভ্যতার বিকাশ ত্বরান্বিত করিয়াছে। সামাজিক গবেষণা সামাজিক বিষয়ের মধ্যে নূতন সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করে, সামাজিক জটিলতা দূর করে ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বুঝিতে সাহায্য করে। সংস্কারাচ্ছন্ন ও প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে।

সামাজিক নীতি ও কর্মসূচির প্রণয়নে সামাজিক গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজন। সামাজিক ব্যবহার, সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি একমাত্র গবেষণার মাধ্যমেই সঠিকভাবে জানা যায়, ফলে সাধারণভাবে সমাজের অগ্রগতির জন্য ও বিশেষভাবে সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হয়।

সামাজিক গবেষণা মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধন করে ও সমাজের উন্নয়নের জন্য অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠনে সাহায্য করে। সামাজিক গবেষণা সর্বদাই উন্নয়নের পথ পরিষ্কার করে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সামাজিক গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম কাজই হইল জনগণের চাহিদা ও সমস্যা অনুধাবন এবং অনুভূত প্রয়োজন নিরূপণ করিয়া অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন। উন্নয়ন পরিকল্পনার এই কার্যাবলি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার জন্য সামাজিক গবেষণার প্রয়োজন পড়ে, বিশেষত সামাজিক গবেষণার জরিপ পদ্ধতির। এই পদ্ধতির সাহায্যে যে বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইবে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং ঐ তথ্যের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। গবেষণা বা জরিপ তথ্যের উপর ভিত্তিহীন পরিকল্পনা জনগণের চাহিদা পূরণে, সমস্যা সমাধানে, উন্নয়নে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হয়। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম পর্যায়েই সামাজিক গবেষণার প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়নের পর বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাহা বাস্তবায়ন করা হয়। এই সমস্ত কর্মসূচি কতখানি কার্যকরী হইয়াছে বা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহা অনুধাবন করা উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যক। এই পর্যায়ে আবার পরিকল্পনাবিদ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের সামাজিক গবেষণার আশ্রয় লইতে হয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য। এই মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই মূল্যায়নই পরিকল্পনা বা কর্মসূচির যথার্থতা, ফলপ্রসূতা ও সমস্যা উদ্‌ঘাটন করিবে যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হইবে। এই মূল্যায়নও যেহেতু বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক, তাই এই পর্যায়েও মূল্যায়ন গবেষণার প্রয়োজন হয়।

সামাজিক গবেষণার বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Social Research)

সামাজিক গবেষণা সামাজিক অনুসন্ধানের একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। নিম্নে সামাজিক গবেষণার বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

১। সামাজিক গবেষণা একটি সুশৃঙ্খল তথ্য অনুসন্ধান পদ্ধতি। গবেষণা পরিচালনা করিতে হইলে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত গবেষককে কতগুলি সুনির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম করিতে হয়। গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ই বিজ্ঞানসম্মত ও সচেতনভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে। গবেষণার প্রতিটি কাজই সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলা অনুযায়ী করা হয়। গবেষণার জন্য সমস্যা চিহ্নিতকরণ হইতে গবেষণার ফলাফল কিরূপে প্রকাশ করা হইবে সমস্ত কিছুই নিয়মানুযায়ী করা হয় বলিয়াই গবেষণা আজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

২। গবেষণা বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ। গবেষক প্রতিটি পর্যায়েই সচেতনভাবে গবেষণাকে তাহার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির উর্ধ্বে রাখিয়া

বস্তুনিষ্ঠ (objective) ভাবে গবেষণার বিষয়টিকে জানিতে চাহেন এবং কোনোক্রমেই তাহার ব্যক্তিগত মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি যাহাতে গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত না করে সেদিকে লক্ষ রাখেন। তিনি সর্বদাই সংগৃহীত তথ্য ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি অনুমান সমর্থনকারী তথ্য খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রবণতা দমন করেন। অনুমান যাচাই তাহার নিকট মুখ্য, উহাকে সমর্থন করা বা না-করা নয়–এই নীতিতে বিশ্বাস করেন। ফলে গবেষণা ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার ফলশ্রুতি না হইয়া বস্তুনিষ্ঠ ও পক্ষপাতহীন রূপ লাভ করে।

৩। গবেষণার প্রথম ও মুখ্য উদ্দেশ্য হইল গবেষণার সমস্যার সমাধান লাভের জন্য বস্তুনিষ্ঠ সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা। গবেষণার তথ্য সংগ্রহ সংবাদপত্র ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করা হইতে অনেক ভিন্ন। গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি রহিয়াছে। এই পদ্ধতি উপযুক্ততা ও যথার্থতা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহারের পূর্বে কোন্ বিশেষ ক্ষেত্র হইতে বিশেষ প্রকারের তথ্য সংগ্রহের জন্য কোন্ পদ্ধতি উপযুক্ত তাহা নির্ণয় করিয়া এবং সে বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হইয়া ঐ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যাহাদের দ্বারা ঐ সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা হইবে, যেমন সাক্ষাৎ গ্রহণকারী বা পর্যবেক্ষক, তাহাদেরও এই বিষয়ে পারদর্শী করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাহাদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা যাহাতে তথ্য পক্ষপাতদুষ্ট না হয় তাহার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। তবে শুধু তথ্য সংগ্রহ করাই গবেষণা নয়, সংগৃহীত তথ্যকে বিচার বিশ্লেষণ করা, তাৎপর্য নিরূপণ করা উহাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নিরূপণ করা এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সাধারণীকরণ করাই গবেষণা।

৪। সামাজিক গবেষণার অপর বৈশিষ্ট্য হইল যে, এটি ধৈর্যসহকারে পরিচালিত ও সময়সাপেক্ষ। গবেষণা তাড়াহুড়া করিয়া সম্পাদনের বিষয় নয়। তাড়াহুড়া করিয়া বা অযত্ন সহকারে পরিচালিত গবেষণার দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণ কোনো ফলাফল আশা করা যায় না। গবেষককে অবশ্যই ধৈর্যশীল হইতে হইবে এবং তাহার প্রতিটি কাজ সুচিন্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সত্যের সন্ধান বা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্য অনেক সময় ও শ্রমের প্রয়োজন এবং এই জন্য যুক্তিপূর্ণ চিন্তা ভাবনা আবশ্যক।

৫। গবেষণা প্রায়শই একটি দলীয় প্রচেষ্টা। গবেষক একটি দল বা team হিসাবে একটি সমস্যাকে বিভিন্ন দিক হইতে অনুসন্ধান করেন এবং পরস্পরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে একত্রকরণ ও যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে গবেষণায় অগ্রসর হন। অনেক মূল্যবান সামাজিক গবেষণায় দেখা যায় বেশ কিছু ব্যক্তি এক সাথে দীর্ঘদিন ধরিয়া কাজ করিয়া থাকেন। বড় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেই কোনো এক ব্যক্তি বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করিয়া সফলতা লাভ করেন। সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানী ও

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত দল বা গবেষণা team অধিকতর উপযুক্ত, কারণ তাহাতে কোনো বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার বিবেচনা করিবার অবকাশ থাকে। একটি সামাজিক সমস্যার পশ্চাতে সামাজিক অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি কারণ থাকিতে পারে। উক্ত সমস্যার উপর গবেষণা করিবার জন্য সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, মনস্তত্ত্ববিদ ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত দল যেরূপ উপযুক্ত শুধুমাত্র মনস্তত্ত্ববিদ বা সমাজবিজ্ঞানী ততটা উপযুক্ত নাও হইতে পারেন।

৬। গবেষণা প্রতিবেদনে গবেষণার প্রতিটি বিষয়ই সচেতনভাবে ও যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা দান করা হয়। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, নমুনায়ন প্রক্রিয়া, তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, প্রতিটির বর্ণনা দান করা হয় এবং ঐ সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহারের পশ্চাতে কি যুক্তি রহিয়াছে তাহাও ব্যক্ত করা হয়। গবেষণার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করা হয়। গবেষণায় ব্যবহৃত সমস্ত বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির বিবরণ দান করা হয়। তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ফলাফল বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করা হয়। গবেষণায় পদ্ধতিগত বা মানবিক ভুলত্রুটি হইতে তাহা নিঃসংকোচে স্বীকার করিয়া উপসংহারে পৌছানো হয় এবং সাধারণীকরণ করা হয়।

৭। গবেষণা মানব-কল্যাণে অবদান রাখে। গবেষণা ছোট ছোট অসংখ্য আবিষ্কারের মাধ্যমে সমাজজীবন সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রসার করে। ফলিত গবেষণা সামাজিক সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে, উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নকে ফলপ্রসূ করিতে সহায়তা করে এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচির সফলতা ব্যর্থতা নিরূপণে সাহায্য করে।

৮। সামাজিক গবেষণায় সাধারণত সংগৃহীত তথ্যকে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে সংগঠিত করা হয় এবং সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবেই প্রকাশ করা হয়।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই সামাজিক গবেষণাকে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সৎ ও সুদক্ষভাবে গবেষণার এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া গবেষণা পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়।

সামাজিক গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of social research)

সামাজিক জীবন, সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠভাবে জানা ও তাহার নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত বিষয়গুলির উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সামাজিক গবেষণা একটি উপযুক্ত পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা রহিয়াছে। এই সীমাবদ্ধতার জন্য সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির অনুপযুক্ততা নয় বরং যে সামাজিক ক্ষেত্রের উপর সামাজিক গবেষণা করা হয় তাহার বিশেষ বৈশিষ্ট্যই দায়ী। সামাজিক গবেষণার সীমাবদ্ধতার কারণগুলি নিচে আলোচনা করা হইল :

১। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতো সমাজজীবনকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অসুবিধাজনক। সমাজজীবনে সদা পরিবর্তনশীল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নূতন নূতন দার্শনিক মতবাদের বিকাশ এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে সমাজে পরিবর্তন সূচিত হয়। সমাজ ও সময়ভেদে এই পরিবর্তনের গতি ও ধারায় বিভিন্ন হয়। একই সমাজের বিভিন্ন এলাকায়ও পরিবর্তনের এই গতি ও ধারায় বিভিন্নতা দেখা দেয়। এই বিভিন্নতার কারণে সামাজিক গবেষণার ফলাফল সাধারণীকরণে অসুবিধা দেখা যায়।

২। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গবেষণার বিষয় বা উপাদানগুলিকে প্রয়োজন মতো গবেষণাগারে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার মতো সামাজিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে গবেষণার প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। যেমন, সামাজিক অবস্থা বা সামাজিক সমস্যার কারণগুলিকে গবেষণার জন্য নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়। সামাজিক গবেষণার তথ্য বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন চলকের মধ্যকার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় বা প্রভাব নিরূপণ করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে।

৩। সমাজজীবন জটিল। একটি সমাজের অবস্থা ও সমস্যা নানারূপ অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয়ক এবং আন্তর্জাতিক বিষয় ও ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন, মধ্যপ্রাচ্যে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পৃথিবীর অনেক দেশের মতো আমাদের দেশের অর্থনীতির উপর প্রভূত চাপ সৃষ্টি করে। উহার প্রতিক্রিয়া আমাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। কিন্তু এ-প্রভাব এত পরোক্ষ যে তাহা কোনো এলাকার জনগোষ্ঠীর বা সমস্যার উপর গবেষণা করিয়া সঠিকভাবে নিরূপণ করা দুষ্কর। তাহা ছাড়া, এই কারণের সহিত অন্যান্য আরো আর্থ-সামাজিক কারণও জড়িত হইয়া পড়ে। সামাজিক বিষয়গুলির প্রভাব বিচ্ছিন্নভাবে অনুধাবন করা অসুবিধাজনক।

৪। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপাদানকে যেমন সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়, সামাজিক গবেষণায় তাহা সম্ভব নয়। কারণ সামাজিক গবেষণা সাধারণত গুণাত্মক (qualitative) বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত থাকে। এই গুণাত্মক বিষয়কে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিষয়ের মতো সুনির্দিষ্টভাবে (accurately) পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। যেমন কোনো বিষয়ে ব্যক্তির 'মতামত' জানিতে হইলে তাহা অনুকূল, বেশি অনুকূল, খুব বেশি অনুকূল বা অনুকূল নয়, একেবারেই অনুকূল নয় ইত্যাদি ভাবে জানিতে পারি কিন্তু এই 'বেশি অনুকূল ও খুব বেশি অনুকূলে'র মধ্যে পার্থক্য সঠিক কতখানি তাহা যথার্থভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

৫। সামাজিক গবেষণায় পক্ষপাতদুষ্টতার (bias) সম্ভাবনা বেশি। সামাজিক গবেষণা গবেষক এবং তথ্য সংগ্রহকারীদের নিজস্ব চিন্তা, ধ্যানধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে। মানুষের পক্ষে নিজ চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের উর্ধ্বে থাকিয়া বস্তুনিষ্ঠভাবে কাজ করা সহজ নয়। গবেষককে অবশ্যই নিজ মতামত ও মূল্যবোধের

উর্ধ্বে থাকিয়া বস্তুনিষ্ঠভাবে গবেষণা করা উচিত এবং তথ্য সংগ্রহ ও তাহার বিচার-বিশ্লেষণে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু অনেক সময় গবেষকের অযত্ন বা অসচেতনতার দরুন গবেষণা পক্ষপাতদুষ্ট হইয়া পড়ে।

সমাজকর্ম গবেষণা (Social Work Research)

বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই সমাজকর্ম গবেষণার সূত্রপাত। ইহার উদ্দেশ্য সামাজিক নীতি, পরিকল্পনা ও সমাজকল্যাণ কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা। সমাজকর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও সমস্যাবলির সমাধান নিরূপণের জন্য ও সমাজকর্মের জ্ঞান ও প্রত্যয়সমূহের বিস্তৃতিসাধন ও সাধারণীকরণের জন্য সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অনুসন্ধানকে সমাজকর্ম গবেষণা বলে।

সমাজকর্ম গবেষণাকে ফলিত গবেষণার পর্যায়ে ফেলা হয়। মৌলিক গবেষণার সহিত ইহা উদ্দেশ্য ও গুরুত্বের দিক দিয়া ভিন্ন। সমাজকর্মে প্রয়োগের জন্য বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা হইতে জ্ঞান অর্জন করা হয়। সেই দিক দিয়া সমাজকর্ম গবেষণার কাজ হইল সমাজকর্মের জ্ঞানকে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা। সমাজ-কর্মের জ্ঞানকে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত করাও ইহার লক্ষ্য। কোনো বিষয় বা সমস্যাকে বিশদভাবে জানিবার জন্য জ্ঞান অর্জন নয়, বরং সমাজ কর্মের লক্ষ্য অর্জনে উক্ত জ্ঞানকে প্রয়োগ করাই সমাজকর্ম গবেষণার উদ্দেশ্য। সমাজকর্ম কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট। সমস্যা সমাধানের এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করিবার জন্য সমাজকর্ম গবেষণা পরিচালিত হয়।

সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সমস্যা সমাধান করে। এই পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে উদ্ভাবিত হইয়াছে। পদ্ধতিগুলির কার্যকারিতা যাচাই ও নূতন পদ্ধতির আবিষ্কারের জন্য সমাজকর্ম গবেষণা পরিচালিত হয়।

প্রত্যেকটি সমাজেরই নিজস্ব কিছু আচার, আচরণ, প্রথা, মূল্যবোধ, রীতিনীতি রহিয়াছে। এইসব আচার-আচরণ, মূল্যবোধ সমাজের লোকদের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করে। তাই সমস্যা এক হইলেও বিভিন্ন সমাজে তাহার প্রকৃতি, কারণ ও তাহার প্রভাব ভিন্ন হইতে পারে। উপরিউক্ত অবস্থায় একই পদ্ধতির দ্বারা বিভিন্ন সমাজের সমস্যা সমাধান করিতে গেলে সার্থকতা অর্জনের সম্ভাবনা কম। তাই প্রত্যেকটি সমাজকে ও তাহার সমস্যাকে বিশেষ করিয়া জানা এবং সমাজকর্ম পদ্ধতিসমূহ সেই সমাজে কতখানি প্রয়োগযোগ্য তাহা নিরূপণের উদ্দেশ্যে সমাজকর্ম গবেষণা পরিচালিত হয়। সামাজিক অবস্থা ও সমস্যার আলোকে সামাজিক নীতি, পরিকল্পনা ও সমাজকল্যাণ কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য সমাজকর্ম গবেষণা অত্যন্ত জরুরি।

সমাজ কল্যাণে সামাজিক গবেষণার আবশ্যকতা

সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সমাজকল্যাণ অতীত যুগের ন্যায় শুধুমাত্র মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থার উন্নতির জন্য আর্থিক বা বৈষয়িক সাহায্য দিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, বরং মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ কি এবং তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের, এমনকি তাহার মানসিকতার উপর উহার প্রভাব কি তাহাও অনুসন্ধান করে। অতীতের ন্যায় আধুনিক সমাজকল্যাণ দুস্থ মানুষকে তাৎক্ষণিক সাহায্য দিয়াই কর্তব্য শেষ করে না, তাহাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়া স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায় এবং সঠিকভাবে পুনর্বাসিত করিতে প্রয়াস পায়। সমাজ কল্যাণের উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলিকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য প্রয়োজন মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ জানা এবং তৎসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা। এই জ্ঞান অবশ্যই বাস্তবসম্মত, সঠিক ও পক্ষপাতহীন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে ঐ সমস্যার যথাযথ সমাধান খুঁজিয়া বাহির করা যায়। বস্তুনিষ্ঠ ও পক্ষপাতহীন জ্ঞান অর্জনের জন্য আবশ্যক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করিবার, যে-তথ্য বিষয়টির যথাযথ ব্যাখ্যা দান করিবে। সামাজিক সমস্যাকে জানা ও উহার সমাধানকল্পে কর্মসূচি প্রণয়নের পূর্বশর্ত তাই সামাজিক গবেষণা। বস্তুত সামাজিক গবেষণা ব্যতীত আধুনিক সমাজকল্যাণ কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভবপর নহে।

আধুনিক সমাজকর্মের তত্ত্ব ও সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পদ্ধতির আবিষ্কারও হইয়াছে বিভিন্ন গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতেই। সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, মনোচিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও তাহার ফলাফল হইতেই আমরা মানুষের সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছি এবং উহার সমাধানকল্পে নূতন নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার হইয়াছে। সমাজকল্যাণের জন্য সামাজিক সমসা, উহার কার্যকারণ সম্পর্ক সমাজের উপর প্রভাব ইত্যাদি জানা অপরিহার্য। এইগুলি সঠিকভাবে জানার একমাত্র উপায় সামাজিক গবেষণা।

আধুনিক শিল্পায়িত সমাজের পরিবর্তিত অবস্থা ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিক সমাজকর্মের উদ্ভব। তাই শিল্পায়নের বিভিন্ন দিক ও সমাজের উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে সমাজকর্মীর বিশদভাবে অবগত হওয়া আবশ্যক। এ-সংক্রান্ত বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান অর্জনের জন্য সামাজিক গবেষণার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজ পরিবর্তনশীল। সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, ধ্যানধারণা ইত্যাদিরও পরিবর্তন ঘটে। সমাজের পুরাতন সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আবার নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে। পরিবর্তনের গতি সব সময় বা সর্বক্ষেত্রে একই প্রকার নয়, কখনও কোনো সমাজ অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়। আবার কখনও বা এই পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে ধীরে সংঘটিত হয়। সমাজকর্মীকে অবশ্যই সামাজিক পরিবর্তন, উহার গতি ও ধারা সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয় এবং পরিবর্তনের

ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সমাজের মানুষকে ব্যক্তিগত, দলগত বা সমষ্টিগতভাবে সাহায্য করিতে হয়। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তাই সামাজিক গবেষণা আবশ্যক। একমাত্র গবেষণালব্ধ জ্ঞানই সমাজকর্মীকে উপযুক্ত কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণে ও সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে।

প্রতিটি সমাজেরই একটি পৃথক সত্তা বা বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার সংস্কৃতিও ভিন্ন। তাই মানুষের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি ভিন্ন হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ভিন্নতার দরুণ সমাজের সমস্যাবলিও ভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন– পাশ্চাত্যের কোনো উন্নত দেশের সমাজকর্মীরা যে-সমস্ত সমাধানে নিয়োজিত আমাদের দেশের সমস্যা তাহা হইতে অনেকাংশেই পৃথক। পাশ্চাত্য উন্নত দেশগুলিতে বেশির ভাগই আন্তঃপারস্পরিক সম্পর্কজনিত, অসামঞ্জস্যতাজনিত সমস্যা ও অন্যান্য মানসিক সমস্যাই অধিকতর প্রকট। অথচ আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে মৌলিক চাহিদা পূরণের অভাবজনিত সমস্যাই অধিকতর তীব্র ও ব্যাপক। এখানে সমাজকর্মী দারিদ্র্য, অসুস্থতা, অপুষ্টি, অশিক্ষা, অধিক জনসংখ্যা, বেকারত্ব ইত্যাদি সমস্যা লইয়াই অধিকতর ব্যাপৃত। সমাজকল্যাণের প্রয়োজনে তাই সমাজকর্মীকে সেই সমাজের বিশেষ সংস্কৃতি, মূল্যবোধ আচার-আচরণ ইত্যাদি এবং বিশেষ সমস্যা ও তাহার প্রকৃতি জানিয়া ইহার সমাধানে সচেষ্ট হইতে হয়। বিশেষ সমাজের বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিকে জানিবার জন্য তাই আবশ্যক সামাজিক গবেষণার।

ব্যক্তিগত, দলীয় বা সমষ্টির সামাজিক, অর্থনৈতিক বা মানসিক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিস্কৃত হইয়াছে। সমস্যা এক হইলেও বিভিন্ন সমাজে উহার কারণ ভিন্ন হইতে পারে। যেমন, পাশ্চাত্যদেশগুলিতে কিশোর অপরাধের কারণগুলির মধ্যে পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদ, স্কুল জীবনের তীব্র প্রতিযোগিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে কিশোর অপরাধ সংঘটনের ঘটনা বিরল; অথচ আমাদের দেশে কিশোর অপরাধের পশ্চাতে দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী। তাই কিশোর অপরাধ দমন বা অপরাধীদের সংশোধনে জন্য পাশ্চাত্যের একজন সমাজকর্মী যেকর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিবেন সেই সমস্যা সমাধানে আমাদের দেশে অবশ্যই ভিন্নতর কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তাহাদের সমস্যা সমাধানের উপযোগী করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, সমস্যা ও তাহার প্রকৃতি তাহাদের অবস্থা হইতে পৃথক। এহেন অবস্থায় পাশ্চাত্য উদ্ভাবিত পদ্ধতিসমূহ আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কতটুকু প্রয়োগযোগ্য তাহা যাচাই করা আবশ্যক এবং প্রয়োজনানুসারে আমাদের দেশীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা আবশ্যক। সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ, উপযোগিতা যাচাই ও নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইলে প্রয়োজন সামাজিক গবেষণার। সমাজ-কর্ম পদ্ধতি ছাড়াও সমাজকর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব, মূল্যবোধ, নীতি আমাদের সমাজের ভিন্নতর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা,

নিরীক্ষা ও যাচাই করিবার জন্য সামাজিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সমাজকর্ম কর্মসূচিতে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সমাজকর্ম জনগণের উপর কোনো কর্মসূচি চাপাইয়া দেয় না, অধিকন্তু তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মসূচি পরিচালনা করিতে প্রয়াসী। কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণের পূর্ব-শর্ত হইল, সেইসব কর্মসূচিতে জনগণের আগ্রহ ও প্রয়োজন। কর্মসূচি জনগণের অনুভূত প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে এবং কর্মসূচি গ্রহণে জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত কর্মসূচিতে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ আশা করা যায়। অনুভূত প্রয়োজন নিরূপণ, জনগণের মতামত যাচাই ও তাহাদের সুপারিশ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য অত্যন্ত আবশ্যক এবং একমাত্র সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয়ে পক্ষপাতহীন, বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ইহা ছাড়া এলাকার সম্পদ, কাঠামো, নেতৃত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা লাভের জন্যও আমাদের সামাজিক গবেষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

সমাজ কল্যাণের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ সামাজিক গবেষণার উপর নির্ভরশীল। গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই দেশের জন্য প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

সমাজকর্মকে বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী পদ্ধতি হিসাবে পরিগণিত করিতে সামাজিক গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজবিজ্ঞানে গবেষণার আবশ্যকতা

সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাই সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। ইহা সমাজ ও সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (যেমন– পরিবার, রাষ্ট্র, সম্পত্তি) ও উহাদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং ক্ষয় সম্পর্কে আলোচনা করে। ব্যক্তি, দল, সামাজিক স্তরবিন্যাস, প্রথা, আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান, ইত্যাদিও সমাজবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

মানুষের দলগত আচার-আচরণ ও পারস্পরিক কার্যকলাপ, মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়। মানুষের সামাজিক সম্পর্কই ইহার মূল পাঠ্যবস্তু। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা এবং উহার ব্যাখ্যা করাই সমাজবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য। সমাজবিজ্ঞান সমস্যার সামাজিক কারণ, বিবর্তন জানিতে আগ্রহী ইহাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য, সমাধান করিবার জন্য নহে। ইহার আশু (immediate) উদ্দেশ্য সমস্যাকে সঠিকভাবে জানা, উহার সমাধান করা নয়। তবে এ-কথা সহজেই বোধগম্য যে, কোনো সমস্যাকে সমাধান করিতে হইলে উহাকে ভালোভাবে জানিতে হইবে। সমাজবিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতিবিধান। এই কারণে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ (empirical) জ্ঞান আহরণকে সমাজবিজ্ঞান যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। আর কোনো সমস্যা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান আহরণ করিবার

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই হইল সামাজিক গবেষণা। এই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমেই সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি, কারণ, প্রভাব সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও সঠিক তথ্য লাভ করা সম্ভব।

সমাজবিজ্ঞানে মানুষের মূল্যবোধ, আবেগানুভূতি ও স্বার্থ সম্পর্কে পাঠ করা হয়। সমাজবিজ্ঞানে এই বিষয়গুলিকে নিরপেক্ষভাবে পাঠ করা হয়। ভালো বা মন্দ, বাঞ্ছনীয় বা অবাঞ্ছনীয় এইভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যেই সমাজবিজ্ঞানীরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করিয়া থাকেন, কারণ নিরপেক্ষতা সকল বিজ্ঞানেই স্বীকৃত। পূর্বপরিকল্পিত ধারণা লইয়া যদি কোনো সমাজবিজ্ঞানী কোনো সমস্যা বা বিষয়কে জানিতে চাহেন তবে তাহা পক্ষপাতদুষ্ট হইতে বাধ্য এবং উহা হইতে বিষয়টি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা লাভ সম্ভবপর নয়। প্রকৃত ঘটনাকে সঠিকভাবে উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে প্রয়োজন বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার। একমাত্র সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির উপযুক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মূল্যবোধ, আবেগানুভূতি ও স্বার্থ সম্পর্কে নিরপেক্ষ, সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। তাই সমাজবিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ সর্বস্বীকৃত।

স্থানকালপাত্রভেদে সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি, সমাজের আচার-আচরণ, মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচ্য দেশীয় সমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজের মধ্যে ঐতিহ্যগত ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়া বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। তেমনিভাবে জাতি, উপজাতি ও গোত্রভেদে সমাজ-কাঠামোয় ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। বস্তুত প্রতিটি সমাজেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি যথাযথভাবে চিহ্নিত করিবার জন্যও সামাজিক গবেষণার প্রয়োজন।

সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজে মানুষের জীবনযাত্রা পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় এবং সমাজ কাঠামোতে পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন, শিল্পায়ন, শহরায়ন ও আধুনিকরণের ফলশ্রুতি ও প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা এবং উহাদের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ লাভ করিবার জন্য এই-বিষয়ের সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

সমাজবিজ্ঞানের নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান অর্জন ও তথ্য নির্ভর বিস্তারিত বিবরণ লাভের জন্য সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে–

১। মানুষের দলগত আচরণ ও পারস্পরিক কার্যকলাপ।

২। মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য ও গতি-প্রকৃতি।

৩। সামাজিক সম্পর্ক।

৪। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের, যেমন পরিবার, উৎপত্তি, বিবর্তন, কার্যকলাপ ও বিভিন্ন যুগে ও সমাজে উহাদের প্রকৃতি ও কার্যকলাপ।

৫। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অঞ্চলে মানবগোষ্ঠীর বিভক্তি ও বিস্তৃতি, উহাদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক।

৬। গ্রামীণ ও শহর সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য।

৭। সমাজে প্রচলিত প্রথা, মূল্যবোধ, অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

৮। সামাজিক সমস্যার উদ্ভব, বিকাশ, প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব।

৯। সামাজিক পরিবর্তনের কারণ, গতি, প্রকৃতি, ধারা ও প্রভাব।

১০। সমাজে ব্যক্তির স্থান ও ভূমিকা।

গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক গবেষণার প্রায় সমস্ত পদ্ধতিই ব্যবহার করা যায়। উপরিউক্ত বিষয়গুলির যে কোনোটি সম্পর্কে ব্যাপক পরিধিতে তথ্যানুসন্ধান করিতে যেমন জরিপ পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্য তেমনি কোনো একটি সমস্যাকে নির্দিষ্ট পরিধিতে গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিতে কেসস্টাডি পদ্ধতি উপযুক্ত। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগার গবেষণা, অংশগ্রহণের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও প্রশ্নপত্র প্রেরণ প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

জনবিজ্ঞানের সামাজিক গবেষণার আবশ্যকতা

জনবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা যাহা জনসংখ্যা বিষয়ে আলোচনা করে। আধুনিককালে জনবিজ্ঞানের উপর ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হইয়াছে। জনবিজ্ঞান মানুষের জন্মহার, মৃত্যুহার ও স্থানান্তর লইয়া প্রধানত আলোচনা করে। ইহা ব্যতীত স্ত্রী পুরুষভেদে বয়স কাঠামো, বিবাহ, পরিবার ও গার্হস্থ্য, জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ, মাথাপিছু আয়, জনসংখ্যা প্রবাহ, জনসংখ্যা নীতি ও পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় জনবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

যে-কোনো রাষ্ট্র তথা বিশ্বের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য জনবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বাস্তবসম্মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অপরিহার্য। কোনো দেশের জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনেও এই জ্ঞান একান্ত কাম্য বিধায় জনসংখ্যার বিভিন্ন দিকের উপর ব্যাপক গবেষণার আবশ্যকতা রহিয়াছে। এই গবেষণা যেমন বিষয়টি সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ধারণা দান করিবে তেমনি উহার নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের জন্য নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে সাহায্য করিবে। জনসংখ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত বিষয়ে ব্যাপক ধারণা অর্জনের জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা রহিয়াছে :

১। কোনো দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহার এবং জন্মহার ও মৃত্যুহারের উপর ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব।

২। জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি ও প্রকৃতি অনুসন্ধান।

৩। জীবন সম্ভাবনা (longivity) ও উহার উপর ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব।

৪। জনসংখ্যা স্থানান্তর–আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক; স্থানান্তরের কারণ, প্রক্রিয়া এবং সমাজের তথা রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব।

৫। প্রাকৃতিক সম্পদ, মাথাপিছু আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, শ্রমশক্তি ইত্যাদির সহিত জনসংখ্যার সম্পর্ক।

৬। জনসংখ্যা নীতি ও পরিকল্পনা।

৭। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ও উহার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, বাস্তবায়নের সমস্যা, সাফল্য ব্যর্থতার মূল্যায়ন।

৮। সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা জনসংখ্যা সংক্রান্ত উপরিউক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান চালাইতে পারি; যেমন–

(১) শুমারি (complete count or cencus)-এর মাধ্যমে দেশের সমস্ত জনসংখ্যা গণনা করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ইহাকে আদমশুমারি বলা যায়। সাধারণত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কিছুদিন পর পর (যেমন, তিন, পাঁচ বা দশ বৎসর পর পর) এইরূপ শুমারি পরিচালনা করা হয় এবং দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই সমস্ত তথ্যের আলোকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণীত হয়।

(২) নমুনা জরিপ (Sample survey)-এর মাধ্যমেও কোনো বিশেষ শ্রেণি দল বা গোষ্ঠী কিংবা বিশেষভাবে নির্বাচিত জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

(৩) কেস্ স্টাডি (case study) পদ্ধতিতেও উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত ও গভীর জ্ঞান অর্জন করা হয়। কোনো একটি বিশেষ দল, শ্রেণি বা গোষ্ঠীর উপর গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া গবেষণার বিষয়টিকে বিভিন্ন দিক হইতে বিচারই-বিশ্লেষণ করিবার জন্য কেস স্টাডি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

জনবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য বাস্তবক্ষেত্র হইতে সাক্ষাৎকার, প্রশ্নপত্র ও সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমের পর্যবেক্ষণ দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নথি-পত্র, দলিল ইত্যাদি হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া গবেষণা করা যাইতে পারে। যেমন, পৌরসভায় জন্মহার, মৃত্যুহারের রেকর্ড হইতে আমরা নির্দিষ্ট একটি এলাকার জন্মহার ও মৃত্যুহার সম্পর্কে জানিতে পারি, এমনকি মৃত্যুকালে বয়স, মৃত্যুর কারণ এই সমস্ত তথ্যও সংগ্রহ করিতে পারি।

লোক প্রশাসনে গবেষণার আবশ্যকতা

লোক প্রশাসন সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা যাহা সরকারি নীতিসমূহ বাস্তবে রূপদান করিবার বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করে। লিওনার্দ ডি হোয়াইটের মতে, লোক প্রশাসন সেই সমস্ত কার্যের সমষ্টি যাহার উদ্দেশ্য সরকারি নীতির বাস্তবায়ন। সরকার ‘কি’ এবং ‘কেমন’ ভাবে নীতি বাস্তবায়ন করিতেছে তাহাই ইহার মূল আলোচ্য বিষয়। ইহার বিষয়বস্তুকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন–

১। সরকার ‘কি’ করেন–উহার রাজনীতির প্রভাব, কর্তৃত্বের ভিত্তি, লক্ষ্য নির্ধারণ, আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক নীতি ও পরিকল্পনা।

২। কিভাবে সরকার সংগঠিত হয়– প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামো।

৩। কি প্রকারে প্রশাসন সহযোগিতা লাভ করেন– প্রশাসনের ধারা : নেতৃত্ব, নির্দেশনা, সমন্বয়, দায়িত্ব অর্পণ, কেন্দ্র-কর্মস্থল সম্পর্ক, তত্ত্বাবধান, আদর্শ, গণসংযোগ ইত্যাদি :

৪। কি প্রকারে প্রশাসন দায়ী হইয়া থাকেন।– অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং আইন আদালত ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ।

সরকারি নীতির সঠিক ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপরই কোনো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ ও উন্নতি নির্ভরশীল। প্রতিটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে সেই দেশের সরকারি নীতি প্রণীত হয়। সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি পূর্ব-শর্ত হইল সামাজিক জরিপের মাধ্যমে দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জন। লোক প্রশাসনে সামাজিক গবেষণা কেন প্রয়োজন তাহা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল :

১। সরকারের প্রবৃদ্ধি (Growth) ও পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করিবার জন্য।

২। সরকারের নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে।

৩। সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য।

৪। প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক প্রভাব অনুধাবনের জন্য।

৫। সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানিবার জন্য।

৬। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া জানিবার জন্য।

৭। সমন্বয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

৮। প্রশাসনিক আইন (Administrative Law) ও তাহার উপযোগিতা সম্পর্কে জানিবার জন্য।

৯। সুষ্ঠু সমন্বয় ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য।

১০। কর্মচারী নিয়োগ, বেতন কাঠামো, উন্নতি, প্রশিক্ষণ, অবসর গ্রহণ, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানিবার জন্য।

১১। লোক প্রশাসনে জনগণের সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য।

গণপ্রশাসনে ঘটনা অনুসন্ধানমূলক (Fact finding) গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সরকার সম্পর্কিত গবেষণা মৌলিক ও ফলিত উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। তবে কোনো একটি বিষয়ের উপর পরিচালিত মৌলিক গবেষণা শেষ পর্যন্ত ফলিত গবেষণা পরিচালনার পথ প্রদর্শন করিতে পারে। লোক প্রশাসনে গবেষণার গুরুত্ব থাকায় এই ক্ষেত্রে গবেষণার পরিচালনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

লোক প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য সামাজিক গবেষণার প্রায় পদ্ধতিই ব্যবহার করা যায়। এই-বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগার গবেষণা, ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ,

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ, ভোটদান, চিঠিপত্র আদান-প্রদান (Correspondence), পরিদর্শন (Inspection), সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নপত্র প্রেরণ ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় সামাজিক গবেষণার আবশ্যকতা

উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সামাজিক গবেষণার নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। বস্তুত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, উহা কার্যকরীভাবে বাস্তবায়ন ও উহার মূল্যায়ন সামাজিক গবেষণার উপর নির্ভরশীল। তাই একজন পরিকল্পনাবিদকে অবশ্যই সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে এবং বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বলিতে Leonora S. D. Guzman (১৯৭৬) মতে, 'সম্পদের সুশৃঙ্খল, সর্বোত্তম ও বিবেচনাসম্মত ব্যবহারের মাধ্যমে সকলের জন্য উন্নত জীবনমান অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের যুক্তিসংগত, বিবেচনাপ্রসূত ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টাই বুঝায়।' সরকারের জাতীয় উন্নয়নমূলক নীতির বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করিবার জন্যই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনা কতগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। যেমন– ইহা গবেষণা বা জরিপ তথ্যভিত্তিক হইতে হইবে। অর্থাৎ যে অবস্থার উন্নয়নের জন্য বা চাহিদা পূরণের জন্য বা সামাজিক সমস্যা, সমাধানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে উক্ত বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান না থাকিলে ঐ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা যে ফলপ্রসূ হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। কোনো এলাকার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করিতে হইলে সেই এলাকার বর্তমান অবস্থা, চাহিদা, সমস্যা ও সম্পদ সম্পর্কে অবশ্যই ব্যাপক ও সুষ্ঠু ধারণা থাকিতে হইবে আর এই ব্যাপক ও সুষ্ঠু ধারণা অর্জনের জন্য ঐ এলাকার চাহিদা, সমস্যা, সম্পদ ইত্যাদি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এই তথ্যের ভিত্তিতেই ঐ এলাকার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা বাঞ্ছনীয়। তাই এই তথ্য অবশ্যই সঠিক (valid) ও নির্ভরযোগ্য (reliable) হইতে হইবে। আর যে পদ্ধতিতে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাহাই সামাজিক গবেষণা। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সামাজিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

উন্নয়ন পরিকল্পনার অপর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল ইহা বাস্তবায়নযোগ্য হইতে হইবে এবং ইহাতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকিতে হইবে। পরিকল্পনাবিদ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বেই যদি বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সমস্যা বা বাধা সম্পর্কে জানেন তাহা হইলে তিনি পূর্বেই এ-বিষয়ে যত্নবান হইয়া এমন কৌশল বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন যাহাতে পরিকল্পনা সহজে বাস্তবায়ন করা যায়। উপরন্তু পরিকল্পনা যদি কোনো এলাকার জনগণের চাহিদা বা অনুভূত প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত হয়, প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের

পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলাকার জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যাইবে। অপরদিকে, সামাজিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী উন্নয়ন পরিকল্পনা সামাজিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হইবে এবং তাহা ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হইবে না। তাই পরিকল্পনা বাস্তবায়নযোগ্য ও ইহার বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য গবেষণার মাধ্যমে পরিকল্পনার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

উন্নয়ন পরিকল্পনার অপর বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা ধারাবাহিক। অর্থাৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা কোনো বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা নয়, ইহা একটি ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা। প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদ থাকে। উক্ত মেয়াদ শেষে পুনরায় অধিকতর উন্নয়নের জন্য নূতন পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনার এই ধারাবাহিকতা রক্ষা ও পরবর্তী পরিকল্পনা অধিকতর বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর উহা কতখানি লক্ষ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হইয়াছে তাহা মূল্যায়ন করা। এই মূল্যায়ন ব্যতীত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কতখানি ফলপ্রসূ হইয়াছে বা হয় নাই, বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয় জানা সম্ভবপর নয়। পরিকল্পনার সার্থকতা, ব্যর্থতা, সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা ইত্যাদি এই মূল্যায়নের মাধ্যমেই জানা যায় এবং এই তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়। তাই প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর উহার মূল্যায়ন অপরিহার্য। এই মূল্যায়নের জন্যও সামাজিক গবেষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। গবেষণা ছাড়াও মূল্যায়ন বিভিন্নভাবে করা সম্ভব। যেমন, যাহারা পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন তাহাদের রিপোর্ট। কিন্তু এই ধরনের রিপোর্ট নির্ভরযোগ্য ও সঠিক না হইবার সম্ভাবনাই বেশি। এই প্রকারের প্রশাসনিক রিপোর্ট গবেষণাভিত্তিক না হইলে তাহা পক্ষপাতদুষ্ট হইতে পারে। কারণ বাস্তবায়নের জন্য দায়ী ব্যক্তিরা নিজেদের দক্ষতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বা ব্যর্থতা বা দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য অতিরঞ্জিত বা ভ্রান্ত তথ্য সরবরাহ করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিতে পারে। তাই নিরপেক্ষ গবেষক দ্বারা বৈজ্ঞানিক সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগে কোনো কর্মসূচির মূল্যায়ন করিলে উক্ত বিষয়ে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভ করা সম্ভব। এই তথ্য ভবিষ্যতে উক্ত বিষয়ে নূতন পরিকল্পনা প্রণয়নে ভিত্তি হিসাবে কাজ করিবে। বস্তুত উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ের সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনা সাধারণত নিম্নোক্ত পর্যায় অনুসরণ করে :

(১) পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ণয় (objective)

(২) অগ্রাধিকার নিরূপণ (priority)

(৩) লক্ষ্য নির্ধারণ (target)

(৪) বাজেট প্রণয়ন (budget)

(৫) বাস্তবায়ন (implementation)

(৬) মূল্যায়ন (evaluation)

উপরোক্ত পর্যায়গুলি লক্ষ করিলে দেখা যায়, পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাজেট প্রণয়ন অবশ্যই বাস্তব তথ্যভিত্তিক হইতে হইবে অর্থাৎ উহা গবেষণা বা জরিপ তথ্যভিত্তিক হইবে। এই কারণে অনেক সময়ই পরিকল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণের পরই দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে জরিপ বা গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যেমন– পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, অগ্রাধিকার ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য সামাজিক গবেষণার জরিপ পদ্ধতি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ করিবার লক্ষ্যে কর্মমুখী বা কৌশলগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং সর্বশেষে মূল্যায়নের জন্য জরিপ বা গবেষণার অন্যান্য পদ্ধতি যেমন Quazi-experiment ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটি পর্যায়েই কোনো না কোনো সামাজিক গবেষণা পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হয়। সামাজিক গবেষণার সহিত সম্পর্কহীন উন্নয়ন পরিকল্পনা কখনো বাস্তবসম্মত বা ফলপ্রসূ হইতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে উহা কাগুজে পরিকল্পনায় পরিণত হয়।

বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণার অসুবিধা

সমাজের উন্নতি অগ্রগতির জন্য সামাজিক পরিবেশ, মানুষের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতাজাত অনুসন্ধানের (empirical investigation) গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে সামাজিক গবেষণা সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য আবশ্যকীয় গবেষণালব্ধ তথ্যের বিশেষ অভাব রহিয়াছে। অথচ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে উপরিউক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতে গেলে আমাদের দেশে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এদেশে সামাজিক গবেষণাপূর্বক ঐতিহ্য না থাকায় গবেষণার কাজ প্রায়ই জনগণের অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়।

নিম্নোক্ত কারণে আমাদের দেশে সামাজিক গবেষণার তথ্য সংগ্রহ বাধাপ্রাপ্ত হয় :

১। আমাদের দেশে শিক্ষার হার মাত্র শতকরা ২৩ ভাগ। অশিক্ষিত হওয়ার দরুন জনগণ সাধারণতঃ সামাজিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারে না, ফলে সঠিক তথ্য সরবরাহের প্রতি দায়িত্বশীল হয় না। এই কারণে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে।

২। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ গ্রামে বাস করে। গ্রামের জনসাধারণ সাধারণতঃ ভাগ্যে বিশ্বাসী। তাহারা বিপদে-আপদে খোদা বা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে এবং নিজের চেষ্টায় নিজের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপারে আগ্রহী নয়, এহেন

সামাজিক অবস্থায় সমস্যা সমাধানের জন্য পরিচালিত গবেষণা প্রায়শ:ই জনগণের প্রতিরোধ বা অনীহার সম্মুখীন হয়।

৩। দীর্ঘদিন ধরিয়া বিদেশি শাসনে থাকিবার ফলে জনগণ সরকারি কর্মচারীদের বিশেষ সুদৃষ্টিতে দেখে না। সরকারি কর্মচারী বা নীতির প্রতি জনগণের অনাস্থা ও সন্দেহের দরুন সরকারি কর্মচারী দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। জনগণ তাহাদের উপর নূতন কোনো কর ধার্য করা হইবে অথবা তাহাদের জন্য ক্ষতি হইতে পারে এই আশঙ্কায় তথ্য সংগ্রহে অসহযোগিতা করে।

৪। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সরকারি ও বেসরকারিভাবে জনগণের ক্ষয়-ক্ষতির উপর তথ্য সংগ্রহ করিয়া সেই ভিত্তিতে সাহায্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। তাই অনেক সময় জনগণ সাহায্য পাইবার আশায় তথ্য সংগ্রহকারীর নিকট নিজের অবস্থা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করে।

৫। আমাদের দেশে বিশেষত গ্রামে নেতা বা মাতব্বরদের বিশেষ ভূমিকা আছে। গ্রাম সংক্রান্ত বিষয় তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা ধনী ব্যক্তিদের উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইবে-ইহাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা হয়; সেক্ষেত্রে ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের মতামত চাওয়া হইলে বা কোনো দরিদ্র গ্রামবাসীকে গ্রাম সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিতে বলিলে তাহা বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে করা হয়। ফলে তথ্যানুসন্ধানকারী গ্রামের নেতৃস্থানীয়দের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

৬। আমাদের সমাজে বৃদ্ধদের মতামতের প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে পরিবারে বৃদ্ধদের বাদ দিয়া অন্যান্যদের তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার লওয়া অসুবিধাজনক। বৃদ্ধদের বয়স্কজনিত সম্মান দেখাইয়া তথ্য সংগ্রহ করিবার প্রতি অনুসন্ধানকারীকে সজাগ থাকিতে হয়।

৭। পর্দা প্রথার দরুন আমাদের মহিলাদের নিকট হইতে পুরুষ তথ্যানুসন্ধানকারীর দ্বারা তথ্য-সংগ্রহ অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। গ্রামীণ মহিলাদের সহিত সরাসরি যোগাযোগ করা অনেক সময় মহিলা তথ্যানুসন্ধানকারীদের পক্ষেও সম্ভব হয় না।

৮। কি পুরুষ কি মহিলা কেহই আমাদের সমাজে যৌন বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা পছন্দ করে না। ইহা অত্যন্ত লজ্জাজনক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় যৌন সম্পর্ক, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। বিশেষত মহিলারা এইসব বিষয়ে আলোচনা করিতে অত্যন্ত দ্বিধাবোধ করে, ফলে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

৯। আমাদের দেশে জনগণের আয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করাও অসুবিধাজনক। অনেক ক্ষেত্রেই আয়কর দিতে হইবে ভাবিয়া কম আয় বলা হয়, আবার দরিদ্র ব্যক্তিরা সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দেখিলেও তাহাদের আয় কম বলিয়া উল্লেখ করে। গ্রামের চাষীদের মজুরির কোনো নির্দিষ্ট হার নাই। তাহা ছাড়া অর্থ ছাড়াও ক্ষেতে উৎপন্ন ফসল দিয়া তাহাদের মজুরি দেওয়া হয় এবং কাজের সময় খাবার দেওয়া হয়। এইভাবে মজুরি

পাওয়ায় গরিব অশিক্ষিত কৃষকের কাছে তাহার মাসিক বা বার্ষিক আয় জানিতে চাইলে সঠিক হিসাব মতো আয় সে বলিতে পারে না। অনুমান করিয়া একটা সংখ্যা বলিয়া দেয় যাহা অনেক সময়ই সঠিক নয়।

১০। শিক্ষিত তথ্য সংগ্রহকারী ও গ্রামের অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত তথ্য সরবরাহকারীর মধ্যে ভাষা কখনও বাধা হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যাহত হইতে পারে। উপরন্তু গবেষণায় এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয় যাহা আঞ্চলিক ভাষায় পরিবর্তন করা সম্ভব নহে। সেই সব শব্দ গ্রামবাসীর নিকট বোধগম্য করিয়া তোলা অনেক সময়ই অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে।

১১। গ্রামে কোনো বহিরাগতের আগমন হইলে প্রায়ই দেখা যায় কৌতূহলী জনগণ তাহার চারিপাশে ভিড় জমাইয়া ফেলে। এহেন অবস্থায় তথ্য সংগ্রহকারীর পক্ষে উত্তরদাতাকে একাকী পাওয়া দুরূহ হইয়া পড়ে। গ্রামের জনগণ অনেক সময় বহিরাগতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান থাকায় তাহাকে গোপনে একাকী প্রশ্ন করা হউক তাহা পছন্দ করে না, বিশেষত মহিলারা। ফলে একজনকে প্রশ্ন করা হইলে অনেক সময় সে প্রশ্নের উত্তর কয়েকজন প্রদান করে, এভাবে উত্তরদাত্রীর উত্তর অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে। অনেক সময় শাশুড়ি, মা, দাদি, নানী, পাড়া-পড়শীরা উত্তরদাত্রীর হইয়া জবাব দেয়। উত্তরদাত্রীকে তাহার নিজস্ব মতামত জানাইতে অনুরোধ করিলে সে মুরুব্বীদের সম্মান দেখাইবার জন্য প্রায়শই শাশুড়ি বা অন্যান্যরা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তাহার মত বলিয়া দেন। ফলে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

১২। উত্তরদাতাকে একাকী পাওয়া গেলেও তিনি যে অনুসূচির প্রশ্ন অনুযায়ী জবাব দিবেন, তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। উত্তরদাতা অপ্রাসঙ্গিক কথাই বেশি বলিবেন এবং তথ্য সংগ্রহকারীকে ধৈর্য সহকারে উহা হইতে তাহার প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়।

১৩। অশিক্ষিত হওয়ার দরুন জনগণ প্রায়শই গুছাইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না, ফলে তথ্য সংগ্রহকারীকে তাহার বক্তব্যকে গুছাইয়া লিখিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় অনেক সময় মূল বক্তব্য বদলাইয়া যায়।

১৪। দরিদ্রতাহেতু আমাদের বেশির ভাগ লোক যেখানে ব্যক্তিগত সাহায্যপ্রাপ্তির আশা নাই, সেই সব বিষয়ে উৎসাহ বোধ করে না। গবেষণাকারী তাহাদের আর্থিক কোনো সাহায্য না করিলে প্রায়ই তাহারা তাহার সহিত কথা বলিয়া অধিক সময় নষ্ট করিতে চায় না।

১৫। প্রশাসনের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের অনিচ্ছা ও অনীহার কারণে অনেক সময় গবেষণার তথ্য সংগ্রহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অধীনে কোনো কর্মসূচি বা প্রকল্পের কার্যাবলি জানিবার জন্য বা মূল্যায়নের জন্য সংগ্রহ করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য। গবেষক নিজের ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি দান ও গবেষণার উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা দান, অনুরোধপত্র প্রদান ইত্যাদির দ্বারা প্রশাসনের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের গবেষণার

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, তথ্য অফিসের যে-সমস্ত নথিপথে সংরক্ষিত তাহা বাহিরের কাহারো নিকট সরবরাহ করিবার অনুমতি নাই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করিয়া এ-বিষয়ে অনুমতি সংগ্রহ করিতে হয়, যাহা অনেক সময়ই দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ। অনেক সময় মূল্যায়নের দ্বারা কর্মসূচির দুর্বলতা বা ব্যর্থতা প্রকাশ হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় অনেক প্রশাসক এই বিষয়ে সহযোগিতা করিতে চাহেন না বা অতিরঞ্জিত কিংবা ভ্রান্তিপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেন।

গবেষণা ফলাফলের ব্যবহার (Use of research findings)

গবেষণার জন্য গবেষণা নহে। যে কোনো ফলিত গবেষণার উদ্দেশ্য হইল নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নে সহায়তা করা। বাংলাদেশে সামাজিক গবেষণার ইতিহাস অত্যন্ত অল্প কালের। অল্প কিছুদিন পূর্বেও মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক নিজ উদ্যোগে গবেষণা কার্য পরিচালনা করিয়াছেন। গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সংগঠনও তেমন ছিল না। প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্ব-শর্ত হিসাবে গবেষণাকে কমই গণ্য করা হইত। ইহার ফলশ্রুতিতে অতীতে অনেক নীতিই অবাস্তব ও অনেক পরিকল্পনাই অবাস্তবায়নযোগ্য বলিয়া পরিণামে বিবেচিত হইয়াছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ অনুদানকারী দাতা দেশগুলির চাপে বর্তমানে সরকার এবং দেশি-বিদেশি অনেক সংস্থা বাংলাদেশের নানা বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জানা, সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ নিরূপণ, নানা প্রকারের উন্নয়ন কর্মসূচির সম্ভাব্যতা অবলোকন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যেই এই সমস্ত গবেষণা মূলত পরিচালিত হইয়াছে। সরকারি ও বেসরকারি অনেক সংগঠন গবেষণা পদ্ধতি স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করিতেছে।

গবেষণা পরিচালনার ব্যাপারে ইদানীং আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ করা গেলেও গবেষণালব্ধ তথ্যের ব্যবহারে এখন পর্যন্ত সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিজেদের ধ্যানধারণা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেন। কর্মসূচি প্রণয়নের পূর্বে যেমন সম্ভাব্যতা জরিপের (feasibility study) উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয় না তেমনই কর্মসূচির পুনর্বিন্যাস বা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও মূল্যায়ন জরিপ বা গবেষণালব্ধ তথ্যকে বিবেচনা করা হয় না। কর্মকর্তাগণ অফিস সংক্রান্ত নানা কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে তাহাদের পক্ষে অনেক সময় গবেষণার দীর্ঘ প্রতিবেদনসমূহ পাঠ করিবার সময় ও সুযোগ হয় না। গবেষকগণও প্রায়ই গবেষণার কাজ শেষ হইলেই সন্তুষ্ট থাকেন। গবেষণার ফলাফল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠাইবার উদ্যোগ নেন না, ফলে গবেষণার ফলাফল দ্বারা ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয় না।

শুধু গবেষণা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। গবেষণার ফলাফল নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে, কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও উন্নয়নে, সামাজিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ব্যবহার হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রতিটি গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য তাহাদের গবেষণা সম্পর্কে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবহিত করা। প্রয়োজনবোধে ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা উচিত। অন্যথায় এই সমস্ত গবেষণা ব্যাপকভাবে জাতির উন্নয়নে সঠিক অবদান রাখিতে পারিবে না।

সামাজিক গবেষণার নৈতিক মানদণ্ড (Ethics of Social Research)

সামাজিক গবেষণার উদ্দেশ্য হইল প্রচলিত জ্ঞানের সহিত নতুন জ্ঞানের সংযোজন। এই নতুন জ্ঞান মানবতার উন্নয়নে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হইবে, ইহাই কাম্য। গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যকে অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনায় অধিকতর সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। সামাজিক গবেষণা একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, কারণ এ-পদ্ধতি সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রণালিবদ্ধ।

সামাজিক গবেষণা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিধায় গবেষণা পরিচালনায় গবেষককে কিছু নৈতিক দায়িত্ব পালন করিতে হয়। বস্তুত গবেষকের জ্ঞান, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, দায়িত্বশীলতা ও সত্যনিষ্ঠার উপর গবেষণার ফলাফল বহুলাংশে নির্ভরশীল। উপরন্তু গবেষণা একটি দলীয় কর্ম হওয়ায় গবেষণাদলের সকলের জ্ঞান, দক্ষতা, দায়িত্ববোধ, সত্যনিষ্ঠা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধও গবেষণার ফলাফলকে প্রভাবিত করিতে পারে। গবেষক তাই গবেষণার ফলাফলের সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা রক্ষার্থে গবেষণার নৈতিক মানদণ্ডের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত নৈতিক মানদণ্ডসমূহ কোনো গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা অপরিহার্য–

১। গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষার্থে গবেষক ও তাহার দলকে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে থাকিতে হইবে, গবেষক ও তাহার সহকর্মীদের মতামত, মূল্যবোধ, জ্ঞান ও ধ্যানধারণা দ্বারা যাহাতে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ বা ফলাফল প্রভাবিত না হয় সে দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এ-জন্য গবেষক নিজকে এবং তাহার গবেষণাদলকে সর্বদা গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক রাখিবেন।

২। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠী, তাহাদের আচার-আচরণ, মতামত, সংস্কার, জ্ঞান, মূল্যবোধ, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবহিত ও শ্রদ্ধাশীল হইতে হইবে। তাহাদের মতামত গবেষকের মতামত বা মূল্যবোধের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হউক বা না হউক, গবেষককে আন্তরিকতার সাথে ঐ জনগোষ্ঠীকে গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। গবেষক গবেষণার ফলাফল ও তাহার মতামত বা আদর্শের সপক্ষে আনিবার জন্য তথ্যের হেরফের করিবেন না।

৪। সঠিক তথ্যের উপর গবেষণার ফলাফলের গুরুত্ব নির্ভরশীল। তাই সঠিক সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহকারী নির্বাচন ও তাহাদের প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধায়ন, ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

৫। গবেষক জ্ঞানী ও দক্ষতাসম্পন্ন হইতে হইবে। যে-পদ্ধতির সাহায্যে গবেষক গবেষণা পরিচালনা করিতে চাহেন, সে পদ্ধতি সম্পর্কে তাহাকে পারদর্শী হইতে হইবে। গবেষণা একটি দলীয় কর্মপ্রচেষ্টা বিধায় প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যেমন, অর্থনীতিবিদ, মনোবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, পরিসংখ্যানবিদ, এমনকি চিকিৎসক বা আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। তথ্যের সুষ্ঠু বিচার বিশ্লেষণের জন্য ইহা প্রয়োজন হয়।

৬। তথ্য সরবরাহকারীদের সহিত গবেষকের, তথ্যসংগ্রহকারীদের একটি কার্যকরী সম্পর্ক (working relation) গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তথ্য সরবরাহকারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক তথ্য সরবরাহ করে। এই জন্য গবেষককে অত্যন্ত সৎ ও পরিষ্কারভাবে গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, প্রকৃতি ও উহার ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য সরবরাহকারীদের অবহিত করিতে হইবে।

৭। গবেষণার জন্য সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। গবেষণার তথ্য গবেষণা উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যাহাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তথ্য সরবরাহকারী বা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠির গোপনীয়তা রক্ষার্থে তাহাদের নাম বা এলাকার নাম ব্যবহার না করাই কাম্য।

৮। গবেষণার দ্বারা তথ্য সরবরাহকারী যাহাতে কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি কোনো রূপ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে তাহা পূর্বাহ্নেই তাহাদের জানাইয়া তাহাদের অনুমতি সাপেক্ষে ঐ গবেষণা পরিচালনা করিতে হইবে।

৯। তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য সরবরাহকারীকে মিথ্যা প্রলোভন বা ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা চলিবে না।

গবেষণার নৈতিক মানদণ্ডগুলি গবেষকের পেশাগত দায়িত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। এ-মানদণ্ড অনুসরণে গবেষণার ফলাফলের সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। গবেষণা মূল্যবান হয়। তাই প্রত্যেক গবেষকেরই এ-নীতিমালাগুলি অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য।

অষ্টম অধ্যায়

বর্ণনামূলক অনুসন্ধান

Descriptive Studies

বর্ণনামূলক অনুসন্ধান পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রকৃতি বিজ্ঞানে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। সামাজিক বিজ্ঞানেও ইহার ব্যবহার ব্যাপক। কোনো দল বা গোত্রের বৈশিষ্ট্যাবলির সুষ্ঠু বর্ণনা লাভের জন্য এই প্রকার অনুসন্ধান পরিচালিত হয়। সমাজবিজ্ঞানে কোনো জনগোষ্ঠীর বয়স, ধর্ম, ঐতিহ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জন্ম ও মৃত্যু হার, সংস্কৃতি জানিবার জন্য অনেক গবেষণা করা হয়। কোনো এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে এলাকার বিভিন্ন চাহিদা, সম্পদ, প্রয়োজনীয় সুবিধাবলির প্রাপ্ততা, অপরাধপ্রবণতা, গৃহ ব্যবস্থা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা লাভ করা আবশ্যক। কোনো বিশেষ শ্রেণি বা দলের প্রতি জনগণের মনোভাব, বা কোনো দল বেশি ভোট পাইবে–এই ধরনের বিষয় জানিবার জন্যও অনুসন্ধান পরিচালিত হয়। এই প্রকারের সামাজিক অনুসন্ধান যাহার মাধ্যমে কোনো সমস্যা, বিষয় বা অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করিবার প্রচেষ্টা করা হয়, তাহাদের বর্ণনামূলক অনুসন্ধান বা গবেষণা নামে আখ্যায়িত করা হয়। গবেষণার বিষয়, সমস্যা বা অবস্থাটির যথাযথ, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ প্রদানই এই সমস্ত অনুসন্ধানের লক্ষ্য। এই ধরনের অনুসন্ধানের মাধ্যমে সাধারণত কোনো অনুমান যাচাই করা হয় না। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য ব্যবহৃত সবচাইতে সহজ পদ্ধতিই হইল বর্ণনামূলক অনুসন্ধান।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সমস্যা অনেক ও জটিল প্রকৃতির। এই সমস্ত সমস্যা দূরীকরণের বা সমাধানের জন্য সর্বপ্রথমেই প্রয়োজন সমস্যার প্রকৃতি, কারণ, প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা। বর্ণনামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা এইসব সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে পারি। উন্নয়নশীল দেশে শুধু সমস্যা জানাই একমাত্র বিষয় নহে। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সমাজের মানুষের আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা প্রণালি, ধর্ম, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ, ইত্যাদি যে-কোনো উন্নয়ন তৎপরতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। যে-কোনো উন্নয়ন তৎপরতায় জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা থাকা অপরিহার্য, অন্যথায় উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। তাই যে-কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনায় ক্রমেই প্রয়োজন যে বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইবে সেই বিষয় বা ক্ষেত্রটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা। এই জন্য যে বিষয়ে বা

ে ত্রে উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পিত হইবে সেই বিষয় বা ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সঠিক চিত্র লাভ করা আবশ্যক। এই ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসূচি পরিকল্পিত হইলে উহা জনগণের চাহিদা ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে, ফলে অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে। এই প্রকারের কর্মসূচিতে জনগণের সহযোগিতা অধিক পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্ব-শর্ত হইল জরিপ বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া সমাজের প্রকৃত অবস্থা ও চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক গবেষণা অধিকতর উপযোগী। এই গবেষণার জন্য বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু শুধু তথ্য সংগ্রহ করাই গবেষণা নহে যদি না ঐ তথ্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন চলকের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তাই বর্ণনামূলক গবেষণার মূল লক্ষ্য কোনো সমস্যার বিস্তারিত ও সঠিক বিবরণ প্রদান হইলেও ইহা তথ্যের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া থাকে।

বর্ণনামূলক অনুসন্ধান করিতে হইলে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে, যেমন– (১) গবেষণার বিষয়টি বর্ণনাযোগ্য হইতে হইবে, (২) তথ্য সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য হইতে হইবে (৩) বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ ও সঠিক চিত্র যাহাতে পাওয়া যায় বর্ণনা সেইরূপ বিস্তারিত হইতে হইবে।

বর্ণনামূলক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য-সংগ্রহের এক বা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। যেমন, কোনো জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানিবার উদ্দেশ্যে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রশ্ন-পত্র প্রেরণ, পর্যবেক্ষণ, প্রাপ্ত নথিপত্র বিশ্লেষণ ইত্যাদি সব কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তবে এই কথা স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, যে-পদ্ধতিই ব্যবহার করা হউক না কেন তাহা সুপরিকল্পিত হইতে হইবে। গবেষণার মাধ্যমে যেহেতু উক্ত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করিবার চেষ্টা করা হয়, সুতরাং পক্ষপাতদুষ্টতা প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা পূর্বাহ্নেই গ্রহণ করিতে হইবে।

এই অনুসন্ধানের সীমাবদ্ধতা এই যে, গবেষক গবেষণার বিষয় বা সমস্যাটির এমন বর্ণনা প্রদান করিতে পারেন যাহা সম্পূর্ণ, ফলে উহার উপর আর কোনো গবেষণার সুযোগ থাকে না। গবেষণা মূলত সৃষ্টিধর্মী এবং উহা পরবর্তীতে বিষয়টির উপর আরো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গবেষণার সূত্রপাত করিবে তাহাই বাঞ্ছনীয়। সামাজিকবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত বিষয় বা সমস্যাগুলির বৈশিষ্ট্য হইল যে, উহাদের ধারাবাহিকতা রহিয়াছে। অর্থাৎ উহাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ রহিয়াছে কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, গবেষক বর্তমান অবস্থার বর্ণনা লইয়াই অধিকতর ব্যাপকৃত হইয়া পড়েন। ফলে বিষয় বা সমস্যাটির পরিবর্তনের ধারা বা অতীত অবস্থা জানা যায় না। অপর সীমাবদ্ধতা হইল যে, পরিসংখ্যা পদ্ধতির উপর অধিক নির্ভরশীলতা। এই প্রকারের গবেষণায় সমস্যার বর্ণনায় প্রায়ই তথ্য গড়, শতকরা, বিস্তার পরিমাপ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়। সংখ্যাতত্ত্ব বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের একটি হাতিয়ার হিসাবে কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্লেষণে সহায়তা করিলেও সর্বদা উহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

নবম অধ্যায়

সামাজিক জরিপ

Social Survey

সামাজিক জরিপ সামাজিক তথ্যানুসন্ধানের অপর একটি পদ্ধতি। জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা নূতন ঘটনা নয়। অতীতেও কোনো এলাকা বা এলাকাবাসীর রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানিতে হইলে শাসকগণ সাধারণত সেই এলাকা বা এলাকাবাসী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের আদেশ দিতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জরিপ সাধারণত পরিচালিত হইত ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তথ্যানুসন্ধানকারীর দৃষ্টি সাধারণত নিবদ্ধ থাকিত কোনো এলাকার সামাজিক সমস্যার প্রতি। সেই সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধানের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি সংগ্রহ করা হইত। জরিপের মাধ্যমে গৃহ ব্যবস্থা, চাকরি সংক্রান্ত, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়, অপরাধ, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হইত। এলাকায় পরিবর্তন মূল্যায়ন করিবার জন্যও কোনো কোনো সময় জরিপ পরিচালনা করা হইত।

যুগের সাথে সাথে তথ্য সংগ্রহের এই পদ্ধতিতেও পরিবর্তন হইয়াছে। আধুনিক যুগের জটিল সমাজব্যবস্থা তথ্যানুসন্ধানের কাজকে দুরূহ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে জরিপ পদ্ধতিকেও উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোলা হইয়াছে যাহাতে সঠিক নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করা যায়।

কোনো এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হইল সেই এলাকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করা অর্থাৎ উক্ত এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জানিবার জন্য জরিপ করা। জরিপের মাধ্যমে এলাকার চাহিদা, অবস্থা, সমস্যা ও তাহার কারণ ইত্যাদি বিষয় ধারণা অর্জন করা সম্ভবপর হয়। এলাকার উন্নয়নে বা সমস্যা সমাধানে ব্যবহারযোগ্য স্থানীয় সম্পদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে হইবে। উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতেই উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যথাযথ ও সুষ্ঠু উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য তাই জরিপ অপরিহার্য।

সামাজিক তথ্যানুসন্ধানকে দুই ভাবে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমত অল্প সংখ্যক বিষয়কে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা। দ্বিতীয়ত বিস্তৃত পরিধির অধিক সংখ্যক বিষয়ের উপর ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করা। সামাজিক জরিপ দ্বিতীয় শ্রেণির অনুসন্ধান পদ্ধতি। সামাজিক জরিপ সাধারণত জনগণ, তাহাদের বৈশিষ্ট্য, জীবন-যাপন পদ্ধতি ও ধারা, কার্যাবলি, দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত, মূল্যবোধ ইত্যাদি লইয়া ব্যাপৃত থাকে। বাস্তব কোনো

সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যেই সাধারণত সামাজিক জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের ফলাফল পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তব কর্মসূচি প্রণয়নে ব্যবহৃত হয়।

সমাজবিজ্ঞানী ছাড়াও বাজার সংক্রান্ত গবেষকগণও জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। উৎপাদনকারীগণ সর্বদা তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ বা প্রতিক্রিয়া জানিতে আগ্রহী। উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি ও চাহিদা বৃদ্ধির জন্য উপরোক্ত তথ্য আবশ্যক। এই ধরনের কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য বাজার জরিপ করা হয়। বলা বাহুল্য, উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার চাহিদা, বিশেষ দ্রব্যের সাফল্য ও ব্যর্থতা যাচাই-ই এই সমস্ত জরিপের মুখ্য উদ্দেশ্য। জরিপ তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের কোনো পরিবর্তন বা মূল্যায়ন করা হয়।

গণতান্ত্রিক দেশসমূহে ভোটারদের মতামত জানিবার জন্য জরিপকার্য পরিচালিত হয়। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন দলের বা নেতার প্রতি বা সরকারি নীতি ও কার্যাবলির প্রতি জনগণের আস্থা, ধারণা ও মতামত যাচাই করিবার জন্য জরিপ করা হয়।

সামাজিক জরিপের সংজ্ঞা (Definition of Social Survey)

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক জরিপে সংজ্ঞা দান করিয়াছেন। যেমন, পলিন. ভি. ইয়ং-এর মতে "সামাজিক অগ্রগতির জন্য গঠনমূলক কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সামাজিক অবস্থা ও চাহিদার উপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পন্ন অনুসন্ধানকে সামাজিক জরিপ বলে।" ("A survey of a community has been defined as the scientific study of its condition and needs for the purpose of presenting a construtive programme of social advance"-Pouline V. Young)। এই সংজ্ঞায় এলাকার উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি প্রণয়নের জরিপের উপর গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে। গঠনমূলক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করাই সামাজিক জরিপের লক্ষ্য।

অপর দুইজন লেখকের মতে "আঞ্চলিক সমাজসেবার চাহিদা নিরূপণ এবং এই সমস্ত চাহিদা পূরণের মাত্রা নিরূপণের জন্য যে অনুসন্ধান করা হয় তাহাকে সামাজিক জরিপ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ঐ সমস্ত চাহিদা পূরণে উক্ত এলাকায় অবস্থিত সংস্থাসমূহের সার্থকতা যাচাই ও সমন্বিত সামাজিক কার্যক্রমের পরিকল্পনার মধ্যে জরিপের উদ্দেশ্য নিহিত।" (A study designed to examine the needs for social services in a community, to determine the the degree to which these needs are beging met, the effectiveness of existing agencies in meeting the needs and to develop a plan for co-ordinated social action," Earnest B. Harper and Arthur Dunham)।

গুড্ এন্ড স্কেটস্ (Good & Scates)-এর মতে সামাজিক জরিপ একটি যৌথ প্রচেষ্টা যাহা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার বর্তমান সমস্যা, পরিস্থিতি বা জনসংখ্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তাহাদের অবস্থা নিরূপণের জন্য গবেষণা পদ্ধতির ব্যবহার করে। ইহার উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কার বা সমস্যা সমাধানের জন্য গঠনমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন।

সামাজিক জরিপের প্রয়োজনীয়তা

সামাজিক জরিপ পদ্ধতি লইয়া প্রায়ই নানা প্রকার আলোচনার সূত্রপাত হয়। কোনো কোনো সমাজ বিজ্ঞানীর মতে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য তেমন কিছু মূল্যবান নয়। অন্যান্যদের মতে জরিপই একমাত্র পন্থা যাহার মাধ্যমে সমাজ বিজ্ঞানী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন।

পরিকল্পনাবিদরা অনেক সময়ে মনে করেন যে, তাহারা তাহাদের এলাকার চাহিদা ও সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাই সমস্যা সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য জরিপ করা অর্থ ও সময়ের অপচয় ব্যতীত আর কিছু নয়। যদিও ইহা সত্য যে, এলাকাবাসী তাহাদের এলাকার চাহিদা ও সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকেন তথাপি ইহাও সত্য যে, তাহারা তাহাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ হইতেই এই সমস্যা বুঝিবার প্রয়াস পান। প্রত্যেক মানুষেরই পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ও আগ্রহ রহিয়াছে। তাই একটি সমস্যা সম্পর্কে তাহাদের আগ্রহ ও ধারণাও পৃথক হওয়া সম্ভব। প্রতিটি সমস্যা, তাহার প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব সম্পর্কেও সকলের সমান ধারণা থাকা সম্ভব নয়। সমস্যা ও তাহার কারণ সম্পর্কে বাহ্যিকভাবে খণ্ড খণ্ড যে ধারণা পাওয়া যায়, তাহা ঐ সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। এইরূপ অসম্পূর্ণ ধারণাকে ভিত্তি করিয়া কোনো কর্মসূচি প্রণয়ন করা হইলে, তাহা অনেক সময়ই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করিতে বা তাহার কারণ দূরীকরণে ব্যর্থ হয়। অহরহই আমরা এইরূপ কর্মসূচির ব্যর্থতার প্রমাণ পাই।

বস্তুত সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতির ক্ষেত্রে সামাজিক জরিপ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সামাজিক পরিকল্পনার জন্য বাস্তব অবস্থার জরিপ অপরিহার্য। অন্যথায় এই পরিকল্পনা কখনই বাস্তবমুখী হইবে না এবং ইহার দ্বারা সামাজিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না। জরিপ ভিত্তিহীন সামাজিক পরিকল্পনা মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা অনেকটা অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইবার সামিল। আমাদের মতে উন্নয়নগামী দেশে সামাজিক জরিপের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সামাজিক জরিপ সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

আমাদের দেশে সামাজিক সমস্যা অনেক ও জটিল প্রকৃতির। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমস্যা হইতে আমাদের দেশের সমস্যা ভিন্ন, আবার আমাদের দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের সমস্যা ভিন্ন প্রকৃতির। শহরের বিভিন্ন এলাকার সমস্যার মধ্যে যেমন তেমনি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সমস্যার মধ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দেশ ও এলাকা ভেদে উন্নয়নকল্পে ব্যবহারযোগ্য সম্পদও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। প্রতিটি এলাকার বিশেষ চাহিদা, সমস্যা সম্বন্ধে সুষ্ঠু জ্ঞান না থাকিলে এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচি যে-বাস্তব সম্মত ও উপযুক্ত হইবে না তাহা সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহব্যবস্থা, পুষ্টি, জন্যসংখ্যা, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইলে উপরোক্ত বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমাদের দেশে বিভিন্ন এলাকা তাহার সমস্যা, এলাকাবাসীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে জরিপ তথ্যের বিশেষ অভাব রহিয়াছে। তাই আমাদের অর্থনৈতিক ও

সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক জরিপ কার্যের প্রয়োজন। উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনে জনমত গঠন, নূতন কর্মসূচি গ্রহণের উৎসাহ সঞ্চার, সমাজ সেবা কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি রোধ, বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন, ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন সামাজিক জরিপের। কোনো এলাকার উন্নয়নের জন্য কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হইলে উহার সঠিক মূল্যায়নের জন্যও জরিপ আবশ্যক।

এ-কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সংগৃহীত তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতার মধ্যেই সামাজিক জরিপের কার্যকারিতা নিহিত। যে বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইবে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভের সম্ভাবনা কমে যায়, ফলে জরিপের কার্যকারিতাও নষ্ট হইয়া যায়। জরিপ সময়োপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ যখন তথ্যের প্রয়োজন তখনই তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। নতুবা তথ্যের গুরুত্ব নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে।

সামাজিক জরিপ ও সামাজিক গবেষণা

সামাজিক জরিপ ও সামাজিক গবেষণা প্রায়শই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূলতঃ সামাজিক জরিপ সামাজিক গবেষণার একটি পদ্ধতি বিশেষ। সামাজিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য সামাজিক গবেষণার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, সামাজিক জরিপ তেমনি একটি পদ্ধতি এবং ইহা সামাজিক গবেষণার একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। ইহার নির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে পরিচালিত সামাজিক গবেষণার সহিত ইহার কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

সামাজিক জরিপ ও গবেষণা উভয় সমাজকে পর্যালোচনা করে ও মানুষের কল্যাণকামী। তাহাদের উদ্দেশ্য এক হইলেও দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। জরিপ সাধারণত কোনো বিশেষ এলাকার জনগণ, বিশেষ এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, সমস্যা ইত্যাদি লইয়া ব্যাপৃত থাকে। জরিপ জরুরী চাহিদাসমূহ পূরণে আগ্রহী, ফলে জরিপলব্ধ তথ্য চাহিদা পূরণ বা সমস্যা সমাধানে অধিক ব্যবহৃত হয়। গবেষণা সুদূরপ্রসারী, ইহা বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি করতে চায় যাহাতে নূতন তত্ত্ব বা পদ্ধতি খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

জরিপ মানুষের জীবন মান উন্নয়ন করিতে প্রয়াসী। গবেষণা মানবজীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে চায়, এই জ্ঞান পরবর্তীকালে জরিপকারী বা পরিকল্পনাবিদগণের নিকট মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

গবেষণা জ্ঞান আহরণ ও সেই জ্ঞানের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ-এই দুই উদ্দেশ্যই পরিচালিত হয়। কিন্তু জরিপ সর্বদাই তথ্য সংগ্রহ করে কোনো উন্নয়নমূলক কাজকে সহায়তা করিবার জন্য। উন্নয়ন কার্যে জরিপলব্ধ তথ্য প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়।

জরিপের মাধ্যমে সাধারণত বিস্তীর্ণ এলাকার অধিকসংখ্যক বিষয়ের উপর গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়। গবেষণার মাধ্যমে কোনো প্রশ্নের উত্তর লাভ করিতে বা কোনো অনুমান (Hypothesis)-এর সত্যতা করিতে চাওয়া হয়। জরিপের অনুমান যাচাই বড় প্রশ্ন নয়। এখানে জনগণ বা এলাকার বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য লাভ করাই মুখ্য-যাহা পরবর্তী পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নে ব্যবহৃত হইবে।

দশম অধ্যায়

সামাজিক গবেষণার পর্যায়

STAGES OF SOCIAL RESEARCH

সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করিতে হইলে কতগুলি পর্যায় অনুসরণ করিতে হয়। এই পর্যায়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। যদিও বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা হইয়া থাকে, এই কাজগুলি মূলত একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা এমন নিবিড় যে, গবেষণার প্রথম পর্যায় অনেক সময় নির্ধারণ করে গবেষণার শেষ পর্যায়ের প্রকৃতি। গবেষণার প্রতিটি পর্যায়েরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ বিশেষ চাহিদা রহিয়াছে যাহার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। প্রথম হইতেই যদি প্রতিটি পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদার প্রতি লক্ষ রাখা না হয় তাহা হইলে নানা প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে এবং গবেষণা কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইতে পারে। এই সমস্ত অসুবিধা যখন প্রকট হইয়া উঠে, তখন অনেক সময়ই ইহা সংশোধন করা সম্ভবপর হয় না, কারণ তাহা হয়তো প্রথম পর্যায়ের কোনো ভুল বা ত্রুটি হইতে উদ্ভূত। এই সমস্ত অসুবিধা এড়াইবার একমাত্র উপায় হইল গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা এবং পরবর্তী পর্যায়ের চাহিদা সম্পর্কে পূর্ব হইতেই সচেতন হওয়া।

১। গবেষণার বিষয়চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণ,

২। প্রাসঙ্গিক বই-পত্রের পর্যালোচনা,

৩। গবেষণার নক্‌শা প্রস্তুতকরণ,

৪। তথ্য সংগ্রহকরণ,

৫। তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ,

৬। ফলাফল উপস্থাপন বা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

গবেষণা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়গুলি উপরিউক্ত বৃত্ত-চিত্র হইতে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। গবেষক কোনো নির্দিষ্ট গবেষণার বিষয় লইয়া এই বৃত্তের প্রথম পর্যায়ে প্রবেশ করেন। অবশ্য বিষয় নির্বাচন ও অনুমান গঠনে তিনি অতীতের গবেষণা হইতে প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করেন। এই বৃত্তের পাঁচটি পর্যায় অতিক্রম করিয়া গবেষক তাহার গবেষণা কাজ সমাপ্ত করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন কিন্তু গবেষণা প্রক্রিয়া এইখানে থামিয়া যায় না বা সমাপ্ত হইয়া যায় না।

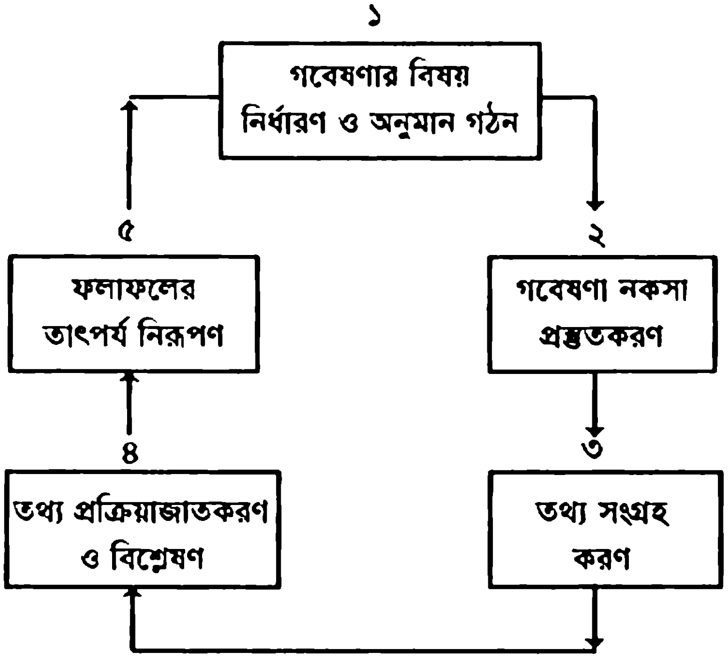
১
গবেষণার বিষয় নির্ধারণ ও অনুমান গঠন
২
গবেষণা নকসা প্রস্তুতকরণ
৩
তথ্য সংগ্রহ করণ
৪
তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ
৫
ফলাফলের তাৎপর্য নিরূপণ

গবেষণার ফলাফল সঠিক না হইলে বা আংশিকভাবে সঠিক হইলে বা গবেষণার বিষয় সম্পর্কে সুষ্ঠু বা ব্যাপক ধারণা দিতে অসমর্থ হইলে গবেষক নতুনভাবে পুনরায় গবেষণার প্রথম পর্যায়ে প্রবেশ করেন এবং পূর্বের গবেষণার ভুল-ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে নূতনভাবে বিষয় নির্ধারণ করেন ও অনুমান গঠন করেন। গবেষণা সফল হইলেও গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ হইতে গবেষক হয়তো তাহার অনুমান পরিবর্তন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারেন এবং পুনরায় প্রথম হইতে পঞ্চম পর্যায়ের মধ্যে দিয়া এই অনুমান যাচাইয়ে ব্রতী হন। গবেষণা ফলাফল হইতে নমুনায়ন ও পরিমাপকের অপ্রতুলতা ধরা পরিতে পারে। তখন গবেষককে পুনরায় প্রথম পর্যায় হইতে গবেষণা শুরু করিতে হয়। ইহা চূড়ান্ত গবেষণার ফলাফল হইতে গবেষণার বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনেক বিষয়ে গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাহা গবেষণার অপেক্ষা রাখে। বস্তুত একটি গবেষণা ভবিষ্যতে আরো গভীরভাবে বা বিস্তারিতভাবে গবেষণা করিবার পথ নির্দেশ করে। তাই একটি গবেষণা আরো গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে। এইভাবেই একটি বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে উন্নত হইতে উন্নততর জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, গবেষণা সফল হইলেও অন্য এলাকায় গবেষণা করিয়া কি ফল পাওয়া যায়, একই ফলাফল পাওয়া যায় কিনা বা কি পার্থক্য লক্ষ করা যায় তাহা জানিবার জন্য গবেষক একই গবেষণা বিভিন্ন এলাকায় পুনরাবৃত্তি করিয়া ফলাফল যাচাই করিতে বা পার্থক্য লক্ষ করিতে পারেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে একই গবেষণা নকসা অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা করা হয়। সেই ক্ষেত্রেও গবেষককে বার বার প্রথম পর্যায় হইতে পঞ্চম পর্যন্ত অতিক্রম করিতে হয়।

একাদশ অধ্যায়

গবেষণার বিষয় চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণ

IDENTIFICATION AND FORMULATION OF RESEARCH PROBLEM

দৈনন্দিন জীবনে আমরা সমাজের নানা ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, নানা সমস্যার সম্মুখীন হই। এইগুলির কোনটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কোনোটি করে না। কোনো কোনো বিষয় বা ঘটনা আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে, আমরা সে সমস্ত ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্কে জানিতে আগ্রহান্বিত হই। এই সমস্ত ঘটনার সবগুলিই গবেষণার উপযোগী নহে। তবে ইহাদের অনেকগুলিই গবেষণার অপেক্ষা রাখে। গবেষণার বিষয়টির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা করিতে হইলে তাই প্রথম কাজই হইল গবেষণার সমস্যা বা বিষয়টির নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয় :

১। যে সকল সমস্যা জটিল ও যাহার সমাধান কাম্য সেইগুলি গবেষণার উপযোগী।

২। যে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব বলিয়া আশা করা যায়।

৩। বিষয়টি এমন হইবে যে, উহাকে বুঝিয়ে বা বিশ্লেষণ করিতে বা কার্যকারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিবার জন্য যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে। অর্থাৎ বিষয়টি এমন, যাহার সঠিক বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবের দরুন গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

৪। সমস্যা বা বিষয়টি গবেষণার যোগ্য হইতে হইবে। অর্থাৎ সমস্যাটি এমন হইবে যাহাকে বিশ্লেষণ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হইবে।

৫। সমস্যাটি পরিমাপযোগ্য হইতে হইবে।

সুতরাং গবেষণার জন্য বিষয় নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব সচেতনতার সহিত চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।

গবেষণার সমস্যা নির্ধারণের পূর্বে গবেষককে যে বিষয় বা ক্ষেত্র সম্পর্কে গবেষণা করিবেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। নতুবা উক্ত বিষয় সম্পর্কে গবেষণার বিষয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হইবে না। এই জন্য গবেষণার বিষয় চিহ্নিত করিবার পর গবেষককে বিষয়টি লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিতে হইবে। গবেষণার সমস্যা বা বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বই-পত্র, গবেষণা প্রতিবেদন, পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত

সংবাদ বা প্রবন্ধ, দলিল বা নথি-পত্র পাঠ করিয়া এবং পর্যালোচনা করিয়া সমস্যা বা বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। প্রথমেই এই উদ্দেশ্যে তাহাকে বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বই, গবেষণা প্রবন্ধ ইত্যাদির গ্রন্থপঞ্জি (Biliography) প্রস্তুত করা প্রয়োজন। গ্রন্থপন্থি প্রস্তুতকরণ ও বই-পত্র পর্যালোচনা করিবার জন্য গবেষণা প্রক্রিয়ায় গ্রন্থাগারের ব্যবহার অপরিহার্য। অনেক সময় দেখা যায়, গবেষক নিজ পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করেন এবং গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বস্তুত গ্রন্থাগারের ব্যবহার ব্যতীত ফলপ্রসূ গবেষণার কথা চিন্তা করা যায় না। গ্রন্থাগারের বই-পত্র ইত্যাদি হইতেই গবেষক জানিতে পারেন, যে-বিষয়টি তিনি গবেষণার জন্য নির্বাচন করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে বা উহার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতিপূর্বে কি কি এবং কি প্রকারের গবেষণা বা বই-পত্র প্রকাশ হইয়াছে এবং কোনো কোনো দিকগুলি গবেষণার অপেক্ষা রাখে। একটি বিষয়ের উপর ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে গবেষণা করা যাইতে পারে। সুতরাং গবেষক তাহার নির্বাচিত বিষয়ে ইতিপূর্বে কোনো গবেষণা হইয়া থাকিলে উহা বিষয়টির পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারেন এবং নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টিকে বিচার বিশ্লেষণ করিবার উদ্দেশ্যে গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করিতে পারেন।

জটিল সমস্যার উপর বা বৃহৎ কলেবরের কোনো গবেষণা পরিচালনা করিতে হইলে এবং বিষয়টি বা ক্ষেত্র (Setting) সম্পর্কে গবেষকের জ্ঞান সীমিত হইলে, গবেষণার বিষয় নির্বাচনের পরই উদ্ঘাটনী অনুসন্ধান পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়। বস্তুত যে-কোনো সুসংবদ্ধ গবেষণার প্রথমেই উদ্ঘাটনী অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণার সমস্যাটি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা উচিত। উদ্ঘাটনী অনুসন্ধান যে-কোনো দীর্ঘমেয়াদি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। সময়ের অভাব বা অন্য কোনো কারণে গবেষককে অবশ্যই সমস্যা নির্ধারণের পূর্বে উদ্ঘাটনী অনুসন্ধান পরিচালনা করা না গেলেও, গবেষককে অবশ্যই সমস্যা নির্ধারণের পূর্বে বই-পত্র পর্যালোচনা করিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা হইতে বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করিতে হইবে। সমস্যাকে বুঝিতে সাহায্য করে এমন অন্তর্দৃষ্টি উদ্দীপক ঘটনা থাকিলে তাহা বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। এইভাবে বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের পর গবেষক গবেষণার সমস্যাটিকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করিবেন। সমস্যা নির্ধারণ বলিতে গবেষণার বিষয়টিকে সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা বুঝায়। গবেষণার বিষয়টি কোন্ কোন্ দিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং কোন্ কোন্ দিক হইতে সমস্যাটিকে বিচার বিশ্লেষণ করা হইবে তাহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে। গবেষণার আওতায় কোন্ কোন্ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং কোন বিষয় হইবে না তাহাও সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে হইবে। গবেষণার বিষয়টি সঠিকভাবে নির্ধারণ করিবার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলির বিবেচনা করিতে হয় :

১। গবেষণা সমস্যাটির সংজ্ঞা দান করিতে হইবে। অর্থাৎ যে বিষয়ে গবেষণা করা হইবে সে সম্পর্কে-সংক্ষিপ্ত আকারে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

২ । গবেষণা সমস্যার পরিধি সীমিত হইবে। একটি সমস্যার বিভিন্ন দিক থাকিতে পারে। একটি গবেষণার আওতায় একটি বিষয়ের উদ্দেশ্য বিভিন্ন দিক লইয়া গবেষণা করা অসুবিধাজনক, কারণ উহাতে গবেষণা জটিল আকার ধারণ করিতে পারে। গবেষণার পরিধি ব্যাপক হইলে বিভিন্ন দিকে প্রতিটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অসুবিধাজনক হইতে পারে এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর সঠিক গুরুত্ব না পড়িতেও পারে। সীমিত পরিধির বিষয় লইয়া গবেষণা করিলে গবেষকের পক্ষে মূল বিষয়টির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়া সম্ভবপর হয়। তিনি মূল বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিতে পারেন। ইহাতে তথ্যের বিশ্লেষণ অসুবিধাজনক হয়। ত্রুটিও কম হইবার সম্ভাবনা থাকে। তাই গবেষণা অবশ্যই 'পরিচালনযোগ্য' পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে হইবে। এই পরিধির মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা অত্যন্ত সচেতনতার সহিত নির্ধারণ করিতে হইবে।

৩। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাইবে কিনা তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। অনেক সমস্যা আছে যাহার জন্য লোকের একান্ত ব্যক্তিগত বা গোপন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এই সমস্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা প্রায়শই দুষ্কর। এই প্রকারের তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা লইয়াও প্রশ্ন হইতে পারে। তাহা ছাড়া সামাজিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে।

৪। গবেষণার বিষয় নির্বাচনে গবেষকের লক্ষ রাখিতে হইবে যে, উক্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভবপর কিনা।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রাসঙ্গিক বই-পত্রের পর্যালোচনা

LITERATURE REVIEW

গবেষণা প্রক্রিয়ার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হইল গবেষণার জন্য নির্বাচিত বিষয়টির সহিত সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন, বই-পত্র ও প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করা ও উহা সুশৃঙ্খলভাবে পর্যালোচনা করা। বস্তুত গবেষক প্রাথমিকভাবে গবেষণার বিষয় চয়নের পরই আরম্ভ হয় এই পর্যালোচনার প্রক্রিয়া। গবেষক যে-বিষয়ে গবেষণা করিতে আগ্রহী উক্ত বিষয়ে অবশ্যই তাহার সম্যক জ্ঞান থাকিতে হইবে। তাই তাহাকে বিষয়টির সহিত অতীতে যে সমস্ত গবেষণা হইয়াছে এবং বর্তমানে যেসব গবেষণা পরিচালনাধীন রহিয়াছে বা অসমাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, উহাদের সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে এবং তাহার গবেষণার স্বার্থে ঐগুলি পাঠ করিতে এবং পর্যালোচনা করিতে হইবে। এই কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, গবেষণার জন্য নির্বাচিত বিষয় ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে গবেষকের ভালো ধারণা না থাকিলে, উক্ত বিষয়ে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে গবেষণা করা সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী গবেষণা ও বই-প্রবন্ধের পর্যালোচনা যে-কোনো গবেষণায় নিম্নোক্ত কারণে প্রয়োজন :

১। পর্যালোচনার মাধ্যমেই গবেষক নিরূপণ করিতে পারেন, যে বিষয়ে তিনি গবেষণা করিতে আগ্রহী, উক্ত বিষয়ে ইতোমধ্যে কি জ্ঞান বর্তমান ও তাহার গবেষণাটি উক্ত জ্ঞানের কোনো পর্যায়ে অবস্থান করিবে। যে-কোনো গবেষণার উদ্দেশ্য প্রচলিত তত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। অতীতের ও বর্তমানের গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতেই গবেষক তাহার গবেষণাকে জ্ঞানের বা সাধারণীকরণের সঠিক অবস্থানে স্থাপন করিতে পারেন। কোনো বিষয়ে জ্ঞানের মধ্যে কোনো অংশে শূন্যতা থাকিলে, তাহা পূরণ করিতে পারেন। ফলে এই পর্যালোচনার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।

২। অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি এড়াইবার জন্য এই পর্যালোচনা আবশ্যক।

৩। গবেষণার বিষয় নির্ধারণের (formulation) জন্যও এই পর্যালোচনা আবশ্যক। পূর্বের গবেষণার ও প্রবন্ধাদির পর্যালোচনা হইতে গবেষক নির্ণয় করিতে পারেন, তাহার গবেষণার বিষয়টির কোনো দিকটির (aspect) প্রতি গুরুত্বারোপ করিতে হইবে বা কোনো দৃষ্টিকোণ হইতে গবেষণার সমস্যাটিকে নির্ধারণ করিবেন। এই পর্যালোচনা

তাহাকে উপযুক্ত গবেষণা পদ্ধতি বা কৌশল (apporoach) গ্রহণে, কার্যকরী অনুমান (working hypothesis) গঠনে, প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞাদানে সাহায্য করে। ইহা ছাড়াও গবেষণার জন্য চলক (variable) নির্ধারণে, তথ্য সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণের এবং তথ্য বিশ্লেষণের বিষয়ে ধারণা লাভ করিতে সাহায্য করে। এককথায়, এই পর্যালোচনা তাহাকে গবেষণা নক্সা প্রস্তুতিতে ফলপ্রসূভাবে সহায়তা করে।

৪। গবেষণার তত্ত্বগত (theoretical) ভিত্তি কি হইবে সেই-বিষয়েও গবেষককে সহায়তা করে। ইতিপূর্বের গবেষণায় কি তত্ত্বগত কৌশল (theoretical approach) গৃহীত হইয়াছে এবং কেন হইয়াছে, উহা হইতে গবেষক তাহার গবেষণার তত্ত্বগত দিকটি লইয়া চিন্তা-ভাবনা এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন।

৫। প্রায় গবেষণাতেই পরবর্তী গবেষণার জন্য সুপারিশ করা হয়। ঐ সমস্ত সুপারিশ গবেষণার বিষয় ও অনুমান নির্ধারণের জন্য মূল্যবান।

৬। ইতিপূর্বে উক্ত বিষয়ে গবেষণা করিতে যাইয়া পূর্ববর্তী গবেষকগণ কি কি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন, যে নমুনায়ন বা তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা গবেষণায় উল্লেখ করেন। এইসব বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান গবেষক তাহার গবেষণাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার নির্দেশনা লাভ করেন। অতীতের অভিজ্ঞতা তাহাকে ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি হইতে রক্ষা করে।

যদি গবেষণার বিষয়টি এমন হয় যে, সে বিষয়ে ইতিপূর্বে কোনো গবেষণাই হয় নাই, তবে সে গবেষণা উক্ত ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক গবেষণা হিসাবে চিহ্নিত হইবে। ফলে গবেষককে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের তাগিদে বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ভাবনার সহিত পরিচিত হইতে হইবে (উদ্‌ঘাটনী অনুসন্ধান অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তবে বর্তমানকালে সমাজে খুব কম সমস্যাই আছে যা কোনো না কোনোভাবে আলোচিত হয় নাই।

ছাত্র-ছাত্রী যারা প্রথমবারের মতো গবেষণার কাজে নিয়োজিত হইতেছে, তাহাদের জন্য উচিত এমন একটি গবেষণার বিষয় নির্বাচন করা যাহার উপর কিছু গবেষণা ইতোমধ্যে হইয়াছে। একবারে নূতন বিষয়ে নূতন গবেষকের গবেষণা না করাই উত্তম। যে বিষয়ে কিছু কাজ হইয়াছে এমন একটি বিষয় নির্বাচন করিয়া ঐ সমস্যাকে অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে বা উহার সহিত অন্য বিষয়ের যোগসূত্রের উপর গবেষণা করা যাইতে পারে। অথবা একই বিষয়ে বিভিন্ন এলাকায় গবেষণা করিয়া উহার ফলাফলের তুলনা করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া একই বিষয় বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণা করিয়া উহাদের সাহায্যে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে তুলনা করা যাইতে পারে। পূর্ববর্তী গবেষণা নূতন গবেষককে নানাভাবে সাহায্য করিবে।

কার্যোপযোগী গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুতকরণ

এই পর্যালোচনার প্রয়োজনে প্রথমেই একটি কার্যোপযোগী গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রাথমিকভাবে গবেষণার বিষয় চয়ন করিবার পরই গবেষক উক্ত বিষয়ে বা

উহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট গবেষণা বা প্রবন্ধাদির তালিকা প্রস্তুতে মনোযোগ দেন। এই গ্রন্থপঞ্জির অন্তর্ভুক্ত হইবে অতীতে ঐ বিষয়ে প্রকাশিত বই-পত্র, প্রবন্ধ, দলিল, নথি-পত্র, প্রশাসনিক প্রতিবেদন ইত্যাদি। শুধুমাত্র নাম দেখিয়াই বই বা প্রবন্ধাদির তালিকা প্রস্তুত করিলে চলিবে না, কারণ অনেক সময়ই বইয়ের নামের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথাযথ বা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। এজন্য অবশ্যই সূচিপত্র দেখিতে হইবে এবং যদি সূচিপত্রে সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিতভাবে উল্লেখ না থাকে তবে বইয়ের ভিতরের অধ্যায়গুলোর শিরোনামও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। উহাতে ঐগ্রন্থে আলোচিত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সমস্ত বইয়ের সমস্ত বিষয়ই যে গবেষকের কাজে লাগিবে তাহা নহে। কোনো বইয়ের কেবল কোনো অংশ বা অধ্যায় প্রয়োজনীয় হইতে পারে। এই জন্য এইরূপ বিস্তারিত গ্রন্থ-তালিকা গবেষককে পর্যালোচনার জন্য সঠিক বইপত্র-পত্রিকা নির্বাচন করিতে সহায়তা করিবে।

গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুতের ব্যাপারে গবেষকের প্রথমেই খুব বেশি নির্বাচনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা ঠিক নহে। প্রথমে একটু বিস্তারিত বা ব্যাপকভাবে গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। অতঃপর এই গ্রন্থপঞ্জিগুলি পড়িয়া বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করিয়া তাহার গবেষণার চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সংক্ষিপ্ত কার্যোপযোগী গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করিতে হইবে। কাযোপযোগী গ্রন্থপঞ্জি কত দীর্ঘ বা কত বড় হইবে তাহার কোনো ঠিক নাই। যদি অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচিত বিষয়টির উপর অধিক গবেষণা বা লেখালেখি হইয়া থাকে তবে এই তালিকা দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক এবং এই ক্ষেত্রে গবেষককে যত্ন সহকারে গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং নির্বাচনমূলক (selective) মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ যাহা অধিকতর প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক শুধু সেইগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। তেমনি যদি গবেষক এমন বিষয় অনুসন্ধান করিতে চাহেন যে বিষয়ে বাস্তবসম্মত জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে, তখন তাহার গ্রন্থ-পঞ্জি এতটা সুনির্দিষ্ট হইবে না।

গবেষণার জন্য পাঠ

গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুতের পরই গবেষককে উক্ত বই-পত্রপত্রিকার বিষয়গুলির পর্যালোচনার জন্য সেইগুলি পাঠে মনোনিবেশ করিতে হইবে। গবেষণার জন্য যথেষ্ট ও দক্ষতাসম্পন্ন পাঠের গুরুত্ব আজ ব্যপকভাবে স্বীকৃত। শুধুমাত্র গবেষণার বিষয় খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য নহে, ব্যবহৃত পদ্ধতির বিশ্লেষণ, তথ্য ও খবরা-খবর সংগ্রহ করিবার জন্য গবেষকের প্রাসঙ্গিক বই-পত্র পাঠ অপরিহার্য। অন্যান্য গবেষকের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হওয়ার একমাত্র পন্থা এই পাঠ। এই পাঠের মধ্যেই গবেষক জানিতে পারেন একটি বিষয়ের উপর কিভাবে সুশৃঙ্খলভাবে ধাপে ধাপে চিন্তা-ভাবনা করা হইয়াছে। প্রায়শ দেখা যায় যে, গবেষকগণ নিজেরা কোনো একটি বিষয়ে গবেষণা করিতে আগ্রহী হওয়া মাত্রই উক্ত বিষয়ে গবেষণা কাজ শুরু করিয়া দেন। গবেষণার পাঠের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বই-পত্র খুঁজিয়া বাহির করা বা সেইগুলি গভীরভাবে পাঠের জন্য সময় ব্যয় করিতে চাহেন না। তাই অনেক গবেষণা প্রতিবেদনেই দেখা যায় যে, গবেষক এই

বিষয়ে কোনো বক্তব্য রাখেন না বা তাহার গবেষণাকে অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের সহিত যুক্ত বা তুলনা করেন না। অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার এই প্রকাশের মনোভাব বঞ্চিত নহে। বৈজ্ঞানিত গবেষণা তাড়াহুড়া করিয়া করিবার বিষয় নহে ; বরং তাহা সুচিন্তিত অনুসন্ধান। যেহেতু ইহার উদ্দেশ্য প্রচলিত জ্ঞানকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা ও প্রচলিত জ্ঞানের সহিত নূতন জ্ঞানের সংযোজন তাই অবশ্যই গবেষককে প্রয়োজনীয় পড়াশোনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত জ্ঞানের সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

গবেষণার জন্য পাঠের বিষয়ে কিছু কৌশল অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। যেমন পাঠ করা ও সাথে সাথে সেই বিষয়ে চিন্তা করা। উচ্চমানের পাঠের যোগ্যতাও অর্জন করা আবশ্যক– যাহা একদিনে অর্জন করা সম্ভব নহে। এই যোগ্যতার মধ্যে রহিয়াছে যাহা পাঠ করা হইতেছে তাহা বুঝা, ইহাই তাহাকে গবেষণার বিষয় সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে সাহায্য করিবে। এই পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলি হইল পর্যবেক্ষণযোগ্যতা, কল্পনাশক্তি, স্মৃতিপূর্ণ বিশ্লেষণ ও ধারাবাহিক মনোযোগ। এই দক্ষতা অর্জনের জন্য গবেষকের চেষ্টা থাকিতে হইবে। এইজন্য এমনকি প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের প্রয়োজন। এই বিষয়ে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হইল যাহা নূতন গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে লাগিবে :

১। শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক বইপত্র পড়ুন। সম্পূর্ণ বই-প্রবন্ধ বা তাহার যে সমস্ত অধ্যায় প্রয়োজনীয় তাহাই পড়ুন।

২। বুঝিয়া পাঠ করুন। গবেষণার পাঠের অর্থ জ্ঞান অর্জন। তাই অবশ্যই চেষ্টা করিতে হইবে লেখক কোন্ দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টিকে দেখিয়াছেন এবং কি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা অনুধাবন।

৩। সময়মতো পাঠ করুন। গবেষণার-পাঠের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা প্রয়োজন এবং এই-সময়ের মধ্যেই তাহা শেষ করা উচিত নতুবা এই-পাঠ কখনো শেষ হইবে না এবং গবেষণাও শুরু হইবে না।

৪। নিয়মিত অথচ প্রয়োজনীয় অবকাশ দিয়া পাঠ করা। যতটুকু সময় পড়িলে মনোযোগ থাকে ততটুকু-ই পড়া উচিত। নিজেকে অধিক চাপের মধ্যে রাখিয়া পাঠ করিলে তাহা মনে থাকে না। ক্লান্তিকর পড়াশোনা বড় কাজে আসে না। তাই পড়াশোনা করিয়া কিছু বিশ্রাম লওয়া আবশ্যক এবং যে বিষয়ে পড়াশোনা করা হইল ঐ বিষয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করা দরকার। বস্তুত যতটা সময় পাঠে ব্যয় করা হয় তাহার অধিক সময় ঐবিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য ব্যয় করিলে সেই পাঠ অধিক ফলপ্রসূ হয়।

বই-পত্র পর্যালোচনায় বিবেচ্য বিষয়

গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক বই, প্রবন্ধ ইত্যাদির পর্যালোচনায় গবেষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন :

১। গবেষণার বিষয়টির পরিধি, ব্যবহৃত অনুমান ও চলকসমূহ কি ছিল;

২। গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট এলাকা ও সমগ্রক, অর্থাৎ কোনো এলাকার, শহর, গ্রাম বা বস্তির, উপর গবেষণা করা হইয়াছে এবং কোনো জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা করা হইয়াছে;

৩। নমুনাভিত্তিক গবেষণা হইলে নমুনায়নের কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা হইয়াছে;

৪। কেসস্টাডি হইলে কোন কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কেস নির্বাচন করা হইয়াছে এবং কেন;

৫। তথ্য সংগ্রহের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হইয়াছে এবং কেন;

৬। তথ্য কিভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, সংখ্যাতত্ত্বিক বা গুণাত্মক, এবং কেন;

৭। গবেষণার সীমাবদ্ধতা বা ভুল-ত্রুটি যাহা সহজেই বোধগম্য বা যাহা গবেষক স্বীকার করিয়াছেন;

৮। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কি কি সুপারিশ করা হইয়াছে। কোনো নূতন গবেষণার সুপারিশ হইতে গবেষক নিজ বিষয় নির্বাচনে নির্দেশনা লাভ করিতে পারেন।

গবেষণার এই পর্যালোচনা করিবার জন্য কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নাই। গবেষকের আগ্রহ, গবেষণার বিষয় ও গবেষণার সার্বিক অবস্থার উপরই এই পর্যালোচনা নির্ভরশীল, তবে এই পর্যালোচনা প্রতি গবেষণারই এক অপরিহার্য অঙ্গ। গবেষণা প্রতিবেদন একটি নির্দিষ্ট অধ্যায় হিসাবে ইহা সংযোজিত হয়। ইহা প্রতিবেদনের মূল খণ্ডে সংযুক্ত হইতে পারে বা পরিশিষ্টে সংযোজিত হইতে পারে। পর্যালোচনা অবশ্যকরণীয় বিষয় কিন্তু এই পর্যালোচনা গবেষক তাহার প্রতিবেদনে কিভাবে ব্যবহার করিবেন তাহা তাহার গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় গবেষক গবেষণার ভূমিকায় বা পদ্ধতি অধ্যায়ে এই সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য সংযোজন করিতে পারেন। গবেষণার জন্য এই পর্যালোচনা কত ব্যাপক, কত গভীর হইবে তাহা সাধারণত কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন– উক্ত বিষয়ে প্রচালিত জ্ঞান বা তথ্য; গবেষণার পরিধি; প্রাপ্ত সময় ও আনুসঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত গবেষণায় (thesis) এই পর্যালোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের এই পর্যালোচনা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও সচেতনতার প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত পরিধির বা সময়ে পরিচালিত গবেষণায় এই পর্যালোচনার বিশেষ সুযোগ থাকে না, তাই সেক্ষেত্রে গবেষকের উক্ত বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রবন্ধাদির মূল-বক্তব্য বা ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লওয়া কর্তব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
গবেষণা নক্‌শা
RESEARCH DESIGN

গবেষণার জন্য বিষয় নির্ধারণ শেষ হইলে, যখন কোন্ ধরনের তথ্যের প্রয়োজন তাহা অনুমান করা যায়, তখনই গবেষক গবেষণা নক্‌শা প্রস্তুতের কাজে হাত দেন। গবেষণা নক্‌শা গবেষণার পরিকল্পনা ব্যতীত কিছুই নহে। ইহা গবেষককে প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে গবেষণা পরিচালনা করিবার একটি কর্মসূচি বা পরিকল্পনা। গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ও যথাযথ পদ্ধতির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণের ব্যবস্থাকেই গবেষণা নক্‌শা বলা হয়।

প্রতিটি গবেষণার নিজস্ব উদ্দেশ্য থাকে। গবেষণার উদ্দেশ্যের উপর গবেষণা নক্‌শা র প্রকৃতি নির্ভরশীল। গবেষণার উদ্দেশ্যের ভিন্নতার দরুন একটি গবেষণা-নক্‌শা হইতে অন্য গবেষণা-নক্‌শায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গবেষণা যে-উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হোক না কেন, গবেষণাকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করিতে হইলে গবেষককে অবশ্যই গবেষণা-নক্‌শা প্রস্তুত করিতে হইবে। গবেষণা-নক্‌শায় থাকিবে গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য গবেষক কিভাবে অগ্রসর হইবেন, কোনো পর্যায়ে কি কাজ করিবেন–তাহার বিবরণ। গবেষণার জন্য প্রাপ্ত অর্থ, সময় ও শ্রমকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিবার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিরূপণের জন্য গবেষণা-নক্‌শা।

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের পূর্বেই গবেষক কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করিবেন, সেই তথ্য অনুমান নিরীক্ষার প্রয়োজনে কিভাবে বিশ্লেষণ করিবেন, তাহার পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন। সার্থক গবেষণা একটি সুষ্ঠু গবেষণা-নক্‌শার উপর নির্ভরশীল। গবেষণা-নক্‌শা গবেষণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। গবেষণা-নক্‌শা ব্যতীত গবেষণা করা অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইবার সমতুল্য। গবেষণার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাই গবেষককে সুচিন্তিত-ভাবে ও যুক্তিপূর্ণভাবে গবেষণার নক্‌শা প্রস্তুত করিতে হয়। গবেষক গবেষণা-নক্‌শা অনুযায়ী তাহার কার্যে অগ্রসর হন ও গবেষণা-কার্যকে পরিচালিত করেন।

গবেষণা-নক্‌শা অনমনীয় বা অপরিবর্তনযোগ্য কিছু নহে। বরঞ্চ নমনীয়তা এই নক্‌শার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গবেষণার জন্য প্রাথমিকভাবে যে নক্‌শা প্রস্তুত করা হয়, কার্যক্ষেত্রে অনেক সময়ই তাহাতে কিছু কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাই গবেষণার অগ্রগতির সাথে সাথে বাস্তবতার আলোকে গবেষণা-নক্‌শারও কিছু কিছু রদবদল করা যাইতে পারে।

১। **গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে ভূমিকা প্রদান (introduction to research problem)** : গবেষণার সমস্যা সম্পর্কে সাধারণভাবে একটি বিবরণ দিতে হইবে। গবেষক যে-বিষয়ে গবেষণা করিতে চাহিতেছেন, তাহা কি, কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, উহার সমাধান কি কারণে বাঞ্ছনীয় ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করিতে হইবে।

২। **প্রত্যয়সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞা দান** (Working definition of the concepts) : গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা দান করিতে হইবে। প্রত্যয়গুলি সেই গবেষণায় কি অর্থে ব্যবহার করা হইবে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হইবে। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞা দান বিশেষ প্রয়োজন। একটি প্রত্যয় বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যায়। একটি গবেষণায় একটি প্রত্যয়কে গবেষক কোনো অর্থে ব্যবহার করিবেন এবং উহার পরিধি কতদূর ব্যাপ্ত, তাহা এই সংজ্ঞা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন– বাংলাদেশের দুস্থ শিশুদের উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করা হইতেছে। এই গবেষণায় 'দুস্থ একটি প্রত্যয়, 'শিশু' একটি প্রত্যয়। এই গবেষণায় দুস্থ প্রত্যয়টি দ্বারা কি বুঝানো হইতেছে? 'শিশু' বলিতেই বা কাহাদের বুঝানো হইতেছে? সাধারণ অর্থে দুস্থ শিশু বলিতে এতিম, দরিদ্র, পরিত্যক্ত, পঙ্গু, অসুস্থ, আশ্রয়হীন ইত্যাদি অনেক ধরনের শিশুকেই বুঝানো হয়। একটি গবেষণায় এই সমস্ত ধরনের শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করা নাও হইতে পারে। শুধুমাত্র পরিত্যক্ত শিশুকেও 'দুস্থ' শিশু বলা যাইতে পারে। তাই একটি গবেষণায় 'দুস্থ' শিশু, প্রত্যয়টি ঠিক কোনো অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার ব্যাখ্যা দিতে হইবে। তেমনি, 'শিশু' বলিতে কোনো বয়সের শিশুকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে। গবেষণায় কোনো বিশেষ বৈজ্ঞানিক বা 'টেকনিক্যাল' শব্দ ব্যবহৃত হইলে তাহারও সংজ্ঞা দিতে হইবে।

৩। **অনুমান গঠন (Formulation of hypothesis)** : গবেষণা যদি কোনো অনুমান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। আনুমান বিভিন্ন উৎস হইতে গঠিত হইতে পারে। ইহা শুধুমাত্র অনুসন্ধিৎসা হইতে উদ্ভূত পারে। কোনো তত্ত্ব হইতে অবরোহ প্রণালির সাহায্যে অনুমান গঠিত হইতে পারে অথবা পূর্ববর্তী কোনো গবেষণার ফলাফল নূতন অনুমানের জন্ম দিতে পারে। গবেষণা জন্য অত্যন্ত সচেতনতার সহিত অনুমান গঠন করিতে হয় এবং তাহা গবেষণা নক্সায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হয়। গবেষণা যদি কোনো অনুমান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে গবেষণার মাধ্যমে গবেষক বিশেষভাবে কোন্ কোন্ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতেছেন তাহা বিশদভাবে উল্লেখ করিবেন।

৪। **গবেষণার উদ্দেশ্য (Research objective)** : গবেষণা বিশেষ কি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইবে তাহা গবেষণা-নক্শায় উল্লেখ করিতে হইবে। গবেষণার প্রধান বা মুখ্য উদ্দেশ্য (broad objective) কি তাহা প্রথমে উল্লেখ করিতে হইবে। এই মুখ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ (specific objective) সহজ সরল ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। যেমন–

একটি গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহার (knowledge attitude and practice) সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। এই প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি হইতে পারে, যেমন–

(ক) শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত (demographic) বিষয়াদি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করা;

(খ) শ্রমিকদের পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত জ্ঞান, জ্ঞানের উৎস, জ্ঞানের পরিধি ইত্যাদি জানা;

(গ) শ্রমিকদের পরিবার পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি (attitude) জানিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের—

(১) পরিবার পরিকল্পনার সম্পর্কে ধারণা,

(২) পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা,

(৩) পরিবার সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব,

(৪) ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পরিবার পরিকল্পনার উপর ইহার প্রভাব, ইত্যাদি জানা;

(ঘ) শ্রমিকদের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ ও ব্যবহার সম্পর্কে জানিবার উদ্দেশ্যে তাহারা–

(১) কি কি পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছে,

(২) ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া, সুফল, অসুবিধা ইত্যাদি জানা এবং অসুবিধা দূরীকরণে ব্যবহারকারীর মতামত গ্রহণ করা।

৫। গবেষণার যৌক্তিকতা (rationale of the study) : গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এইখানে আলোকপাত করিতে হইবে। গবেষণালব্ধ জ্ঞান জ্ঞানের বিস্তারের সহায়তা করিবে, অথবা বাস্তবক্ষেত্রে কোনো সমস্যা সমাধানে কাজে লাগিবে কিংবা কোনো উন্নয়ন কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণে ও বাস্তবায়নের সহায়তা করিবে তাহা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। কোনো কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বে সাম্ভব্যতা নিরূপণের উদ্দেশ্যেও গবেষণাকার্যে পরিচালিত হয়। গবেষক যুক্তি সহকারে তাহার গবেষণার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিবেন।

৬। তথ্যের উৎস (sources of data) : গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য কোনো উৎস হইতে পাওয়া যাইবে তাহার বর্ণনা গবেষণা নক্শায় থাকিবে। তথ্য বাস্তবক্ষেত্র হইতে সরাসরিভাবে (primary source) অথবা বই-পত্র, নথি, দলিল প্রভৃতি মাধ্যমিক (secondary source) উৎস হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। একটি গবেষণায় উভয় উৎস হইতেও তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

৭। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (method of data collection) : বিভিন্ন পদ্ধতিতে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যেমন– সাক্ষাৎকার, প্রশ্নপত্র, পর্যবেক্ষণ, কেস-স্টাডি, ইত্যাদি। কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হইবে এবং কেন সেই পদ্ধতিটি

নির্বাচন করা হইব তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। একই সঙ্গে কয়েকটি পদ্ধতিও একটি গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতির সাহায্যে কি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হইবে তাহা পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৮। তথ্য-বিশ্ব বা সমগ্রক (universe or population of the study) : যে তথ্য-বিশ্ব বা সমগ্রক হইতে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হইবে গবেষণা-নক্‌শায় তাহার বিস্তারিত বর্ণনা থাকিবে। সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি 'ব্যক্তি' বা 'বিষয়' অর্থাৎ একক (unit) হইতে তথ্য সংগ্রহ করা যাইবে, কিংবা উহা হইতে নমুনা চয়ন করিয়া তথ্য সংগ্রহ হইবে তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে।

গবেষণা যদি নমুনাভিত্তি (sample) হয় তাহা হইলে নমুনায়ন পদ্ধতি (method of sampling) নমুনার আকার (size of sample) ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইবে। উক্ত নমুনায়ন পদ্ধতি কি বিশেষ কারণে গৃহীত হইয়াছে এবং নমুনার বিশেষ আকার সম্পর্কে যুক্তি প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে রেখা-চিত্রের (diagram) সাহায্যে নমুনায়নের বিবরণ দিতে হইবে।

৯। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও সঠিকতা (reliability and validity of data) : গবেষণার জন্য সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মূলত সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের উপরই গবেষণার গুরুত্ব নির্ভরশীল। তাই গবেষককে প্রথম হইতেই সঠিক তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সচেতন থাকিতে হয়। গবেষণার প্রত্যয়সমূহের ব্যাখ্যা প্রদান, সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ তথ্য সংগ্রাহক নিয়োগ ও তাহাদের প্রশিক্ষণ দান, প্রশ্নপত্র ও সিডিউলের প্রাক-নিরীক্ষাকরণ (pre-testing), তথ্য সংগ্রহকালে তত্ত্বাবধায়ন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গবেষক সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিতকরণের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন তাহারও বিবরণ থাকিবে।

১০। তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ (data processing and analysis) : সংগৃহীত তথ্যের সুষ্ঠু বিচার-বিশ্লেষণের উপর গবেষণার ফলাফল নির্ভর করে। তথ্য কি পদ্ধতিতে এবং কোনো দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষণ করা হইবে এবং পরিসংখ্যানের কোন পদ্ধতি এই বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত করা হইবে তাহার বিবরণ গবেষণা-নক্‌শায় থাকিবে। সারণি (table) রেখা-চিত্র (graph, diagram), ইত্যাদি কি পদ্ধতিতে তথ্য উপস্থাপন করা হইবে তাহারও বিবরণ দিতে হইবে। এক কথায়, তথ্য বিশ্লেষণ পরিকল্পনা (data analysis plan) দিতে হইবে।

১১। সময়সূচি (time schedule) : গবেষণার একটি সময়সূচি গবেষণা নক্‌শার অন্তর্ভুক্ত হইবে। একটি গবেষণার কতদিন সময় লাগিবে এবং নির্ধারিত সেই সময় গবেষক কোন্ কাজে কিভাবে ব্যবহার করিবেন তাহা এই সময়সূচিতে উল্লেখিত হইবে। গবেষণার নক্‌শা প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, তথ্য বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন লেখন ইত্যাদি

প্রতিটি পর্যায়ে কতদিন সময় লাগিবে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। সময়সূচি গবেষককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গবেষণা কার্য সমাধা করিতে বিশেষ সহায়তা করে।

১২। বাজেট (budget) : যে-কোনো গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথায় হইতে পাওয়া যাইবে এবং উক্ত অর্থ কোনো খাতে কিভাবে ব্যয় হইবে গবেষণা-নকশায় তাহার বিশদ বিবরণ থাকিবে। সুষ্ঠু বাজেট নির্ধারিত ও সীমিত অর্থের দ্বারা গবেষণা সম্পাদন সাহায্য করে। পূর্বেই বাজেট করিয়া আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুযায়ী গবেষণা পরিচালিত না হইলে অর্থ অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে। ফলে শেষ পর্যন্ত অর্থের অভাবে গবেষণার কাজ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে অথবা গবেষণা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইতে পারে। বাজেট গবেষণা-নকশার একটি অপরিহার্য অংশ।

১৩। কর্মচারী (personnel) : গবেষণার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে কিরূপ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি আবশ্যক সেই-বিষয়েও পূর্বাহ্নে চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। কতজন গবেষক, তথ্য সংগ্রহকারী, ফলবিন্যাসকারী, তত্ত্বাবধায়ক, পরিসংখ্যানবিদ ইত্যাদি আবশ্যক তাহার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

১৪। গ্রন্থপুঞ্জি বা তথ্য নির্দেশিকা (bibliography) : গবেষণার বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বই, গবেষণা, প্রবন্ধ ইত্যাদি যাহা গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হইবে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা গবেষণা-নক্শার একটি অঙ্গ। এই তালিকাকে গ্রন্থপঞ্জি বলে এবং ইহা সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

গবেষণা-নক্শার প্রকারভেদ

সামাজিক গবেষণায় উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি গবেষণা পদ্ধতির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। গবেষণা নক্শা যেহেতু গবেষণার পরিকল্পনা, তাই গবেষণায় ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতেই যেকোনো গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। গবেষণা নক্শা প্রণয়নকালে গবেষককে প্রথমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে যে তিনি কি পদ্ধতিতে গবেষণাটি পরিচালনা করিতে চাহেন এবং সেই পদ্ধতির গবেষণার জন্য অবশ্যকীয় বিষয়াবলির উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়া গবেষণা নক্শা প্রণয়ন করিবেন। এইভাবে গবেষক জরিপ পদ্ধতিতে গবেষণা করিবার জন্য যে-নক্শা প্রণয়ন করিবেন তাহা জরিপ নক্শা, পরীক্ষণ পদ্ধতিতে গবেষণা করিলে তাহা পরীক্ষণ নক্শা, ইত্যাদির নামে অবহিত হইবে। এই কারণে গবেষণা নক্শা প্রণয়নে গবেষককে প্রতটি গবেষণার বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। যেমন–

জরিপ নক্শা

সামাজিক জরিপ গবেষণার এমন একটি পদ্ধতি যাহার মাধ্যমে একটি বিস্তৃত এলাকার বা বৃহত্তর সমগ্রকের উপর তথ্য সংগ্রহের জন্য পরিচালনা করা হয়। জরিপ কার্য মূলত

পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন বা মূল্যায়নের জন্য করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো সামাজিক অবস্থা বা সমস্যার সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে উক্ত অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করিবার জন্য জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপ মূলত বর্ণনা-মূলক অনুসন্ধান পদ্ধতি। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে :

১। জরিপ বিস্তৃত এলাকা বা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উপর পরিচালনা করা হয় বলিয়া জরিপ-গবেষণায় নমুনায়ন পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই গবেষণার উদ্দেশ্য ও সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কি পদ্ধতির নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার যুক্তিযুক্ত তাহা নক্শায় উল্লেখ করিতে হইবে। নমুনা সমগ্রকে বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করিবে বিধায় উহা প্রতিনিধিত্বকারী হইবে এমন পরিমাণ নমুনা নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। বস্তুত জরিপ-নক্শায় নমুনায়ন পরিকল্পনা বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

২। জরিপ-নক্শায় 'অনুমান' (hypothisis) গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক নয়। "অনুমান" ছাড়াও নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর জানিবার জন্য গবেষক জরিপ করিতে পারে। যেমন– পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য (Base-line date) প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুমানের আবশ্যকতা নেই।

৩। জরিপ যেহেতু একটি বিস্তৃত পরিধির, তাই ইহার তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে যাহাতে তথ্য নির্ভরশীল ও সঠিক হয়।

৪। জরিপ তথ্য সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হইলে, সাক্ষাৎ গ্রহণকারীদের অবশ্যই গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রশ্ন ও সম্ভাব্য উত্তর ও তাহা লিপিবদ্ধকরণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান অপরিহার্য।

প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হইলে, প্রশ্নপত্রের প্রশ্নসমূহ সবার জন্য সমভাবে বোধগম্য কিনা তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৫। সাক্ষাৎকার অনুসূচি ও প্রশ্নপত্রসমূহ প্রাক্‌ত-নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিয়া প্রয়োজন মতো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা বাঞ্ছনীয়।

পরীক্ষণ-নক্শা

দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণের জন্য সামাজিক গবেষণায় পরীক্ষণ পদ্ধতি মূলত ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নিরূপণই পরীক্ষণের মূখ্য উদ্দেশ্য। এই জন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে স্বাধীন চলকের অধীন চলকের উপর কতখানি প্রভাব তাহা নিরূপণ করিবার প্রচেষ্টা এ পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়। সামাজিক গবেষণায় পরীক্ষণ পদ্ধতির সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার নানাবিধ কারণে অসুবিধাজনক। তাই পরীক্ষণ নক্শা প্রণয়নে পরীক্ষণের বৈশিষ্ট্যকে সম্মুখে রাখা অপরিহার্য। পরীক্ষণ-নক্শায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হয় :

১। সমাজ জীবন গতিশীল ও সদা পরিবর্তনীয়। ল্যাবরেটরির ন্যায়, সমাজের কোনো এলাকাবাসী বা দলকে নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া উহার উপর কোনো চলকের কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় কঠিন। তাই পরীক্ষণ নক্‌শায় অবশ্যই কোনো জনগোষ্ঠী বা দলকে পরীক্ষণ দল ও কোনো জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রিত দল হিসাবে বিবেচনা করা হবে তাহা সুচিন্তিতভাবে পরীক্ষণ-নক্‌শায় উল্লেখ করতে হইবে। কি কি কারণে এই দল দুইটিকে নিয়ন্ত্রিত দল ও পরীক্ষণ দল হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

২। পরীক্ষণের মাধ্যমে যেহেতু কার্য-কারণ সম্পর্ক নিরূপণ করা হয় তাই কোনো চলককে গবেষক স্বাধীন চলক ও কোনো চলককে অধীন চলক হিসাবে গণ্য করিতেছেন তাহা যুক্তি সহকারে উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। পরীক্ষণ নক্‌শায় অবশ্যই "অনুমান" গঠন করিতে হইবে। এই অনুমান যে বিষয়ে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ধারণ করিবার চেষ্টা, উহার ভিত্তিতে গঠিত হইবে। অনুমান অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হইতে হইবে।

৪। পরীক্ষণের জন্য পরীক্ষণ দল ও নিয়ন্ত্রিত দল হইতে নমুনায়ন পদ্ধতিতে তথ্য সরবরাহকারী নির্বাচন করিবার প্রয়োজন দেখা দিলে নমুনায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। তথ্য বিশ্লেষের বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে উপযুক্ত নমুনায়ন পদ্ধতি নির্বাচন করিয়া প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যক নমুনা গবেষণার জন্য নির্বাচন করিতে হইবে।

৫। পরীক্ষণ-নক্‌শায় গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞা অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে।

৬। পরীক্ষণ-দল ও নিয়ন্ত্রিত দল হইতে প্রাপ্ত তথ্য কিভাবে বিশ্লেষণ পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহার দ্বারা কার্য-কারণ সম্পর্ক নিরূপন সুনির্দিষ্টভাবে করা সম্ভব হয়, ফলে ফলাফল অধিক নির্ভরযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৭। পরীক্ষণ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য কি পদ্ধতি ব্যবহার করা হইবে তাহাও সুচিন্তিতভাবে নক্‌শায় উল্লেখ করিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে একাধিক তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করিবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ তথ্য সংগ্রহের জন্য কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করা হইবে তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

কেস স্টাডি-নক্‌শা

কেস-স্টাডি পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী বা এলাকার উপর গবেষণা করা হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে একটি দল বা এলাকার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গভীরভাবে তথ্যানুসন্ধান করা হয় এবং উহার ফলাফল একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অন্যান্য দল বা এলাকার উপর প্রযোজ্য–এইরূপ ধারণা করা হয়। কোনো বিষয়ের বিভিন্ন দিকে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিবার পদ্ধতি হিসাবে এ-পদ্ধতি সামাজিক গবেষণায় বিশেষ অবদান রাখে। জরিপ বা অন্য পদ্ধতির মাধ্যমে যেসব তথ্যানুসন্ধান সম্ভব হয়

না, তাহা কেসস্টাডি পদ্ধতির মাধ্যমে সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে গবেষণা করিতে হইলে গবেষণা নক্‌শায় বিশেষভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হয় :

১। নির্দিষ্ট একটি বিষয়, দল, গোষ্টি বা এলাকাবাসীর উপর এ-পদ্ধতি সীমিত থাকে বলিয়া ঐ বিষয়, দল বা গোষ্টি যাহা 'কেস' হিসাবে গৃহীত হইবে, উহা নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। 'কেস' অবশ্যই প্রতিনিধিত্বকারী হইবে, অন্যথায় গবেষণার ফলাফল সাধারণীকরণ করা সম্ভব হইবে না ফলে গবেষণার মান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিবে।

২। কেস নির্বাচন বস্তুনিষ্ঠভাবে করিতে হইবে নতুবা তাহা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া সম্ভব, গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ও নিরপেক্ষভাবে 'কেস' নির্বাচন করিয়া উহা কোন্ কোন্ দৃষ্টিকোণ হইতে প্রতিনিধিত্বকারী বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে তাহা গবেষণা নক্‌শায় উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। কেস স্টাডিতে তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার, প্রশ্নপত্র বা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনবোধে একাধিক পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। গবেষণা-নক্‌শায় অবশ্যই তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির যুক্তিসহ বর্ণনা থাকিতে হইবে। মাধ্যমিক তথ্য ব্যবহার করিতে হইলে তাহার উৎস ও আবশ্যকতা উল্লেখ করিতে হইবে।

৪। কেস-স্টাডির মাধ্যমে প্রায়শই বেশ কিছু গুণাত্মক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এইসব গুণাত্মক তথ্য বিশ্লেষণের জন্য গবেষক পূর্বাহ্নেই চিন্তা-ভাবনা করিবেন এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য বিশ্লেষণের পরিকল্পনার সাথে গুণাত্মক তথ্যের বিশ্লেষণ পরিকল্পনাও নির্ধারণ করিবেন। এ ক্ষেত্রে কি পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করিবেন তাহাও উল্লেখ করিবেন।

৫। কেস-স্টাডি গবেষণায় 'অনুমান' গঠন অপরিহার্য নয়। গবেষক প্রয়োজনবোধে অনুমান গঠন করিয়া তাহা যাচাই করিতে পারেন আবার অনুমান ছাড়াই একটি বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গভীরভাবে জানিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

৬। কেস-স্টাডি নক্‌শাও অন্যান্য সব পদ্ধতির গবেষণার নক্‌শার অনুরূপ' চলক সমূহের বর্ণনা ও প্রত্যয়সমূহের কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদান অপরিহার্য।

এ্যাথনো গ্রাফি-নক্‌শা

এই পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ ও তাহাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা করা হয়। বিশেষত আদিবাসী উপ-জাতিদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া গবেষকগণ একদিকে যেমন উক্ত আদিবাসী বা উপজাতিদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন তেমনি ঐ জ্ঞান হইতে বর্তমান মানব জাতি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও বিবর্তনের উপর আলোকপাত করেন। যদিও এ-পদ্ধতি নৃ-বিজ্ঞানেই বিশেষভাবে ব্যবহৃত, সামাজিক গবেষকগণ নানা আচার আচরণ, মূল্যবোধ, প্রথা, কুসংস্কার সমাজের ইত্যাদির ব্যাখ্যা লাভের জন্য সচেষ্ট হন। মানুষ প্রতিদিন তাহাদের জীবনযাপন ও কর্মকাণ্ডে নানা ধরনের পদ্ধতি

প্রক্রিয়ার ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তাহারা নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে একটি সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলে এবং তাহা অনুসরণ করে। এ-পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের ঐ সমস্ত বিষয়াবলি অনুসন্ধান করা হয়। এ-পদ্ধতি সামাজিক গবেষণার অন্যান্য পদ্ধতি হইতে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। এই পদ্ধতিতে গবেষণা পরিচালনা করিতে হইলে গবেষণা নক্শায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে–

১। এ-পদ্ধতি যেহেতু সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করে, তাই সংস্কৃতির আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গবেষণা নক্শায় বর্ণনা থাকা বাঞ্ছনীয়। গবেষক উক্ত সংস্কৃতি গবেষণার মাধ্যমে কি কি বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করিবেন তাহা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন। কারণ একটি জাতির উপজাতি বা সংস্কৃতির অনেক দিক রহিয়াছে। তাই গবেষক কি উদ্দেশ্যে কোন কোন বিষয় গবেষণার অর্ন্তভুক্ত করিবেন তাহার উল্লেখ গবেষণা নক্শায় থাকা আবশ্যক। নতুবা সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে গবেষক দিকভ্রষ্ট হইয়া পড়িবেন।

২। গবেষক জনগণের দৃষ্টিকোণ হইতে উহাদের আচার-আচরণ ও সংস্কৃতিতে অনুসন্ধানে প্রয়াস পান। সুতরাং ঐ জনগোষ্ঠির দৃষ্টিকোণ বা তাহাদের সহিত একাত্ম হইবার জন্য কি কৌশল অবলম্বন করা উচিত বা করিবেন তাহাও গবেষণা নক্শায় উল্লেখ থাকিবে।

৩। এ্যাথনো পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ। তাই গবেষক কতদিন এবং কিভাবে একটি জাতি, উপজাতি বা দলের সাথে অবস্থান করিবেন, তাহা গবেষণা নক্শায় উল্লেখ করিবেন।

৪। গবেষক তাহার গবেষণার তথ্য সংগ্রহ সুনির্দিষ্ট ও সুসংগঠিত করিবার জন্য কি ব্যবস্থা লইবেন তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে। তিনি ডায়েরি কিভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। যখন যাহা ঘটিল বা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গেলেই চলিবে না; কারণ তাহাতে পরে তথ্য বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ দুরূহ হইয়া পড়ে। তাই তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বিষয়াবলীর তালিকা প্রনয়ণ ও বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য আলাদা আলাদা করিয়া সংগ্রহের ব্যাপারে প্রথমেই সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। এ-জন্য প্রয়োজনীয় চেক্-লিস্ট, চার্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করতে হইবে।

৫। তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির অসংগঠিত সাক্ষাৎকার লইতে হইলে পূর্বেই একটি সাক্ষাৎকার নির্দেশিকা প্রস্তুতের চিন্তা করিতে হইবে। তাহাতে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রদত্ত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য লাভ করা সম্ভব হইবে।

৬। এ্যাথনো গবেষণা নক্শায় পর্যবেক্ষণ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর ন্যস্ত হইবে তাহার উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

গবেষণা প্রতিবেদন

RESEARCH REPORT

দৈনন্দিন জীবনে নানা প্রয়োজনে নানা প্রকারের প্রতিবেদন লেখা হয়। একটি খুনের ঘটনা তদন্ত করিয়া পুলিশ অফিসারকে তদন্তের প্রতিবেদন লিখিতে হয়। একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করিয়া অফিসের কর্মকর্তাকে তাহার উপর প্রতিবেদন লিখিয়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হয়। একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সে সম্বন্ধে পাঠকদের জ্ঞাত করিবার জন্য সাংবাদিককে উহার উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য এবং ভিন্ন ব্যক্তির জন্য প্রতিবেদন লেখা হয়। প্রতিবেদন যত প্রকারের হউক না কেন, ইহার কাজ মূলত একটাই– তথ্য সরবরাহ করা। অর্থাৎ সংগৃহীত তথ্য ও লেখকের ধ্যানধারণাকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা। ইহা জনযোগাযোগের একটি মাধ্যম।

প্রতিনিয়তই নানা কারণে আমাদের প্রতিবেদন লিখিতে হয় বলিয়াই যে ইহা একটি অতি সাধারণ ব্যাপার তাহা নহে। বরং ইহার জন্য বিশেষ ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা আবশ্যক। একই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তি যদি উক্ত বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা করেন তবে লক্ষ করা যাইবে যে, কোনটি তথ্যনির্ভর আবার কোনটি হয়তো বা নহে। কোনটি পড়িতে বেশ আগ্রহ জাগে আর কোনটি বিরক্তকর। সুষ্ঠু প্রতিবেদন লেখন একটি আর্ট বিশেষ। একই ঘটনা লেখকের ভাষা, চিন্তাধারা ও মননশীলতার সংমিশ্রণে নূতনরূপে প্রতিবেদন প্রকাশ লাভ করে।

উদ্দেশ্যের উপর প্রতিবেদনের প্রকৃতি নির্ভরশীল। পুলিশ অফিসারের প্রতিবেদন, সাংবাদিকের প্রতিবেদন ও গবেষণা প্রতিবেদন–এই তিনটির উদ্দেশ্য যদিও পাঠকের নিকট কিছু তথ্য সরবরাহ করা, তথাপি ইহা সহজেই বোধগম্য যে, এই তিনটি প্রতিবেদন কখনোই এক প্রকার হইতে পারে না। প্রতিটি প্রতিবেদন উহাদের উদ্দেশ্যানুযায়ী আকৃতি ও প্রকৃতিতে ভিন্ন হইবে। প্রতিবেদনকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যেমন– (১) তথ্যবহুল প্রতিবেদন– ইহাতে তথ্যের বিশ্লেষণ, তাৎপর্য ব্যাখ্যা বা সুপারিশ নাও থাকিতে পারে; (২) গবেষণা প্রতিবেদন, ইহা সাধারণত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ্যের জন্য প্রস্তুত করা হয়। গবেষণার প্রতিবেদনই মূলত এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

গবেষণার প্রতিবেদন কি? ইহা গবেষণার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্যাবলির সংক্ষিপ্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণ, পাঠকের নিকট গবেষণার বিষয়বস্তু প্রাপ্য তথ্য ও উহার বিশ্লেষণ, তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং সামগ্রিক ফলাফল পৌছাইয়া দেওয়ার জন্যই গবেষণার প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। ইহা গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়া। সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পরই গবেষক প্রতিবেদন লেখায় মনোনিবেশ করেন। Goode and Hatt-এর মতে, গবেষণার প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হইল, যতদূর সম্ভব বিস্তারিতভাবে গবেষণার ফলাফল আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া এবং এমন সুসংঘবদ্ধভাবে তাহা প্রকাশ করা যাহাতে পাঠক তথ্যগুলিকে বুঝিতে পারে ও নিজেই গবেষণার ফলাফলের যথার্থতা নিরূপণ করিতে পারে।

লেখকের অবশ্যই তাহার প্রতিবেদনের পাঠক কে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। গবেষণার প্রতিবেদন সাধারণত সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ন্যায় সর্বশ্রেণির পাঠকের জন্য প্রণীত হয় না। যাহারা একটি গবেষণার বিষয়ে আগ্রহী বা সংশ্লিষ্ট তাহারাই সাধারণত প্রতিবেদন পাঠ করেন। প্রতিবেদন প্রণয়নে লেখককে তাই তাহার পাঠকের শিক্ষা, মানসগঠন, আগ্রহ ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন হইতে হয়। প্রতিবেদনের আকৃতি সম্বন্ধেও তাহাকে চিন্তা-ভাবনা করিতে হইবে।

প্রতিবেদন কিরূপ হইবে :

গবেষণার প্রতিবেদন কিরূপ হইবে তাহার ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম না থাকিলেও কিছু কিছু বিষয় লক্ষ রাখিতে হয়; যেমন–

১। প্রতিবেদন বাস্তবসম্মত হইতে হইবে। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া বাস্তবসম্মতভাবে ইহা প্রণয়ন করিতে হইবে।

২। ইহা সম্পূর্ণ হইতে হইবে। গবেষক লক্ষ রাখিবেন যে, গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী সমস্ত বিষয়ই ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কোনো কিছু যেন অনালোচিত না থাকিয়া যায়।

৩। ইহা যতদূর সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহার অর্থ এই নহে যে, প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে। ইহা প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি আলোচনা বা বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট বড় কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিবার মতো সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। পাঠকের আগ্রহ যাহাতে নষ্ট না হয়, সেই দিকে লক্ষ রাখিয়া প্রতিবেদন সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে।

৪। প্রতিবেদনের ভাষা সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও বোধগম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতিবেদনে পাঠকের শিক্ষা, আগ্রহ ইত্যাদি লক্ষ রাখিয়া শব্দাবলি ব্যবহার করিতে হয়। গবেষণা যদি শুধুমাত্র শিক্ষাবিদ বা সমাজবিজ্ঞানীদের, যাহারা বিভিন্ন টেকনিক্যাল শব্দাবলি বা গবেষণার প্রত্যয়গুলির সহিত পরিচিত, তাহাদের জন্য লেখা হয় সে ক্ষেত্রে প্রতিবেদনে টেকনিক্যাল শব্দাবলি ব্যবহার করা যায়। গবেষণা প্রতিবেদনে যদি নীতি ও পরিকল্পনা

প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য প্রণীত হয়, সে-ক্ষেত্রে তাহাদের বোধগম্য শব্দাবলি ব্যবহারের প্রতি যত্নবান হইতে হয়। সর্বদাই বক্তব্যকে সহজভাবে উপস্থাপন করিবার প্রচেষ্টা থাকিতে হইবে।

৫। গবেষককে বুদ্ধিগত দিক হইতে সৎ (Intellectually honest) হইতে হইবে। তিনি তাহার জানা মতে কোনো ভুল তথ্য বা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিবেন না এবং সত্যাশ্রয়ী হইবেন।

৬। প্রতিবেদনটি পঠনযোগ্য হইতে হইবে। ইহা এমনভাবে লিখিতে হইবে যাহাতে ইহা পড়িতে পাঠক আগ্রহবোধ করে। অন্যথায় প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা থাকিলেও তাহা আগ্রহের অভাবে পাঠকের অজানাই থাকিয়া যাইবে।

প্রতিবেদন লেখার কয়েকটি পর্যায়

১। গবেষককে প্রতিবেদন প্রস্তুতের প্রথম হইতেই গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হইতে হইবে। গবেষণার উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিবেদন লিখিলে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা দ্বারা প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য হারাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। তাই প্রতিবেদন লেখার প্রথম কাজই হইল গবেষণার উদ্দেশ্য ও পাঠকদের বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা অর্জন করা।

২। গবেষণার জন্য যে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা কিভাবে বিন্যস্ত করা হইবে সেই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। গবেষণা সমস্যার বিভিন্ন দিক থাকিতে পারে। তথ্য বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। এসমস্ত তথ্যকে গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রশ্ন ও অনুমান ইত্যাদির আলোকে কিভাবে সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাজানো হইবে, সেই বিষয়ে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। প্রতিবেদন লেখার অপর গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হইল গবেষণার বিষয়টি সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিয়া প্রতিবেদনের একটি out-line বা পরিলেখ প্রস্তুত করা। গবেষণা প্রতিবেদনে যে-বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে সে-গুলিকে পর পর সুশৃঙ্খলভাবে সাজাইয়া লওয়া এবং বিষয়গুলির শিরোনাম বা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপলব্ধি করা। যেকোনো প্রতিবেদন প্রস্তুতের পূর্বে অবশ্যই out-line তৈরি করা অবশ্যক, কারণ ইহা লেখকের চিন্তা-ধারাকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতে সাহায্য করে। উপরন্তু out-line টি লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়া প্রথমেই গবেষক প্রতিবেদনের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে বুঝিতে পারেন এবং কোন বিষয় বাদ পড়িয়া গেলে তাহা সংযোজিত করিতে পারেন। সমস্ত বিষয়গুলির মধ্যে পারম্পর্য রক্ষিত হইতেছে কিনা তাহাও অনুধাবন করিতে পারেন। সুচিন্তিতভাবে প্রস্তুত প্রতিবেদন পরিলেখ প্রতিবেদন লেখার কাজকে সহজ করিয়া তোলে।

৪। প্রতিবেদনের পরিলেখ তৈরি করিবার পর গবেষক ঐ পরিলেখ অনুযায়ী প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাহার প্রতিবেদন লিখতে আরম্ভ করিবেন। প্রথমে একটি খসড়া প্রতিবেদন দাঁড় করাইবেন। খসড়া প্রতিবেদনকে পরীক্ষা করিয়া ভুলটি বাহির করা, পরিবর্তন করা, পরিমার্জন করা, পুণর্গঠন করা, সর্বশেষে সম্পাদনা করা আবশ্যক। খসড়া প্রতিবেদনকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সম্পাদনার পর উহাকে পুনরায় গুছাইয়া লিখিতে হইবে। প্রতিবেদন একবার লিখিয়াই চূড়ান্ত করিয়া ফেলা যুক্তিযুক্ত নহে। বরং খসড়া প্রতিবেদন লইয়া যত বেশি চিন্তা-ভাবনা করা যায় ততই উহাকে আরো বেশি উন্নত, সুশৃঙ্খল ও সুন্দর করা সম্ভব। তাই তাড়াহুড়া না করিয়া ধীরস্থির চিত্তে সুচিন্তিতভাবে প্রতিবেদন তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। গবেষণার সমস্ত তথ্যকে প্রতিবেদনের মাধ্যমেই পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। তাই সুচিন্তিত ও সুশৃঙ্খলভাবে লিখিত প্রতিবেদনের উপর গবেষণার গুরুত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে।

প্রতিবেদনের গঠন কাঠামো (Format of the Report)

একটি গবেষণা প্রতিবেদনের তিনটি অংশ থাকে, ১। প্রাথমিক বিষয়াবলি, ২। মূলখণ্ড বা অংশ, ৩। গ্রন্থপঞ্জী ও পরিশিষ্ট। বৃহৎ কলেবরের গবেষণা প্রতিবেদনে এই এক একটি ভাগকে আবার কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করা হয়। আবার অতি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন একটি শিরোনাম পৃষ্ঠা ও মূল অংশ দ্বারা গঠিত হইতে পারে।

সাধারণত গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ নিম্নোক্ত গঠন কাঠামো অনুসরণ করা হয়। প্রয়োজনবোধে এই কাঠামোর কোন কোন অংশ বাদ দেওয়া যাইতে পারে। নিচে এই কাঠামোর বিভিন্ন অংশ দেওয়া হইল :

১। প্রাথমিক বিষয়াবলি : ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়–

ক) শিরোনামের পাতা

খ) ভূমিকা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ভূমিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, আবার পৃথকভাবেও দেওয়া যাইতে পারে।

গ) সূচিপত্র

ঘ) সারণী বা ছকের সূচি-পত্র (যদি থাকে)

ঙ) মানচিত্র, রেখাচিত্র, ছবি ইত্যাদির তালিকা-পত্র (যদি থাকে)

২। মূল অংশ : ইহাতে থাকিবে–

ক) সূচনা

খ) অর্ধ-শিরোনামের পৃষ্ঠা

গ) মূল বিষয়ের আলোচনা বা গবেষণার ফলাফলের উপস্থাপনা

৩। **প্রাসঙ্গিক বিষয়** : ইহাতে থাকিবে –

ক) পরিশিষ্ট

খ) গ্রন্থপঞ্জি

নিম্নে সংক্ষেপে এই বিষয়গুলি আলোচিত হইল :

১। প্রাথমিক বিষয়াবলি

ক) শিনোনামের পাতা : প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ শিরোনাম, প্রতিবেদনকারীর নাম, যে প্রতিষ্ঠানের আওতায় গবেষণা পরিচালিত হইয়াছে তাহার নাম এবং প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ, এই পৃষ্ঠায় সুন্দর ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। থিসিস বা মনোগ্রাফের প্রতিবেদন হইলে ইহার সহিত কোন কোর্সের প্রয়োজনে থিসিস বা মনোগ্রাফটি করা হইয়াছে তাহাও উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। প্রতিবেদনটি ইংরেজিতে টাইপ করা হইলে শিরোনাম সম্পূর্ণ Capital অক্ষরে টাইপ করাই উচিত।

খ) ভূমিকা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার : গবেষণার সহিত প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা যেমন, কেন গবেষক বিষয়টির উপরে গবেষণায় আগ্রহী হইলেন এবং প্রতিবেদন সম্পর্কে তাহার মন্তব্য ইত্যাদি ভূমিকার স্থান লাভ করে। বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নানাভাবে গবেষণা প্রক্রিয়ায় গবেষককে সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়া থাকে। সে-জন্য গবেষক সে-সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। এই কৃতজ্ঞতাস্বীকার ভূমিকার মধ্যেই দেওয়া হয়। একান্ত কোন কারণে যদি গবেষক ভূমিকা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ না করেন, তবে তিনি শুধু মাত্র 'কৃতজ্ঞতাস্বীকার' শিরোনামের অধীনে বিভিন্ন ব্যক্তি, গ্রন্থকার বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিবেন।

গ) সূচিপত্র : প্রতিবেদনে আলোচিত বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনাম এবং মূল আলোচিত বিষয়ের শিরোনামের তালিকা এবং কত পৃষ্ঠায় ঐ সমস্ত বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে তাহার নির্দেশ থাকে সূচিপত্রে। সূচিপত্রে উল্লেখিত শিরোনামের ও পৃষ্ঠা সংখ্যার সহিত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের শিরোনাম পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ মিল থাকা বাঞ্ছনীয়, নতুবা সূচী-পত্র অর্থহীন হইয়া পড়িবে।

ঘ) সারণি বা ছকের সূচিপত্র : গবেষণার তথ্য উপস্থাপনের একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হইল সারণী বা ছক (table)। একটি গবেষণা প্রতিবেদনে সাধারণত একাধিক সারণী সংযোজিত হয়। এই সমস্ত সারণি সহজে খুঁয়িা বাহির করিবার জন্য সারণির শিরোনাম ও পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ করিয়া একটি তালিকা-পত্র বা সুচী-পত্র দেওয়া হয়। সারণি ছাড়াও প্রতিবেদনে ব্যবহৃত মানচিত্র, রেখাচিত্র, ছবি ইত্যাদিরও তালিকা-পত্র বা সূচী-পত্র দেওয়া আবশ্যক।

২। প্রতিবেদনের মূল বিষয় বা গবেষণার ফলাফল

(ক) সূচনা (Introduction) : প্রতিবেদনে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনের পূর্বে গবেষক নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন :

(১) **গবেষণার পটভূমি :** কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে বা কি কারণে গবেষণার বিষয়টি নির্বাচন করা হইয়াছে।

(২) গবেষণার সমস্যার সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা।

(৩) গবেষণার উদ্দেশ্য।

(৪) গবেষণার প্রত্যয়, প্রশ্ন বা অনুমানসমূহ।

(৫) গবেষণা পরিচালনার যৌক্তিকতা।

(৬) গবেষণা পরিধি ও সীমাবদ্ধতা।

(৭) গবেষণার এককসমূহের বিস্তারিত বিবরণ।

(৮) গবেষণার ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহের বিবরণ।

যেমন, গবেষণায় ব্যবহৃত পর্যবেক্ষণের প্রকারভেদ এবং কোন অবস্থায়, পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছিল, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হইলে কি ধরনের অনুসূচি (Schedule) ব্যবহার করা হইয়াছে এবং সাক্ষাৎকার কিভাবে, কাহাদের দ্বারা গ্রহণ করা হইয়াছে, কেসষ্টাডী হইলে কি প্রকারের কেস (case) তথ্য সংগহের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং তাহার উৎস, উপস্থাপনার প্রকৃতি ইত্যাদি।

(৯) গবেষণায় নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হইলে 'নমুনায়ন নক্‌শার' বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইবে। অর্থাৎ সে-ক্ষেত্রে সমগ্রক বা তথ্য-বিশ্বের বর্ণনা, নমুনায়নের কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কোন যুক্তিতে, নমুনার পরিমাণ, নমুনা কতখানি প্রতিনিধিকারী তাহার বিবরণ, ত্রুটিসমূহ যাচাইয়ের ব্যবস্থা ইত্যাদির বিশদ বিবরণ দিতে হইবে।

(১০) গুণাত্মক তথ্যের বিশ্লেষণে ব্যবহৃত পরিমাপক পদ্ধতি (techniques of measurement)।

(১১) তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ও উপস্থাপনে গৃহীত ব্যবস্থা।

(১২) গবেষণার কাল বিশেষত তথ্য সংগ্রহের কাল।

(১৩) গবেষণার পরিচালনায় অসুবিধা অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহ, শ্রেণিবদ্ধকরণ বা বিশ্লেষণে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

(খ) গবেষণার ফলাফল (Findings of research) : গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি এই অংশে উপস্থাপিত হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গবেষণার বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। এই অংশে থাকিবে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে উপনীত

সিদ্ধান্তসমূহের বিবরণ, তথ্যের মধ্যে সম্ভাব্য সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে মতামত ও গবেষকের বিশেষ মন্তব্য এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুপারিশ।

গবেষণার ফলাফল উপস্থাপনে সারণী, রেখাচিত্র, ছবি, মানচিত্র ইত্যাদি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। প্রতিবেদনের এই অংশে তথ্য আলোচনার সাথে সাথেই ঐ সমস্ত সারণী, মানচিত্র, রেখাচিত্র সংযোজন করিয়া দিলে পাঠকের নিকট তথ্য ও তাহার বিভিন্ন দিক বুঝিতে সম্ভব হয়। তবে যদি বড় বড় সারণি, মানচিত্র বা অধিক রেখা-চিত্র ব্যবহার করা হয় তবে উহাকে মূল আলোচনার মধ্যে সংযোজন করিলে সুন্দর দেখায় না। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ঐগুলিকে পরিশিষ্টে সংযোজন করা কর্তব্য। তবে যে কোন তথ্যের আলোচনার স্থানে ঐ তথ্য সম্পর্কিত সারণি, রেখা-চিত্র পরিশিষ্টের কত পৃষ্ঠায় রহিয়াছে তাহা উল্লিখিত করিয়া দেওযা বাঞ্ছনীয়, যাহাতে পাঠক ইচ্ছা করিলেই সেই পৃষ্ঠায় উক্ত সারণী বা রেখাচিত্রটি দেখিতে পারেন।

গবেষণার ফলাফল সংক্রান্ত প্রতিবেদন দীর্ঘ হইলে, গবেষকের উচিত উহার একটি সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করিয়া প্রতিবেদনের শেষে সংযোজন করা। সময় স্বল্পতাহেতু অনেকেই গবেষণার দীর্ঘ প্রতিবেদন পড়িতে নাও পারেন। সেই ক্ষেত্রে এই সার-সংক্ষেপ তাহাকে বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা দিতে সক্ষম হইবে। সার-সংক্ষেপ পড়িয়া কোন বিষয়ে আগ্রহ দেখা দিলে তখন তিনি উক্ত বিষয়টি পড়িতে উৎসাহিত হইবেন। এছাড়া গবেষক প্রয়োজনবোধে প্রতি অধ্যায়ের একটি সার-সংক্ষেপ করিয়া উহা প্রতি অধ্যায়ের শেষে সংযুক্ত করিতে পারেন। তাহাতে একটি অধ্যায়ের সম্পর্কে পাঠক সহজে অবহিত হইতে পারেন।

৩। প্রাসঙ্গিক বিষয়

(ক) পরিশিষ্ট --- গবেষণার মূল প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই অথচ গবেষণার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন– গবেষণার অনুসূচি বা প্রশ্ন-পত্র, সারণি মানচিত্র, কোন আইন বা চুক্তি-পত্র ইত্যাদি।

(খ) গ্রন্থপুঞ্জি---গবেষণার কাজে ব্যবহৃত ও প্রাসঙ্গিক বই, প্রতিবেদন ইত্যাদির তালিকাও এই অংশে সংযোজিত হয়। এই বিষয় দুইটি সম্পর্কে পরের একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রতিবেদন লিখার সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় এখানে আলোচিত হইল :

টোকা (Taking notes)

গবেষণার প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য গবেষক তাহার মতামতের সমর্থনে বা অসমর্থনের জন্য বিভিন্ন লেখকের বক্তব্য, তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করেন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্র ও পত্রিকা হইতে তিনি প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ টুকিয়া রাখেন। কোন বিষয়ের

সংজ্ঞা ইত্যাদিও টুকিয়া রাখিতে হয় যাহা পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিবেদনে ব্যবহার করা যায়। এই সমস্ত সংজ্ঞা, মতামত ইত্যাদি গবেষণার প্রতিবেদনকে মূল্যবান করিয়া তোলে। এই কারণে গবেষণার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য মনীষীদের দেওয়া সংজ্ঞা, মতামত বা বক্তব্য টুকিয়া রাখা এবং প্রতিবেদনে উহা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা কর্তব্য। আপাতদৃষ্টিতে এই টুকিয়া রাখিবার কাজটি সহজসাধ্য মনে হইলেও বাস্তবে তাহা নহে। ইহার জন্য আবশ্যক গবেষকের বিষয়বস্তু সচেতনতা ও সুশৃঙ্খল চিন্তাধারা। গবেষক তাহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া অত্যন্ত যত্ন ও শৃঙ্খলার সহিত বিভিন্ন বই-পুস্তক বা পত্র-পত্রিকা হইতে প্রয়োজনীয় অংশ টুকিয়া রাখেন। এই সচেতনতা ও শৃঙ্খলার অভাব হইলে "টোকা" গুলি বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়িবে এবং উহার যথাযথ ব্যবহার বিঘ্নিত হইবে।

সুশৃঙ্খলভাবে টোকার জন্য নোট-কার্ড ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এক্সারসাইজ বুক বা খাতায় 'টোকার' চাইতে কার্ডে টোকা অধিকতর উপযুক্ত-কারণ হইতে ইচ্ছামতো নোটগুলিকে সাজাইয়া লওয়া যায়। টোকার জন্য ৬ × ৮ ইঞ্চি কার্ডের প্রয়োজন। এই কার্ডে প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা, বক্তব্যের অংশবিশেষ টুকিয়া রাখা হয়। একটি কার্ডে একটি বই হইতে নোট থাকিবে। কার্ডের উপরে কি কি বিষয়ে নোট করা হইতেছে তাহা সংক্ষেপে শিরোনামের মতো লিখিতে হইবে। টোকার নিচে বইয়ের নাম, লেখকের নাম ও বইয়ের পৃষ্ঠার নম্বর নিতে হয়। টোকা কার্ডে লিখিত বই সম্পর্কিত এ-তথ্য পরে পাদটীকায় বা গ্রন্থপঞ্জিতে ব্যবহার করা যাইবে। এই কার্ডগুলিকে প্রতিবেদনের প্রয়োজন অনুসারে সাজাইয়া লইতে হইবে। টোকার জন্য নোটকার্ড-এর ব্যবহার অত্যন্ত আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। ইহাতে গবেষক সুচিন্তিতভাবে কোনটির পর কোন উদ্ধৃতি ব্যবহার করিবেন তাহা নির্ধারণ করিতে পারেন এবং কার্ডের উপরে বিষয়বস্তু সংক্রান্ত শিরোনাম থাকায় প্রয়োজনবোধে তাহা সহজেই শ্রেণিবদ্ধ করিতে পারেন। নিচে নোটকার্ডে টোকার উদাহরণ দেওয়া গেল।

- **Definition of Social Work**
  - "Social work is a professional service, based on scientific knowledge and skill in human relations which helps individuals, groups, or communities obtain social or personal satisfaction and independence"
  - Walter A, Friedlander : Introduction to Social Selfare, Prentice- Hall, INC. New Jersey 1978.
  - Page-4

টোকার সময় গবেষক কি টুকিয়ে চাহেন এবং কিভাবে সে-বিষয়ে অবশ্যই সচেতন হইতে হইবে। এ-বিষয়ে তিনটি পরামর্শ মনে রাখা কর্তব্য :

১। প্রতিটি টোকা আলাদা আলাদা কার্ডে বা কাগজে করা উচিত।

২। প্রতিটি টোকা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে করা উচিত।

৩। প্রাসঙ্গিক সমস্ত কিছুই টোকা উচিত যাহা হয়তো পরে কাজে লাগিতে পারে।

গবেষক এই টোকা কিভাবে অর্থাৎ উদ্ধৃতি হিসাবে অথবা সংক্ষিপ্তভাবে ব্যবহার করিবেন তাহা পূর্বেই নির্ধারণ করিয়া সেই মতো টুকিতে হইবে।

উদ্ধৃতি ও পাদটীকা (Quotation & foot-note)

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রতিবেদনে লেখকের বক্তব্যকে যুক্তিপূর্ণ বা জোরালো করিয়া উপস্থাপিত করিবার প্রয়াসে বিভিন্ন মনীষী বা লেখকের দেওয়া সংজ্ঞা, বক্তব্য, মতামত ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ইতিপূর্বে বই-পুস্তক বা পত্র-পত্রিকা হইতে অংশ বিশেষ টুকিয়া লওয়ার পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। এই সমস্ত উদ্ধৃতি প্রতিবেদনে ব্যবহার করিবার জন্য বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করিতে হয়। উদ্ধৃতি যদি প্রতিবেদনে সরাসরিভাবে ব্যবহার করা হয় তবে তাহা মূল বইয়ের হুবহু নকল হইতে হয়। মূল বইয়ের ভাষা, বানান, দাড়ি, কমা ইত্যাদি হুবহু তুলিয়া দিতে হয়। উদ্ধৃতিটি উদ্ধৃতি চিহ্ন (quotation mark) দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিতে হয়। উদ্ধৃতি ছোট হইলে তাহা প্রতিবেদনের মধ্যেই ব্যবহার করা যায়। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হইলে তাহা নিচের স্তবকে বাম পার্শ্বে কিছু স্থান ছাড়িয়া লিখিতে হয়। ছাপার ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে ও অল্পদূরত্বে (single space) ছাপাইতে হয়।

উদ্ধৃতি ব্যবহার করিতে তাহা কোন্ লেখকের এবং কোন্ বই হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা সাথে সাথেই উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যদি প্রতিবেদনে বারংবার উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয় সেইক্ষেত্রে পুনঃপুন বই ও লেখকের নাম উল্লেখ করিলে প্রতিবেদনের আকর্ষণ কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পাদটীকায় এ-সমস্ত উদ্ধৃতির বিস্তারিত বিবরণ দিতে হয়।

পাদটীকা প্রতিবেদনের ব্যবহৃত উদ্ধৃতি বা তথ্যের পরিচয় দান করে। কোন লেখকের কোন্ বইয়ের কত পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃতিটি লওয়া হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ এখানে থাকে। পাঠক ইচ্ছা করিলেই মূল বইটি দেখিতে পারেন এবং উহা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি সূত্র (reference) হিসাবে কাজ করে। তাহা ছাড়া অন্য লেখকের বক্তব্যকে লেখক নিজ প্রতিবেদনে ব্যবহার করিতেছেন– ইহা স্বীকার করাও পাদটীকার উদ্দেশ্য। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিতে ১, ২ করিয়া নম্বর দেওয়া হয়। উদ্ধৃতি যেখানে শেষ হয় ঠিক সেইখানে নম্বর দেওয়া হয়। যেমন, "জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য মানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগকেই গবেষণা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।"

এই নম্বর দেওয়ার আবার কিছু নিয়ম আছে। প্রতিবেদন যদি ছোট আকারের হয়, যেমন আট-দশ পৃষ্ঠার, সেইক্ষেত্রে প্রতিবেদনে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উদ্ধৃতিসমূহে ক্রমান্বয়ে ১, ২ করিয়া নম্বর দিয়া যাইতে হয়। প্রতিবেদনের শেষে ব্যবহৃত উদ্ধৃতির

পাদটীকা উপরোক্ত ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী দিতে হয়। প্রতিবেদন বড় হইলে এইভাবে প্রতি অধ্যায়ের শেষে পাদটীকা দেওয়া যায়। বড় প্রতিবেদনের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা হইল প্রতি পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতির পাদ-টীকা ঐ পৃষ্ঠারই নিচে দেওয়া। এই পদ্ধতি অধিকতর যুক্তিপূর্ণ ও প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি পৃষ্ঠায় আলাদাভাবে নম্বর দেওয়া হয় এবং সেই নম্বর অনুযায়ী পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকা দেওয়া হয়। ইহাতে পাঠক প্রতিবেদন পাঠের সহিত উদ্ধৃতিগুলির পরিচিতি সম্পর্কেও ধারণা লাভ করিতে পারেন। গবেষণার প্রতিবেদনে সাধারণ এই পদ্ধতিতে পাদটীকা দেওয়া হয়।

প্রতি পৃষ্ঠায় পাদটীকা দিতে হইলে, সেই-পৃষ্ঠার প্রতিবেদন ও পাদটীকার মধ্যে একটি লাইন টানিয়া পৃথক করিতে হয়। লাইনের নিচে ক্রমান্বয়ে পাদটীকা দিতে হয়। পাদটীকায় বইয়ের পূর্ণ বিবরণ দিতে হয়। যেমন, প্রথমে লেখকের নাম, বইয়ের নাম, প্রকাশকের নাম ও প্রকাশের তারিখ, উদ্ধৃতি যে পৃষ্ঠা হইতে লওয়া হইয়াছে তাহার নম্বর বইয়ের নামের নিচে লাইন টানিয়া দিতে হয়। উদাহরণ :

মুহাম্মদ আব্দুল হাই : সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ ১৯৬৫, পৃষ্ঠা : ৯

প্রতিবেদন প্রণয়নে কমপিউটার ব্যবহার করা হইলে পৃষ্ঠার নিচে এইভাবে লাইন টানিয়া পাদটীকা দেওয়া অসুবিধাজনক। তাই ইদানীং উদ্ধৃতি ব্যবহার করিয়া ১, ২ করিয়া নম্বর না দিয়া উদ্ধৃতির শেষে বন্ধনীর মধ্যে যে-পুস্তক হইতে উদ্ধৃতি লওয়া হইয়াছে উহার লেখকের নাম, পুস্তক প্রকাশের সন ও পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়। লেখকের পুরা নাম ব্যবহার না করিয়া নামের শেষাংশ ব্যবহার করা হয়। যেমন– (বেগম, ১৯৮৭ : ৯)। প্রতিবেদনে কোন পুস্তকের লেখকের নাম উল্লেখ করা হইলে, ঐ পুস্তকের নির্দেশিকায় দেওয়ার জন্য লেখকের নামের পাশেই বন্ধনীর মধ্যে ঐ পুস্তক প্রকাশের সন দেওয়া হয়। যেমন– "চৌধুরীর (১৯৮২) গবেষণায় দেখা গিয়াছে ..... ইত্যাদি" – এই ভাবে গ্রন্থ নির্দেশ প্রতিবেদনে দেওয়া হইলে পাঠক গ্রন্থপঞ্জি হইতে উক্ত পুস্তকের বিস্তারিত বিবরণ লাভ করিতে পারিবেন। এইক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রতিটি পুস্তকের বিবরণ যথাযথ প্রকাশনার সন সহকারে যাহাতে গ্রন্থপঞ্জীতে স্থান পায়। এই পদ্ধতিতে উদ্ধৃতির নির্দেশ দেওয়া হইলে প্রতিবেদন দেখিতে তুলনামূলকভাবে অধিকতর আকর্ষণীয় হয় এবং টাইপ করা বা ছাপানো সুবিধাজনক হয়। তাহাছাড়া প্রতিবেদন পাঠের সময়ই পাঠক কোন্ লেখক বা গবেষকের উদ্ধৃতি পড়িতেছেন যে- সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এ-পদ্ধতিতে গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করিতে অধিকতর সুবিধাজনক কারণ একই পুস্তক বা গবেষণার উল্লেখ বার বার 'প্রস্তুত' ইত্যাদিভাবে লেখার প্রয়োজন পড়ে না, উপরন্তু গ্রন্থপঞ্জি সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর হয়। ইহাই আধুনিক পদ্ধতি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নমুনায়ন

SAMPLING

আধুনিক যুগে অল্প সময়ে অধিক কাজ করিবার প্রবণতার দরুন গবেষকদের এমন একটি পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে যাহার দ্বারা অল্পসংখ্যক বিষয়ের উপর অনুসন্ধান সীমিত রাখিয়াও বিস্তৃত পরিধির অধিক সংখ্যক বিষয়ের সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। যে পদ্ধতিতে বিস্তৃত অনুসন্ধান ক্ষেত্র হইতে গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয় বা উপাদান নির্বাচন করা হয় তাহাকে সংক্ষেপে নমুনায়ন (sampling) বলা হয়।

তথ্য-বিশ্ব বা সমগ্রক (Universe or population)

গবেষণায় অনুসন্ধান ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সকল উপাদানকে একত্রে সমগ্রক বা তথ্য-বিশ্ব বলে। সহজ কথায় বলা যায়, গবেষণার জন্য যে-সমস্ত উপাদান (ব্যক্তি বা সংখ্যা) হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যে অনুসন্ধান ক্ষেত্রের প্রতিটি উপাদানসমূহের উপর প্রযোজ্য হয় তাকেই সমগ্রক বা তথ্য-বিশ্ব বলে। সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত উপাদানকে নমুনায়নের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয় তাহাদের প্রত্যেকটি নমুনা একক (Sample unit) বলা হয়।

গবেষণার সমগ্রক ব্যক্তি, বস্তু, সংখ্যা হইতে পারে। যদি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বা কোন বিষয়ে মতামত সম্বন্ধে গবেষণা করা হয়, তবে সে-ক্ষেত্রে গবেষণার সমগ্রক হইবে ব্যক্তি। যেমন– পরিবার পরিকল্পনার মহিলা বন্ধ্যাকরণ সম্পর্কে কোনো গবেষণা পরিচালিত হইলে, উক্ত গবেষণার সমগ্রক হিসাবে-বিবেচিত হইবে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বন্ধ্যাকৃত বা বন্ধ্যাকরণ যোগ্য সকল মহিলা। কোনো এলাকার ঘর-বাড়ি, স্কুল-কলেজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানিতে হইলে, উক্ত এলাকার অন্তর্ভুক্ত ঘর-বাড়ি, স্কুল-কলেজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সমগ্রক হিসাবে বিবেচিত হইবে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বৎসরে বিভিন্ন শ্রেণিতে পাসের হার সংক্রান্ত তথ্য জানিতে হইলে, দশ বৎসরে পাসকৃত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা সমগ্রক হিসাবে গণ্য হইবে।

গবেষণার সমগ্রক কি হইবে তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখিতে হয়। প্রথমেই দেখিতে হইবে, গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য কোথায় ও কাহার নিকট পাওয়া যাইবে? দ্বিতীয়ত, যাহাদের সমগ্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে, তাহাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সাদৃশ্যপূর্ণ কিনা?

নমুনা (Sample) : সমগ্রক বা তথ্য-বিশ্ব হইতে উহার সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতীকরূপে যে-অংশটিকে নমুনায়নের বিশেষ প্রক্রিয়ায় গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং সমগ্রক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়, তাহাকে নমুনা বলে। নমুনা সমগ্রকের এমন একটি অংশ যাহা গবেষণার জন্য বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে নির্বাচন করা হয়। নমুনা সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্টের বিস্তৃত পরিধির সমগ্রকের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে। যে-পদ্ধতির সাহায্যে নমুনা নির্বাচন করা হয়, তাহাকে নমুনায়ন (Sam pling) বলে।

নমুনার পরিকল্পনা (Sampling plan)

সমগ্রক হইতে যথাযথভাবে নমুনা চয়ন করিবার জন্য আবশ্যক নমুনা পরিকল্পনার। এই পরিকল্পনায় কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকিবে—

(১) গবেষণার সমগ্রক : গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য কোথায় ও কাহাদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে, সমগ্রকের পরিধি কতটুকু হইবে, তাহা পরিকল্পনায় উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) নমুনায়ন পদ্ধতি : সমগ্রক হইতে নমুনা একক নির্বাচন করিবার জন্য গবেষক নমুনায়নের কি পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন এবং বিশেষ করিয়া ঐ পদ্ধতি তিনি কেন ব্যবহার করিতেছেন সে-সম্বন্ধে তাহার যুক্তি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) নমুনার পরিমাণ : সমগ্রক হইতে গবেষক নমুনায়নের মাধ্যমে ঠিক কতগুলি নমুনা গ্রহণ করিবেন তাহা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। নমুনা যাহাতে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে সেই দিকে লক্ষ রাখিয়া নমুনার পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিত। সমগ্রকের অতি নগণ্য অংশ যদি নমুনা হিসাবে লওয়া হয়, তবে উহা হইতে প্রাপ্ত তথ্য সমগ্রক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপযুক্ত না-ও হইতে পারে। সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সামঞ্জস্য অধিক হইলে কম সংখ্যক নমুনা প্রতিনিধিত্বকারী হইতে পারে কিন্তু সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য অধিক হইলে অধিকসংখ্যক নমুনা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। নমুনার পরিমাণ গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ও সময়ের উপরও বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

শুমারি (Census বা Complete count)

কোন সমগ্রক হইতে গবেষণার জন্য দুইটি পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে, সার্বিক গণনা পদ্ধতি বা শুমারি ও নমুনায়ন। সার্বিক গণনা পদ্ধতি বা শুমারি ও নমুনায়ন। সার্বিক গণনা পদ্ধতিতে সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি একক হইতেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়, অপরদিকে নমুনা পদ্ধতিতে সমগ্রকের একটি ক্ষুদ্র অংশ অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং তাহা হইতেই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই তথ্যলব্ধ ফলাফল হইতে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

শুমারি বা সার্বিক গণনা পদ্ধতিতে যেহেতু সমগ্রভুক্ত প্রতিটি একক হইতেই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাই এই পদ্ধতির সাহায্যে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা লাভ

করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু বিভিন্ন বাস্তব অসুবিধার দরুন শুমারি সব জরিপ বা গবেষণায় ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ফলে নমুনায়নের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

শুমারির তুলনায় নমুনায়নের কিছু বিশেষ সুবিধা থাকায় সামাজিক গবেষণায় নমুনায়ন বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। নিচে নমুনায়নের সুবিধাবলি আলোচনা করা হইল।

নমুনায়নের সুবিধা

১। নমুনায়ন একটি মিতব্যয়ী পদ্ধতি। শুমারি জরিপ বা গবেষণায় সমগ্রকের প্রতিটি একক হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ফলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সেই তুলনায় নমুনায়নের মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক একক হইতে তথ্য সংগ্রহ করা অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ, তাই আর্থিক দিকে বিবেচনায় শুমারির তুলনায় নমুনায়ন অধিক সুবিধাজনক।

২। শুমারি জরিপে যেহেতু সমগ্রকের প্রতিটি একক হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাই তথ্য সংগ্রহের ও তথ্য বিশ্লেষণে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। নমুনা জরিপে স্বল্প সংখ্যক একক হইতে তথ্য সংগৃহীত হয় বলিয়া তথ্য সংগ্রহ ও উহার বিশ্লেষণে তুলনামূলকভাবে স্বল্প শ্রম ও স্বল্প সময় ব্যয় হয়। কোন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য বা কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যখন জরুরী ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের আবশ্যকতা দেখা দেয়, তখনই নমুনা জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। শুমারি পদ্ধতিতে বেশি সময় প্রয়োজন হয় বলিয়া প্রাপ্ত ফলাফলের সময়ের ব্যবধানে অনেক সময় গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে।

স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে ও স্বল্প শ্রমে কোন বিষয়ে অনুসন্ধান চালাইতে হইলে নমুনায়নই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।

৩। যদিও সমগ্রকের নির্দিষ্ট কয়েকটি এককের উপর ভিত্তি করিয়াই গবেষণা হয়, তথাপি নমুনা জরিপের ফলাফল শুমারি জরিপ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য হইতে পারে। নমুনা জরিপে যেহেতু স্বল্পসংখ্যক একক হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাই তথ্যের উপর গবেষকের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ থাকে। তিনি তথ্য সংগ্রহ ও উহার বিশ্লেষণে যাহাতে ভুল-ত্রুটি না-হয় সেই দিকে অধিকতর মানোনিবেশ করিতে পারেন। অন্যদিকে শুমারি জরিপের মাধ্যমে বিস্তৃত পরিধির অধিক সংখ্যক তথ্যের সুষ্ঠু বিচার বিশ্লেষণ অনেক সময়ই অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যবহারেও নানা পর্যায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত কারণে শুমারি জরিপের ফলাফলের তুলনায় নমুনা জরিপের ফলাফল উৎকৃষ্টমানের হইতে পারে।

৪। নমুনা জরিপ সংক্ষিপ্ত পরিধির হওয়ায় তথ্য সংগ্রহকারী ও তথ্য বিশ্লেষণকারীগণ সাধারণত জরিপ পরিচালকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। তাই জরিপের পরিচালকের পক্ষে জরিপের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রাখিয়া

প্রতিটি পর্যায়ের ভুল-ত্রুটি পর্যালোচনা করা সম্ভব হয় এবং সময়মতো তিনি এই সমস্ত ভুল সংশোধন করিবার সুযোগ পান।

৫। গবেষণার বিভিন্ন ধরনের কার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের লোক নিযুক্ত করা হয়। যেমন, তথ্য সংগ্রহকারী, পরিসংখ্যানবিদ, তথ্য বিশ্লেষণকারী, তত্ত্বাবধায়ক, ইত্যাদি। এই সমস্ত ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, আন্তরিকতা, প্রশিক্ষণ, নিপুণতা ও কৌশলগত উৎকর্ষের উপর জরিপের গুণগত মান নির্ভরশীল। এই কারণে জরিপ বা গবেষণার জন্য অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ ও তাহাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান অপরিহার্য।

নমুনায়নের ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণায় স্বল্পসংখ্যক তথ্য সংগ্রহকারী আবশ্যক হয়। স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দ্বারা উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা যায়। কিন্তু শুমারি জরিপে অনেক লোকের প্রয়োজন হওয়ায় তাহাদের উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষিত ও দক্ষ লোক অধিক সংখ্যায় পাওয়াও কঠিন।

৬। কোন কোন গবেষণার জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ যন্ত্রপাতির অভাবহেতু নমুনায়নের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনা অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

৭। কোন কোন ক্ষেত্রে একই বিষয়ে কিছুদিন পর পর গবেষণা করা প্রয়োজন হয়। যেমন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে উহার অগ্রগতি জানিবার জন্য একই এলাকায় একই বিষয়ে বার বার গবেষণা করা যাইতে পারে। শুমারি জরিপে সময়, সম্ভাব্য ব্যয়, শ্রম, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক অসুবিধার দরুন বার বার জরিপ পরিচালনা করা দুরূহ হইয়া পড়ে। অথচ নমুনায়নের মাধ্যমে অল্প ব্যয়ে পুনঃপুন গবেষণা করা সম্ভব ও অধিকতর যুক্তিপূর্ণ।

৮। কিছু কিছু গবেষণার ক্ষেত্র রহিয়াছে যেখানে নমুনায়ন ছাড়া বিকল্প কোন পন্থা অবলম্বন করা যায় না। যে সমস্ত ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনে বস্তুকে বিনষ্ট করিয়া বস্তুর বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে শুমারি পদ্ধতির ব্যবহার অসম্ভব। সেই ক্ষেত্রে নমুনায়নই একমাত্র অবলম্বনযোগ্য পদ্ধতি।

৯। এমন কতকগুলি ক্ষেত্র রহিয়াছে যেখানে শুমারি পদ্ধতি প্রযোজ্য নহে। যেমন কোন খনিজ পদার্থের গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য জানিতে হইলে শুমারি পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব নহে। কেননা খনির সমস্ত খনিজ পদার্থের উত্তোলন না হওয়া পর্যন্ত গবেষককে সেক্ষেত্রে অপেক্ষা করিতে হইবে। নমুনায়নের সাহায্যে খনিক স্বল্পসংখ্যক পদার্থের গুণগত মান পরীক্ষা করিয়া খনির সমস্ত পদার্থ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

১০। সম্ভাবনা তত্ত্ব (Probability theory) দ্বারা নমুনায়নের ভ্রান্তিদূর করা সম্ভব কিন্তু শুমারির গণনা হইতে কেউ বাদ পড়িয়া গেলে, উহা নিরূপণ দুঃসাধ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, সীমিত সম্পদে, সীমিত সময়ে গবেষণা পরিচালনা ও গবেষাণার ফলাফলের উৎকর্ষতার বিচারে শুমারি পদ্ধতির তুলনায় নমুনায়ন অধিকতর

সুবিধাজনক। ইহা অধিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, সমস্যা-উহার প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব, মতামত ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রায়শই নমুনায়নের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

নমুনায়নের প্রকারভেদ

নমুনাভিত্তিক প্রত্যেক গবেষণারই উদ্দেশ্য হইতেছে নমুনার ভিত্তিতে সমগ্রকের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাসম্ভব জ্ঞান লাভ করা। কিভাবে নমুনায়ন করিলে গবেষণার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং নমুনা হইতে প্রাপ্ত ফলাফল দ্বারা কিভাবে সমগ্রক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর হইবে, তাহা পূর্বাহ্নেই নির্ধারণ করিতে হইবে। সমগ্রক হইতে নমুনা গ্রহণের কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি রহিয়াছে। নমুনার ভিত্তিতে গবেষণা করিতে হইলে নুমানয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নমুনা গ্রহণের সময় গৃহীত নমুনা যাহাতে সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যাবলির যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে সেইদিকে লক্ষ রাখা দরকার। অর্থাৎ সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যাবলী গৃহীত নমুনায় থাকিতে হইবে যাহাতে উক্ত নমুনাভিত্তিক গবেষণার ফলাফল সমগ্রকের উপর যথাযথভাবে প্রযোজ্য হয়। সঠিক, নিরপেক্ষ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা গ্রহণে সাহায্য করিবার জন্য নমুনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গবেষণার উদ্দেশ্য, তথ্যের প্রকৃতি, প্রাপ্ত সময় ও অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নমুনায়নের পদ্ধতিগুলির মধ্য হইতে যে-কোনটিকে গবেষক তাহার গবেষণার জন্য অনুসরণ করিতে পারেন। এই জন্য পরিসংখ্যান ও নমুনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সমগ্রকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গবেষকের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সম্ভাবনা ও নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন (Probability and non-probability sampling)

সম্ভাবনা তত্ত্বের ভিত্তিতে নমুনায়নকে সাধারণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন, সম্ভাবনা নমুনায়ন ও নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন। সম্ভাবনা নমুনায়নে সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি এককেরই নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে। এখানে পরিসংখ্যান পদ্ধতির দ্বারা সমগ্রকের প্রতিটি এককের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে নির্দিষ্ট করিয়া বলা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা লাভ করা যায়। সম্ভাবনা নমুনায়ন প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন–

১। সরল নির্বিচারী নমুনায়ন (Simple Random sampling)।

২। নিয়মানুযায়ী নমুনায়ন (Systamatic sampling)।

৩। স্তরিত নমুনায়ন (Stratified sampling)।

৪। গুচ্ছ নমুনায়ন (Cluster sampling)।

যে-সমস্ত ক্ষেত্রে বিশেষ কারণবশত সম্ভাবনা নমুনায়ন সম্ভবপর হয় না, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে গবেষক নিঃসম্ভাবনা নমুনায়নের মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করেন। নিঃসম্ভাবনা (non-probabilty) নমুনায়ন দুই প্রকার হইতে পারে। যেমন—

১। আকস্মিক নমুনায়ন (Accidental sampling)।

২। স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন (Purpusive sampling)।

সম্ভাবনা নমুনায়নের প্রকারভেদ

১। সরল নির্বিচারী নমুনায়ন (Simple Random Sampling) :

যে পদ্ধতিতে নমুনা চয়ন কালে সমগ্রকের প্রতিটি এককের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সুযোগ থাকে এবং কোন এককের নমুনায় অন্তর্ভক্ত হওয়া দৈবের উপর নির্ভরশীল, তাহাকে নির্বিচারী নমুনায়ন বলে। এই পদ্ধতিতে এমনভাবে নমুনা চয়ন করা হয় যে, গবেষক কোন দিক হইতেই নমুনা পক্ষপাতদুষ্ট হইবে না বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন। সমগ্রকের এককগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাহাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সমগ্রকের প্রতিটি এককের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে। এই পদ্ধতিতে গবেষকের ইচ্ছার উপর নমুনা চয়নের দায়িত্ব থাকে না। সম্ভাবনা তত্ত্বের ভিত্তিতে নমুনা গ্রহণ হইয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে যদিও নির্বিচারী নমুনায়ন অপরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়, বাস্তবক্ষেত্রে তাহা নহে। নির্বিচারি নমুনায়নও অত্যন্ত সচেতন ও পরিকল্পিত উপায়ে করিতে হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্বের অবকাশ থাকে না এবং ইহা বিজ্ঞানসম্মত।

কিভাবে নির্বিচারী নমুনায়ন করা হয়?

নির্বিচারী নমুনায়নকে পক্ষপাতমুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত করিবার জন্য কতগুলি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নমুনা নির্বাচনে প্রকৃত নির্বিচারী চয়নের প্রতিফলন ঘটাইবার জন্য বিশেষ কতগুলি পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে নমুনা একক চয়ন করা হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ায় সমগ্রকের প্রতিটি একককে একটি করিয়া নম্বর দিয়া নম্বরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে লিখিয়া একত্রে মিলাইয়া দিতে হয়। অতঃপর ঐ কাগজগুলি হইতে নমুনার পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাগজ তুলিয়া লইতে হয়। এই কাগজগুলিতে যে এককের নম্বর পাওয়া যাইবে, সেইগুলিকে নমুনা হিসাবে গণ্য করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় গৃহীত নমুনা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া সম্ভব এবং সমগ্রকের পরিধি বড় হইলে এই প্রক্রিয়া কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। যদি লটারি প্রক্রিয়ায় সচেতনভাবে ব্যক্তিগত পক্ষপাত দূর করা যায়, তবে ইহার দ্বারা যথার্থ নির্বিচারী নমুনা চয়ন সম্ভব হয়। সাধারণত নির্বিচারী নমুনায়নের জন্য "দৈব-সংখ্যা সারণি" (random number table) ব্যবহৃত হয়। এই সারণি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এবং নির্বিচারী চয়ন সম্পর্কে বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়। এই সারণিতে কতগুলি সংখ্যা কলাম ও সারিতে সাজানো থাকে। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে সমগ্রকের প্রতিটি একককে একটি করিয়া ক্রমিক সংখ্যা প্রদান করিতে হয়। সারণী হইতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে যে-কোনো

একটি পৃষ্ঠা নির্বাচন করিয়া উহাতে সমগ্রকের আয়তনের সংখ্যানুযায়ী একটি কলাম বা সারি নির্বাচন করিতে হয়। উক্ত সারি বা কলামের যে-কোনো একটি সংখ্যা হইতে শুরু করিয়া আমরা প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংখ্যা পাইব। প্রাপ্ত সংখ্যাগুলি নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হইবে। সংখ্যা নির্বাচনের সময় সমগ্রকের আয়তনের চাইতে বড় সংখ্যা বাদ দিতে হইবে। একই সংখ্যা দুইবার পাওয়া গেলে, প্রথম নির্বাচনের পর পরবর্তী একই সংখ্যাটিকে বাদ দিতে হইবে।

নিয়মানুযায়ী নমুনায়ন (Systematic Sampling)

সামাজিক জরিপ বা গবেষণায় নিয়মানুযায়ী নমুনায়ন একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সমগ্রকের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই তালিকা হইতে, দৈব-সংখ্যা সারণী বা অন্য কোন নির্বিচারী পদ্ধতিতে, প্রথম একককে নমুনা হিসাবে চয়ন করা হয়। অতঃপর নমুনার পরিধি অনুযায়ী প্রতি ১০তম বা ২০তম ইত্যাদি ভাবে, একককে নমুনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, কোন এলাকার ২০০০ বাড়ি হইতে গবেষক ১০০টি বাড়ি নমুনার অন্তর্ভুক্ত করিতে চান। সেই ক্ষেত্রে বাড়ির হোল্ডিং নম্বরের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহাতে ক্রমিক নম্বর প্রদান করিতে হইবে। প্রথম একক নির্বিচারী পদ্ধতিতে চয়ন করিতে হইবে। মনে করা যাক, প্রথম নির্বাচিত একক-৭ম নম্বর। পরবর্তীতে প্রতি বিশতম একক চয়ন করা হইবে। তাহা হইলে ২৭তম, ৪৭ তম ইত্যাদি এককগুলি নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হইবে। প্রথম একক বাছাই নির্বিচারী হইলে পরবর্তী এককগুলিও নির্বিচারীভাবে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩। স্তরিত নির্বিচারী নমুনায়ন (Stratified Random Sampling) :

সমগ্রকের মধ্যে যখন এমন কতগুলি দল (Group) বা শ্রেণি থাকে যাহাদের পৃথক পৃথক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই সব দল বা শ্রেণি সংখ্যার দিক দিয়াও কেউ বেশি, কেউ কম, সেই ক্ষেত্রে নির্বিচারী নমুনায়ন বা নিয়মানুযায়ী নমুনায়নের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। এই সব ক্ষেত্রে প্রতিটি দলের বা শ্রেণির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি জানিতে হইলে অবশ্যই অন্য পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। এই ক্ষেত্রে স্তুতির নমুনায়ন করা হয়। স্তরিত নমুনায়নের বৈশিষ্ট্য হইল যে, উহাতে সমগ্রকের অন্তর্গত দল বা শ্রেণিসমূহকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়। অতঃপর প্রতিটি স্তর হইতে আনুপাতিকভাবে নির্বিচারী নমুনায়নের বা নিয়মানুযায়ী নমুনায়নের সাহায্যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। গবেষককে স্তর বিভিক্তকরণের বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইতে হয়। একই সংবলিত এককসমূহ যাহাতে একই স্তরের অন্তর্ভুক্ত হয় সেইদিকে লক্ষ রাখিতে হইবে নতুবা স্তরিতকরণ মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। একই একক যেন শুধুমাত্র একটি স্তরেরই অন্তর্গত হয় সেই বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হইবে। স্তরিত নমুনায়নের বিভিন্ন স্তর হইতে নমুনা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রকার নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণি বা বৈশিষ্ট্য, মতামত ও ধ্যানধারণাকে জানিতে হইলে স্তরিত নমুনায়ন আবশ্যক হয়। যেমন, পরিবার পরিকল্পনার প্রতি বাংলাদেশের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি কি? ইহা জানিতে হইলে আমাদের বাংলাদেশের জনগণকে দুইটি প্রধান স্তরে ভাগ করিতে হইবে, যেমন শহরবাসী ও গ্রামবাসী। কারণ, শহর ও গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। তেমনিভাবে কোন সমগ্রকে যদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক থাকে এবং তাহাদের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবে সরল নির্বিচারী নমুনায়নের মাধ্যমে সকল ধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যক নমুনা লাভ সম্ভব নহে। যেমন, একটি সমগ্রকের ৫০০ জন মুসলিম, ৫০ জন হিন্দু, ১০ জন খ্রিস্টান থাকে। সেইক্ষেত্রে যদি স্তরিত নির্বিচারী বা নির্বিচারী নমুনায়নের সাহায্যে ১০০টি নমুনা চয়ন করা হয়, তবে অবশ্যই আশা করা যায় যে, নমুনায়ন আনুপাতিক হারে মুসলিম, হিন্দু বা খ্রিস্টান অন্তর্ভুক্ত হইবে। সে-ক্ষেত্রে তিনটি স্তরে এই তিন শ্রেণিকে বিভক্ত করিয়া যদি আনুপাতিকভাবে নমুনা চয়ন করা হয় তবে তাহা অনেক প্রতিনিধিত্বকারী হইবে।

৪। গুচ্ছ নমুনায়ন (Cluster Sampling) :

সামাজিক গবেষণার জন্য সুবিধাজনকভাবে নমুনায়নের আরেকটি পদ্ধতি হইলে গুচ্ছ নমুনায়ন। এই পদ্ধতিতে সমগ্রককে অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত করা হয়। উক্ত ভাগগুলি হইতে দৈব-নমুনায়নের সাহায্যে কয়েকটি ভাগকে গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়। সমগ্রকের এই এক একটি ভাগকে এক একটি গুচ্ছ বলা হয়। সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত একককে নমুনার জন্য চয়ন না করিয়া এই পদ্ধতিতে কতগুলি একককে একটি গুচ্ছ হিসাবে চয়ন করা হয় বলিয়া ইহাকে গুচ্ছ নমুনায়ন বলে। নির্বাচিত গুচ্ছগুলির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি একক হইতেই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

স্তরিত নুমানয়নের সহিত গুচ্ছ নমুনার পার্থক্য হইল যে, স্তরিত নমুনায়নে এককের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমগ্রককে কয়েকটি অংশে বা স্তরে ভাগ করা হয়। অতঃপর প্রতিটি স্তর হইতে নির্বিচারী বা নিয়মানুযায়ী নমুনায়নের মাধ্যমে নমুনা চয়ন করা হয়। গুচ্ছ নমুনায়নের সমগ্রককে কয়েকটি ভাগে বা গুচ্ছে বিভক্ত করা হয় এবং উক্ত গুচ্ছগুলি হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুচ্ছকে নির্বিচারী নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয় এবং নির্বাচিত গুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি একক হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, ঢাকা শহরকে গবেষণার প্রয়োজনে ১০০টি এলাকায় বিভক্ত করা হইল। এই ১০০টি এলাকাকে গবেষণার এক একটি গুচ্ছ বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই সমস্ত গুচ্ছ হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক, যেমন, ২০টি এলাকা নির্বিচারী নমুনায়নের মাধ্যমে চয়ন করা হইবে। এই গুচ্ছ নমুনায়নের সুবিধা এই যে, ইহাতে অল্প সময়ে ও অল্প খরচে বিস্তারিত তথ্য লাভ করা যায়। ১০০টি গুচ্ছের প্রতিটি বাড়িতে যাইয়া তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সংখ্যক লোক ও অর্থ আবশ্যক, তদপেক্ষা অল্প লোক দ্বারা ও অল্প অর্থে এই তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। উপরন্তু, গুচ্ছগুলি নির্বিচারী

পদ্ধতিতে নির্বাচন করায় উহা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে এবং নমুনা প্রতিনিধিত্বমূলক হয়।

নিঃসম্ভাবনা নমুনায়নের (Non-probability Sampling) প্রকার ভেদ

১। আকস্মিক নমুনায়ন (Accidental Sampling) :

সম্ভাবনা নুমানয়ণের কোনো পদ্ধতির সাহায্যেই যখন গবেষণার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না বা তাহা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় তখনই গবেষক নিঃসম্ভাবনা নমুনায়নের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আকস্মিক নমুনায়ন ইহারই একটি প্রকার যখন এই পদ্ধতিতে গবেষক তাহার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা কোন বিশেষপদ্ধতিতে নির্বাচিত না করিয়া যাহা সামনে পাওয়া যায়, সেইগুলিকেই নমুনা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং এই প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নমুনা সংগ্রহ করেন। এই পদ্ধতির দুর্বলতা এই যে, ইহার দ্বারা প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা ও পাওয়া যাইতে পারে এবং নমুনা পক্ষপাতদুষ্ট হইতে পারে। যদিও গবেষক যাহা সামনে পাওয়া এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেন তথাপি এইভাবেই নমুনা সংগ্রহেও তিনি গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া যুক্তিযুক্তভাবে এবং পূর্ব-নির্ধারিত কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে এ-নমুনা চয়ন করেন। এ পদ্ধতির নমুনায়ন উদ্‌ঘাটনী অনুসন্ধানের জন্য অথবা কোন বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি অনুসন্ধান করিয়া সাময়িক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। বিস্তারিত ও গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য অনুমান গঠনের উদ্দেশ্যেও এ-ধরনের নমুনা লইয়া গবেষণা করা হইয়া থাকে।

২। স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন (Purposive Sampling) :

গবেষক অনেক সময় গবেষণার জন্য উপযোগী নমুনা উদ্দেশ্যমূলকভাবে চয়ন করেন। গবেষণার প্রয়োজনের দিক দিয়া সন্তোষজনক বিবেচিত এককগুলিকে নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। এই নমুনা যাহাতে পক্ষপাতদুষ্ট না হয় সেই জন্য গবেষক যুক্তিযুক্তভাবে ও কৌশলে তাহা চয়ন করিবেন। সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে এমন এককগুলিকেই নমুনার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাহাতে ঐ সমস্ত নমুনা হইতে সমগ্রকের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। এই কারণে গবেষকের সমগ্রক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। গবেষক তাহার বিবেচনা অনুযায়ী নমুনার এককগুলি চয়ন করেন, তাই ইহাতে পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অধিক। স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায় অর্থ ব্যয় কম হয় কারণ গবেষক সুবিধাজনক এককগুলি চয়ন করিতে পারেন।

স্বেচ্ছাচয়িত নমুনা সমগ্রক হইতে বিভিন্নভাবে চয়ন করিতে পারেন। সমগ্রককে কয়েকটি স্তরে ভাগ করিয়া সেই স্তরগুলি হইতে তাহার প্রয়োজন অনুসারে একক চয়ন করিতে পারেন। তিনি সমগ্রকটিকে কয়েকটি গুচ্ছে ভাগ করিয়া ঐ গুচ্ছ হইতে কিছুসংখ্যক গুচ্ছকে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্বাচন করিয়া উহার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি একক অনুসন্ধান করিতে পারেন।

ষোড়ষ অধ্যায়

পরিমাপ পদ্ধতি

TECHNIQUES OF MEASUREMENT

সামাজিক বিজ্ঞানে যে সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করা হয় সেইগুলি প্রায়ই গুণাত্মক। ঐগুলির মধ্যে যথাযথ পার্থক্য নিরূপণের মাধ্যমেই বিষয়গুলির বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত এমন বিষয় লইয়া আলোচনা করেন, যেমন কোন ব্যক্তি বা দলের আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, ইত্যাদি যাহার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তগ্রহণ করিতে হইলে উক্ত বিষয়টিকে সঠিকভাবে পরিমাপ করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। কোন ব্যক্তির বয়স, আয়, ব্যয় বা উচ্চতা সম্পর্কে রূপ নির্দিষ্ট করিয়া বলা সম্ভব সেই ব্যক্তির মনোভাব, আচার-আচরণ সম্পর্কে সেইরূপ নির্দিষ্টভাবে বলা সহজসাধ্য নহে। অথচ গবেষণার ফলাফল নির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা না হইলে উহার মূল্য ও কর্মকারিতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ন হয়। গবেষণার মান শুধুমাত্র গবেষণার নক্‌শার ব্যাপকতার উপরই নির্ভর করে না বরং গবেষণার তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিমাপকের কার্যকারিতার উপরও অনেকাংশ নির্ভরশীল।

সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন গুণাত্মক বিষয়গুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করিবার ও জানিবার জন্য যেই সমস্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাহাকে পরিমাপ পদ্ধতি বলে।

পরিমাপ অর্থপূর্ণ হয় তখনই যখন গবেষণায় বিভিন্ন বিষয় বা প্রশ্নাবলি সুনির্ধারিত হয় এবং ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা দান করা হয়। কোন বিষয়কে পরিমাপ করিতে হইলে কতগুলি দিকে লক্ষ রাখিতে হইবে, যেমন–

১। গবেষক কোন বিষয়টি পরিমাপ করিতে চান তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। এই জন্য উক্ত বিষয়টির সংজ্ঞা দান করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, গবেষক পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে শিল্প শ্রমিকদের 'মনোভাব' জানিতে আগ্রহী। এ-ক্ষেত্রে প্রথমেই 'মনোভাব' প্রত্যয়টির উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে। বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে 'মনোভাব' প্রত্যয়টির ব্যাখ্যা দিবেন। কেহ বলিবেন– ইহা কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা, আবার কেহ বলিবেন যে, কোন বিষয় সম্পর্কে মতামত ইত্যাদি। গবেষক এই সমস্ত সংজ্ঞার কোন্‌টি তাহার গবেষণার জন্য ব্যবহার করিবেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি ঠিক করিবেন যে, তিনি কি পরিমাপ করিবেন। পরিমাপের

বিষয়টির উপরই নির্ভর করে কিভাবে তিনি উহা পরিমাপ করিবেন অর্থাৎ পরিমাপের বিষয়টির নির্দিষ্টকরণ, কিভাবে পরিমাপ করা হইবে তাহার পূর্ব-শর্ত। পরিমাপ পদ্ধতির মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করিবার পদ্ধতি যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনি উক্ত তথ্য ব্যবহারের নিয়মাবলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হইল গবেষণার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করা, আর সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলির উদ্দেশ্য হইল প্রাপ্ত তথ্য হইতে ঐ বিষয়টির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু ব্যক্ত করা।

২। একটি সুষ্ঠু পরিমাপ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হইল ইহা সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হইবে। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে পরিচালিত অথচ তুলনামূলক পরিমাপের দ্বারা একই প্রকারের ফলাফল পাওয়া যাইবে। তবে এ-ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে যে, একটি পরিমাপের সময় হইতে অন্য পরিমাপের মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষ কোন কারণে পরিবর্তন হয় নাই।

৩। সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা (validity and reliability) ছাড়াও পরিমাপক এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহার দ্বারা পার্থক্যগুলি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন, পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত 'মনোভাব' জানিবার জন্য একটি সাধারণ পরিমাপ হইতে পারে– অনুকূল বা প্রতিকূল। আরো নির্দিষ্ট করিতে হইলে, অনুকূলে, কিছুই না, প্রতিকূল– এইভাবে পার্থক্য করা যায়। আরো বেশি নির্দিষ্ট করিতে হইবে, খুব অনুকূল, অনুকূল, কিছুই না, প্রতিকূল, খুব প্রতিকূল, এই কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করিয়া পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। শুধু অনুকূল ও প্রতিকূল এই দুই পার্থক্য দ্বারা মনোভাবের বিভিন্নতা বা উহার সহিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার তারতম্য নিরূপণ করা ততটা সম্ভব নহে যতটা শেষোক্ত পরিমাপ দ্বারা সম্ভব।

৪। পরিমাপক ব্যবহারে অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় যে, উত্তরদাতার নিকট হইতে যে বিষয়টি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে, পরিমাপ পদ্ধতির মাধ্যমে জানিতে চাওয়া হইতেছে, সেই ব্যক্তি বিষয়টি সম্পর্কে অত সূক্ষ্ম বা নির্দিষ্টভাবে চিন্তা ভাবনা করে কিনা এবং যথাযথ বর্ণনা দিতে পারিবে কিনা, তাই পারিমাপক নির্ধারণের পূর্বেই এ-বিষয়ে সচেতন হইতে হইবে নতুবা পরিমাপ মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। এইজন্য প্রশ্ন-পত্র ও অনুসূচির প্রাক-নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনবোধে উদ্‌ঘাটনী অনুসন্ধানের মাধ্যমে গবেষক বিচার করিয়া দেখিবেন যে, কোন্ কোন্ চলকের পরিমাপ কোন্ ব্যক্তি বা দলের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সামাজিক গবেষণায় পরিমাপ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা :

১। পরিমাপের দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা দানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এই পদ্ধতি কোন ব্যক্তি বা দল বা বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দানে সাহায্য করে। যেমন, পরিবার

পরিকল্পনা বিষয়ে শিল্প শ্রমিকদের মনোভাব কিরূপ– এই সংক্রান্ত তথ্য যদি একটি সঠিক পরিমাপকের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়, তবে তাহা দ্বারা শ্রমিকদের উক্ত বিষয়ে মনোভাব সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ শুধু মনোভাব অনুকূল বা প্রতিকূল না বলিয়া যদি উহাদের মধ্যের কতজনের মনোভাব খুব অনুকূলে, কতজনের অনুকূলে বা কতজনের প্রতিকূলে বা খুব প্রতিকূলে ইত্যাদিভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয় এবং উহার দ্বারা গবেষণার মানও উন্নত হয়।

২। গুণাত্মক তথ্য (quantitative data)-কে পরিমাপ পদ্ধতির সাহায্যে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে (quantitative) প্রকাশ করিলে উহা হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। সমাজ বিজ্ঞানীরা সাধারণত গুণাত্মক বিষয়, যেমন ব্যক্তি বা দলের আচার-আচরণ, মনোভাব, ধারণা, মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ইত্যাদি লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। কোন ব্যক্তির আয়, ব্যয়, বয়স, ইত্যাদি তথ্য পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ যেমন সহজ, গুণাত্মক বিষয়ের ক্ষেত্রে তাহা নহে। অথচ পরিসংখ্যানভিত্তিক ব্যাপক ও সঠিক পরিমাপের উপর যে-কোন গবেষণার মান ও কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে। বস্তুত গুণাত্মক বিষয় যতই আগ্রহ উদ্দীপক হউক না কেন, উহার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

৩। পরিমাপের দ্বারা গবেষণার ফলাফল সহজে বোধগম্য করা যায়, কারণ গবেষণার ফলাফল যত বেশি নির্দিষ্ট হইবে, উহা তত বেশি বোধগম্য হইবে।

৪। সঠিক পরিমাপ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের ও সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। সামাজিক গবেষণার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হইল কতগুলি নিয়ম বা নীতি আবিষ্কার যাহার দ্বারা বর্তমানে পর্যবেক্ষণকৃত বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় এবং উহার ভিত্তিতে যাহা এখনো পর্যবেক্ষণ করা হয় নাই, সে-সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। যথাযথ পরিমাপ ব্যবহারের মাধ্যমে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে সাজানো তথ্য সহজে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে।

পরিমাপকের সঠিকতা (Validity of the measurement)

পরিমাপকের সঠিকতা বলিতে বুঝায় যে, গবেষক যে-সমস্ত চলক পরিমাপ করিতে চাহেন, তাহা পরিমাপক দ্বারা যথাযথভাবে পরিমাপ করা যাইবে কিনা। অর্থাৎ পরিমাপাকের উক্ত চলকটি পরিমাপের উপযোগী কিনা। একটি পরিমাপককে ততখানিই সঠিক বলিয়া গণ্য করা হইবে, উহা দ্বারা যতখানি ব্যক্তি, দল বা কোন অবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহের পার্থক্য (যাহা এই পরিমাপক পরিমাপ করিতে চাহে) যথাযথ ও সঠিকভাবে প্রতীয়মান হইবে। এ-বিষয়ে গবেষক প্রথমেই পরিমাপক সম্পর্কে কিছু মূল

প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন, যেমন, ইহা কি পরিমাপ করিবে? ইহা দ্বারা যে-তথ্য পাওয়া যাইবে তাহা কি সেই ব্যক্তি বা দলের বৈশিষ্ট্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ? পরিমাপকের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের অন্তর্গত পার্থক্য কতখানি স্বাভাবিক ও কতখানি অন্য বিষয় বা অবস্থার প্রভাবে সূচিত হইয়াছে?

পরিমাপকের নির্ভরযোগ্যতা (Reliability of the measurement)

একটি পরিমাপক নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণ্য করা হয় তখনই যখন স্বাধীনভাবে পরিচালিত ও পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহৃত পরিমাপ হইতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল লাভ করা যায়। যদি একটি ক্ষেত্রে পরিমাপকটি প্রয়োগ করিয়া বার বার একই ফলাফল লাভ করা যায়, তবে পরিমাপকটি উক্ত ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্ভরযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। অপরপক্ষে, অন্য সমস্ত অবস্থা একই থাকা সত্ত্বেও যদি ঐ ফলাফলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, পরিমাপকটি নির্ভরযোগ্য নহে।

গবেষণায় ব্যবহারের পূর্বেই যে-পরিমাপক গবেষক ব্যবহার করিবেন তাহার নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করিয়া লওয়া আবশ্যক। এই জন্য তিনটি পদ্ধতি সাধারণত ব্যবহার করা হয়– (১) একই তথ্য-বিশ্ব বা সমগ্রকের উপর পরিমাপকটি দুই বা ততোধিকবার ব্যবহারের মাধ্যমে উহার নির্ভারযোগ্যতা যাচাই করা হয়। (২) একটি চলক পরিমাপের উদ্দেশ্যে একাধিক পরিমাপক স্কেল প্রস্তুত করিয়া একই সমগ্রকের উপর উহা প্রয়োগ করা হয়। এই পরিমাপকগুলির মধ্যের যে-দুইটির ফলাফলের মধ্যে অধিক সামঞ্জস্য থাকিবে, সেই পরিমাপকগুলি নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। (৩) তৃতীয় পদ্ধতিতে প্রথমে একটি সমগ্রকের উপর পরীক্ষামূলকভাবে পরিমাপক প্রয়োগ করা হয়। উহাদের মধ্যের সামঞ্জস্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে পরবর্তিতে পরিমাপকের বিষয়গুলি দুইভাবে ভাগ করা হয়। এই দুই ভাগের ফলাফলের মানগুলি তখন পরস্পর তুলনা করা হয়।

যদি কোন পরিমাপক কোন বিশেষ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সঠিক বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে উহার নির্ভরাযোগ্যতা লইয়া বিশেষ চিন্তার কোনো কারণ নাই। তবে কোনো পরিমাপক সঠিক সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব তখনই যখন উহা পূর্ববর্তী কোনো গবেষণায় ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহা ছাড়া, প্রতিটি পরিমাপকই উন্নত করা সম্ভব। যেমন– যে অবস্থায় পরিমাপক ব্যবহার করা হইয়াছিল, ঐ অবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে বা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোন পরিমাপকের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি সম্ভব। দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিমাপক প্রয়োগের মাধ্যমেও অবাঞ্ছিত ব্যতিক্রমগুলি কমাইয়া আনা সম্ভব।

পরিমাপকের সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতার উপর যেহেতু গবেষণার ফলাফল নির্ভরশীল, তাই অর্থবহ ফলাফল প্রাপ্তির দিকে লক্ষ রাখিয়া, গবেষণায় ব্যবহারের পূর্বে পরিমাপক স্কেলসমূহের সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের প্রতি গবেষককে যত্নবান হইতে হইবে।

পরিমাপক স্কেল (Scale of measurement)

দৈনন্দিন জীবনে আমরা সর্বদাই কোনো না কোনো জিনিস, বিষয় বা ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের কাজে নিয়োজিত থাকি। সমাজ বিজ্ঞানেও আমরা এইরূপ পার্থক্য নিরূপণ করি, যাহা গুণাত্মক। যেমন আমরা বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা, ভাষা, মূল্যবোধ ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করি। দৈনন্দিন জীবনেই হউক বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই হউক একটি নির্দিষ্টমানের ভিত্তিতে এই পার্থক্য নিরূপণ করাই বাঞ্ছনীয়। স্টিভেন্স (S. S. Stevens) সামাজিক গুণাত্মক বিষয়গুলির সুষ্ঠু পরিমাপের জন্য চারটি পরিমাপক স্কেলের বর্ণনা দিয়েছেন। এই স্কেলগুলির সাহায্যে কোনো গুণাত্মক বিষয়ের মধ্যকার পার্থক্যগুলি নির্দিষ্ট মান অনুসারে পরিমাপ ও প্রকাশ করা সম্ভব। এইগুলি হইল–

(১) নামভিত্তিক স্কেল (nominal scale);

(২) ক্রমভিত্তিক স্কেল (ordinal reale);

(৩) সমব্যবধান স্কেল (interval scale);

(৪) অনুপাতিক স্কেল (ratio scale)।

নামভিত্তিক স্কেল (Nominal Scale)

নামভিত্তিক স্কেলে দুই বা অধিক নামবাচক শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত থাকে, যাহার দ্বারা বস্তু, ব্যক্তি বা উত্তরগুলিকে শ্রেণিকরণ করা হয়। এই স্কেলের জন্য মূল প্রয়োজন হইল, যে-গুণাত্মক বিভিন্নকের পার্থক্য নিরূপণ করিতে চাওয়া হইতেছে, উহার মধ্যে দুই বা ততোধিক পার্থক্যকারী শ্রেণি খুঁজিয়া বাহির করা এবং কোন ভিত্তিতে ব্যক্তি ইত্যাদিকে উক্ত শ্রেণিতে ফেলা হইতেছে তাহা নির্দিষ্ট করা। এই স্কেলের সাহায্যে শুধুমাত্র কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের বৈশিষ্ট্যগুলিকে একটি শ্রেণি হইতে অন্য শ্রেণিতে পার্থক্য করা হয়। বৈশিষ্ট্যের এই পার্থক্যগুলি কতখানি 'বেশি' বা 'কম' তাহা পরিমাপ করা হয় না। এই স্কেলের মাধ্যমে শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, একটি ব্যক্তি বা বিষয়ের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য কোন্ কোন্ শ্রেণিতে পড়ে অথবা পড়ে না। ধর্ম, জাতীয়তা, ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে শ্রেণিবদ্ধ করা হইলে উহা নামভিত্তিক স্কেল হইবে।

নামভিত্তিক একটি স্কেলের বিভিন্ন শ্রেণির উপর এক একটি সংখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। ইহাতে ততথ্যগুলি পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সুবিধাজনক হয়। যেমন একটি স্কেলে 'কোনো ধর্ম নাই, ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ'- এভাবে নামভিত্তিক একটি স্কেল তৈরি করিয়া কোনো বিশেষ সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের উপরোক্ত ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে এক একটি শ্রেণিতে ফেলা যায়। আবার এইগুলির উপর যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫ এইভাবে সংখ্যা আরোপ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ স্কেলের কোনো ধর্ম নাই- এর বদলে সংখ্যা '১', ইসলামের বদলে সংখ্যা '২' প্রদান করা যাইতে পারে। এক একটি নামভিত্তিক শ্রেণির উপর সংখ্যা আরোপ করা হইলে, উহা বিশ্লেষণে গণনার জন্য উপযুক্ত পরিসংখ্যানের বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন, ঘটন সংখ্যা, মোড, বাই স্কেল ইত্যাদির ব্যবহার সম্ভব হয়। ফলে গুণাত্মক তথ্যকে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

নামভিত্তিক স্কেল বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নিরূপণের জন্য অত্যন্ত সহজ, সাধারণ ও বহুল ব্যবহৃত স্কেল। উদ্‌ঘাটনী অনুসন্ধানের মাধ্যমে যখন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার আবশ্যকতা দেখা দেয়, তখন নামভিত্তিক স্কেল ব্যবহার করা হয়।

ক্রমভিত্তিক স্কেল (Ordinal scale)

ক্রমভিত্তিক স্কেল ব্যক্তি বা বিষয়ের বৈশিষ্ট্যগুলির ক্রমভিত্তিক অবস্থান নির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করে, তবে অবস্থানগুলির মধ্যের দূরত্বকে নির্দেশ করে না। এই স্কেল তৈরির জন্য গবেষক নির্ধারণ করিবেন যে, পরিমাপের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বা বস্তুর পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য রহিয়াছে কি-না। ইহার অর্থ এই যে, পরিমাপকটি এমন হইবে যাহাতে একজন সুস্পষ্টভাবে বলিতে পারে যে, একটি ব্যক্তির এই বৈশিষ্ট্যগুলি অপর ব্যক্তির চাইতে বেশি বা কম। এই স্কেলের সাহায্যে কোনো একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বেশি, সমান বা কম এভাবে বলিতে পারা যায়; কিন্তু এই-প্রক্রিয়ায় কতখানি বেশি বা কতখানি কম তাহা বলা যায় না। যেমন 'খুব বেশি' বলিতে কতখানি বেশি এবং 'খুব কম' বলিতে তাহা নিরূপণ করা সম্ভব নহে। 'খুব বেশির' পরিসর 'খুব কমে'র পরিসর সমান হইতে পারে, আবার এই পরিসর বেশি বা কম হইতে পারে। নামভিত্তিক স্কেলে প্রয়োগযোগ্য প্রায় সমস্ত পরিসংখ্যান পদ্ধতিই ক্রমভিত্তিক স্কেলের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণে প্রয়োগ করা যায়। তাহা ছাড়াও মিডিয়ান, গড়, rank order বা ক্রমিক পর্যায়করণ প্রক্রিয়া, correlation ব্যবহার করা যায়।

সমব্যবধান স্কেল (Interval Scale)

সমব্যবধান স্কেলের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার সাহায্যে আমরা পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যের পার্থক্যকে শুধু মাত্র বেশি, সমান বা কম হিসাবে নহে বরং পার্থক্যের দুইটি পয়েন্টের মধ্যবর্তী দূরত্ব কতটা তাহা জানিতে পারি। এখানে স্কেলে ১ ও ২ এই দুইটি পয়েন্টের মধ্যে যতটা দূরত্ব ৩ ও ৪ পয়েন্টের মাঝেও ঠিক ততটাই দূরত্ব। থার্মোমিটার সমব্যবধান স্কেলের একটি উদাহরণ। এখানে ৯৬° হইতে ৯৭° ডিগ্রির মধ্যে পার্থক্য যতখানি ১০২° ডিগ্রি হইতে ১০৩° ডিগ্রির মধ্যে পার্থক্য ঠিক ততখানি। এই স্কেলের সাহায্যে পার্থক্যগুলির মধ্যবর্তী দূরত্ব একই হওয়ায় পরিমাপ সঠিক হয়। ইহার প্রতিটি ইউনিটই সমান পার্থক্য নির্ণয়ক।

সমাজবিজ্ঞান যে সমস্ত গুণাত্মক বিভিন্নক বা লইয়া ব্যাপৃত থাকে, এখন পর্যন্ত এমন পদ্ধতি গড়িয়া উঠে নাই যে, ঐ সমস্ত গুণাত্মক বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যবর্তী দূরত্ব সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। এই বিষয়ে বিশেষত "মনোভাব" পরিমাপের জন্য সঠিক স্কেল প্রণয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হইতে।

মধ্যবর্তী দূরত্বের সমতা নিরুপণের জন্য বহুল ব্যবহৃত কৌশল, অধিক সংখ্যক জনগণের এ-বিষয়ে রায়ের উপর গুরুত্ব প্রদান।

অনুপাত স্কেল (Ratio Scale)

এই পরিমাপক স্কেল সাধারণত পদার্থবিদ্যায় অধিক ব্যবহৃত হয়। সমাজবিজ্ঞানের অধিকাংশ বিষয়গুলি পরিমাপের জন্য অনুপাত স্কেল প্রণয়ন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই।

এই স্কেলের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহাতে একটি (absolute) সত্যিকার শূন্য থাকে। ইহার মাধ্যমে শুধু সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্য, ক্রমিক পর্যায়করণ ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয় না বরং অনুপাত নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে 'ক' 'খ' এর দুইগুণ বড় ইত্যাদিভাবে বক্তব্য পেশা করা যায়। সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে এ-রূপ সুনির্দিষ্ট ও আনুপাতিকভাবে প্রকাশ করা দুরূহ। তবে কিছু কিছু সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যের ক্ষেত্রে, যেমন– বয়স, এ-পদ্ধতির সীমিত ব্যবহার সম্ভব।

সপ্তদশ অধ্যায়

সামাজিক গবেষণায় গ্রন্থাগারের ব্যবহার

USE OF LIBRARY IN SOCIAL RESARCH

সামাজিক গবেষণায় গ্রন্থাগারের ব্যবহার অপরিহার্য। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির সাহায্য গবেষক গ্রহণ করেন। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বাস্তব ক্ষেত্র অথবা পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, যে-স্থান হইতে সংগ্রহ করা হউক না কেন-সর্ব ক্ষেত্রেই গবেষককে গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে হয়। নিম্নোক্ত কারণে সামাজিক গবেষণায় গ্রন্থাগারের ব্যবহার আবশ্যক –

১। গবেষণার বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য। গবেষণার বিষয় সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা ব্যতীত ফলপ্রসূ গবেষণা সম্ভব নহে। এই ধারণা লাভের জন্য গবেষককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনা করিতে হয়।

২। পুনরাবৃত্তি এড়াইবার জন্য গবেষক যে-বিষয়ে গবেষণা করিতে আগ্রহী, সেই বিষয়ে অন্য কোনো গবেষণা ইতোপূর্বে করা হইয়াছে কিনা তাহা জানিতে হইবে। এই সমস্ত গবেষণায় উক্ত বিষয় কোন উদ্দেশ্য, কোন দৃষ্টিকোণ হইতে এবং কোন গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসন্ধান (study) করা হইয়াছে তাহাও জানা আবশ্যক। ইহা গবেষককে গবেষণার বিষয় নির্ধারণে সহায়তা করে এবং অনাবশ্যক পুনরাবৃত্তি হইতে রক্ষা করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, গবেষক পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির উপর একটি গবেষণা কার্য পরিচালনায় আগ্রহী হন, তাহা হইলে প্রথমেই তাহাকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে কি কি গবেষণা হইয়াছে তাহাও জানিতে হইবে। ইহার দ্বারা পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা কমিয়া যাইবে এবং তিনি প্রয়োজনীয় নূতন কোনো দিক হইতে বিষয়টি অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হইবেন।

৩। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয় বা শব্দ (concept) গুলির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য গ্রন্থাগারের আবশ্যক।

৪। গ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করিবার জন্যও গ্রন্থাগার ব্যবহার প্রয়োজন।

শুধুমাত্র বাস্তব ক্ষেত্র হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াই তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা করা যায় তাহা নহে, গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তক, পত্র-পত্রিকা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াও মূল্যবান গবেষণা সম্ভব। গ্রন্থাগারে সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক,

রাজনৈতিক, সামাজিক পরিসংখ্যান রক্ষিত হয়। এ-সমস্ত পরিসংখ্যান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফলপ্রসূ গবেষণা করা যায়। ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য তথ্য মূলত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, পুরাতন দলিলপত্র হইতে সংগ্রহ করা হয়। ঐতিহাসিক গবেষণা (historical research) ছাড়াও "বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ" (content analysis) পদ্ধতির গবেষণা এবং বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলের "সংযোগ-সাধনের" (systhesis) নিমিত্তে পরিচালিত গবেষণার গ্রন্থাগারের ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

গ্রন্থাগার গবেষণার (Library research) জন্য গবেষককে গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি বিন্যাস-পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে। গ্রন্থাগারগুলিকে সাধারণত একই রীতি ও পদ্ধতিতে গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, নির্দেশক গ্রন্থ, গ্রন্থপঞ্জি সংক্রান্ত পুস্তকাদি বিন্যস্ত করা হয়। গ্রন্থগার গবেষণার জন্য গ্রন্থগার ব্যবহারে তাই প্রায় একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। পুস্তকের শ্রেণিকরণ, কার্ড-ক্যাটালগ ইত্যাদি ব্যাপারে একই রীতি অনুসৃত হইলেও পুস্তকাদি রাখিবার স্থান বা পুস্তকের সংখ্যার দিক দিয়া এক গ্রন্থাগার হইতে অন্যটি ভিন্ন হইতে পারে।

পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি হইতে গবেষণার তথ্য সংগ্রহে গবেষক কিভাবে অগ্রসর হইবেন? গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

কার্ড ক্যাটলগ (Card Catalogue)

গ্রন্থাগার ব্যবহারের সর্বপ্রথম পর্যায় হইল কার্ড ক্যাটালগ সম্পর্কে ধারণা অর্জন। ইহা গ্রন্থাগারে সংগৃহীত সমস্ত পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, রেফারেন্স গ্রন্থ ইত্যাদি সূচি (index) বিশেষ। প্রতিটি পুস্তকের জন্য পৃথক পৃথক কার্ড প্রস্তুত করা হয়। গ্রন্থের নাম, বিষয়, লেখকের নাম– এই তিন প্রকারে কার্ড প্রস্তুত করা ও বিন্যস্ত করা হয়। গবেষকের জন্য বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কার্ডই (subject card) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তু সম্বন্ধীয় কার্ড দেখিয়াই গবেষক তাঁহার গবেষণার বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলি খুঁজিয়া পাইতে পারেন। এই কার্ড হইতেই বিষয়টি কোন কোন লেখক কি কি শিরোনামের (title) পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন তাহাও জানিতে পারেন।

কার্ড ক্যাটালগ ডিকশনারীর অনুরূপ অক্ষরানুক্রমিক (alphabetically)-ভাবে বিন্যস্ত করা হয়। পুস্তকের শিরোনাম, লেখকের নাম ও বিষয়ের অদ্যাক্ষর দিয়াই অক্ষরানুক্রম (alphabetical order) সংগঠন করা হয়। ফলে একই বিষয়ের বা একই লেখকের নামানুসারে প্রস্তুত কার্ডে সাধারণত লেখকের শেষ নাম (sur-name) অগ্রে দেওয়া হয়। যেমন, যদি লেখকের নাম হয় পলিন ভি. ইয়াং, তবে কার্ড ক্যাটালগে লিখা হইবে ইয়ং, পলিন ভি। পুস্তকের সঠিক শিরোনাম বা লেখকের সম্পূর্ণ নাম জানা না থাকিলেও বিষয়বস্তু কার্ড দেখিয়া উহা বাহির করা সম্ভব।

এক বিষয়ের পুস্তক সাধারণত এক শিরোনামেই তালিকাভুক্ত করা হয়। যেমন সমাজকল্যাণের সমস্ত পুস্তকাদি "সমাজকল্যাণ" এই শিরোনামের কার্ডে অন্তর্ভুক্ত হইবে। যখন একই বিষয়ে অনেক পুস্তক থাকে তখন বিষয়বস্তুর বিশেষত্ব ও পার্থক্যের ভিত্তিতে উপ-বিভাগ করা হয়। যেমন, সমাজকল্যাণের পুস্তকগুলিকে সমাজকর্ম ও প্রতিষ্ঠান, বিশেষ দলের জন্য সেবা, ইত্যাদি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা হয়। গ্রন্থাগারে পুস্তকের এই শ্রেণিবদ্ধকরণ নানা পদ্ধতিতে করা হইলে Dewey Decimal (১৯৫৮) পদ্ধতি সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সহজবোধগম্যও বটে। এক বিষয়ে পুস্তকাদি গ্রন্থাগারে সুনির্দিষ্ট স্থানে রাখিবার সুবিধার্থেই শ্রেণিকরণ করা হয়। Dewey decimal শ্রেণিকরণ পদ্ধতিতে প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর দেওয়া হয়। নিম্নে এই পদ্ধতিতে শ্রেণিকরণের উদাহরণ দেওয়া হইল :

প্রধান শ্রেণি বিন্যাস	প্রধান শ্রেণি বিন্যাসের বিভাগ	
000 General Works	300	Social Science
100 Philosophy	301	Sociology
200 Religion	310	Statistics
300 Social Sciences	320	Political Science
400 Language	330	Economics
500 Pure Science	340	Law
600 Technology	350	Public Administration
700 The Art	360	Social Welfare/ work
800 Literature	370	Education
900 History	380	Public Servics and Utilities
	390	Custom & Folklore

শ্রেণি বিন্যাসের উপ-বিভাগ

360	Social Welfare
361	Social work and Agencies
362	Services to special Group
363	Political Societies
364	Criminology and Corrections
305	Penology
366	Associations
367	Social Clubs
368	Insurance
369	Other Association

কার্ড ক্যাটালগের উপরে বাম কোনে দুটি নম্বর থাকে। একটি পুস্তকের শ্রেণি নির্দেশ করে – ইহা Dewey Decimal পদ্ধতির নির্দিষ্টকৃত নম্বর, ইহাকে call number" বলে। দ্বিতীয়টি 'Cutter number' ইহা পুস্তকের লেখক অথবা শিরোনাম নির্দেশ করে। লেখকের নামের আদ্যাক্ষর এবং নামের অন্যান্য অক্ষরের সংকেত নম্বর 'Cutter number'-এর থাকে। এই নম্বর দুইটি গ্রন্থাগারের পুস্তকের উপরও দেওয়া হয় বলিয়া এই নম্বর অনুসরণ করিয়া সহজেই পুস্তক খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব হয়।

পত্রিকা নির্দেশিকা (Guide to Periodical literature)

বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার ফলাফল, পুস্তক সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদনসমূহ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গবেষকের পক্ষে সমস্ত পত্রিকার মধ্য হইতে তাহার আবশ্যকীয় বিষয়গুলি বাহির করা দুরূহ ব্যাপার। তাই পত্রিকা নির্দেশিকা প্রকাশ করিয়া এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

গ্রন্থ নির্দেশিকা (General bibliography)

একটা গ্রন্থাগারের সংগৃহীত সমস্ত পুস্তকই কার্ড ক্যাটালগে তালিকাবদ্ধ থাকে। গবেষণার প্রয়োজনে কয়েকটি গ্রন্থাগারের বই-পত্র দেখিবার প্রয়োজন হইতে পারে। সে-ক্ষেত্রে গ্রন্থ নির্দেশিকার সহায়তা লওয়া হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

থিসিস গবেষণা নিবন্ধে ব্যবহৃত

সংক্ষেপ	অর্থ এবং উদাহরণ	
anon.	“anonymous”	অজ্ঞাত (লেখকের নাম অজ্ঞাত থাকলে সে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।)
Art.	``Article”	নিবন্ধ (যথা, নিবন্ধ ৪)
aug.	``augmented'';	বর্ধিত
BK	``Book''	বই (যথা, বই ৩)
[ ]		“বন্ধনী” (উদ্ধৃতির মধ্যে শব্দের অন্তর্ভুক্তি হলে শব্দের দুই পার্শ্ব ব্যবহৃত হয়।)
bull.	``bulletin''	সংবাদলিপি/বিবরণপত্র/বুলেটিন।
c.	``copyright''	গ্রন্থস্বত্ব (যখন প্রকাশের তারিখ দেয়া থাকে না বা অজ্ঞাত থাকে তখন নির্দেশনার জন্য ব্যবহৃত হয়।)
c.or ca	``circa''	প্রায়, (তারিখের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।)
cf.	``confer''	তুলনা
chap (s)	``chapter (s)''	অধ্যায়। যেমন, অধ্যায় ১
e.g.	``exempli gratia'';	উদাহরণস্বরূপ
enl.	``enlarged''	পরিবর্ধিত

et al.	``et alil'';	প্রমুখ এবং অন্যান্য, (তিন বা অধিক সংখ্যক লেখক থাকলে ব্যবহৃত হয়। যেমন-চক্রবর্তী ও অন্যান্য বা চক্রবতী প্রমুখ।)
et alibi	"এবং অন্যত্র"	
et seq.	"et sequens"	এবং নিম্নলিখিত
f., ff.	the page, pages following	"পৃষ্ঠা, পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ"(যেমন পৃঃ ৪f, পৃষ্ঠা এবং পরবর্তী পৃষ্ঠা, ৪ পৃঃ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ বিষয়টির শেষ পর্যন্ত।)
Fig (s).	``Figure (s)''	চিত্র (যেমন, চিত্র ৩)
ibid.	``ibidrm''	ঐ, (একই স্থানে বা বিষয়ে একই বিষয় থেকে দুই বা ততোধিক পাদটীকা উল্লেখ করতে হলে ব্যবহৃত হয়।)
i.e.	id est	অর্থাৎ
infra	``below'',	নিচে (পরবর্তী পাঠ্য বিষয়ের উল্লেখ থাকলে ব্যবহৃত হয়।)
I,I,I,	``line, lines''	লাইন (যেমন, ১-১০;১১,১০-১২)
loc.cit	loco cito,	প্রাগুক্ত
Ms., Mss.	``manuscript, manuscripts'',	পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলিপিগুলো
n.,nn.		"টীকা বা পাদটীকা"
N.B.	``note bene''.	বিঃ দ্রঃ, ভাল করে লক্ষ করুন।
n.d.		"প্রকাশের তারিখ দেওয়া নেই"
No (s)	``number'' (s),	সংখ্যা (যেমন, সংখ্যা-৪ সংখ্যা ৩-৫)
col (s)	``column (s)''	কলাম বা স্তম্ভ (যথা, কলাম ১-৩ দেখুন)
Ed (s)	``editor (s) or edited''	সম্পাদক অথবা সম্পাদিত (যথা, তপন চক্রবর্তী সম্পাদক); সংস্করণ (যথা, ৩য় সংস্করণ)

n.p.		"প্রকাশের স্থান উল্লেখ নেই"
op. cit.	open cito.	প্রগুক্ত ভিন্ন পৃষ্ঠাঙ্ক
p.,pp		"পৃষ্ঠা", পৃ (যেমন, পৃ ৪০, পৃ ৭১-৭৪)
par (s).	paragraph	"অনুচ্ছেদ" অনুঃ (যেমন, অনুঃ ৪; অনুঃ ৪-৬
Passim	``here and there''	"বিক্ষিপ্ত" (মতামত, মনোভাব ইত্যাদি বিভিন্ন পৃষ্ঠায় থাকলে সাধারণত এটি ব্যবহৃত হয়।)
pt (s)	``part (s)''	অংশ (যেমন, pt.3,pts. 1 and 2)।
rev.	`revised or revision',	সংশোধিত বা সংশোধন।
sec (s).	``sections(s)''	সেকশন বা অংশ (যথা, সেকশন ৪; সেকশন ৬-৮)
[sic]	``thus''	এইরূপ, (মূল বিষয়ে বানান, ব্যাকরণ বা বিষয়বস্তুর মধ্যে ভুল থাকলে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লিখিত হয়)
supra	`above''	উপরে (পাঠ্য বিষয়ের দিকে নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়।)
trans,		"অনুবাদক, অনুবাদিত, অনুবাদ"
vid of vide		"দেখুন"
v.,vv.	``verse, verses''	
viz.	``videlicet''	যেমন
vol (s).	``volume (s)'',	খন্ড (যেমন, খণ্ড ১, খণ্ড ২-৪)

পরিশিষ্ট-১

প্রুফ দেখার নিয়ম ও পদ্ধতি

সংশোধনী-চিহ্নের ব্যবহার	সংশোধনী চিহ্ন
মোটা হরফ ব্যবহার করুন	bold
ভাঙা হরফ বদল করুন	×
Italics শব্দটি বক্রলেখ-এ মুদ্রণ করুন	Ital
Roman শব্দটি সোজা হরফে মুদ্রণ করুন	rom.
উল্টো বসান হরফ সোজা ধরে বসান	9
ভিন্ন ধাঁচের হরফ, বদল করুন	*w.f.*
শব্দগুলির/ মধ্যে/সমান/ব্যবধান রাখুন	*/eq#*
শব্দ দু'টির মধ্যে ফাঁক রাখুন ∧	/ #
শব্দ দু'টির/মধ্যে ব্যবধান কম করুন	/Less#
চিহ্নিত স্থানে ∧ সন্নিবেশ করুন	শব্দগুলি
বাক্যটিতে কমা ∧ সেমিকোলন প্রভৃতি যোগ করুন ∧	, ;
বাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ বসান ∧	।
Insert full stop here ∧	/ .
চিহ্নিত স্থানে ড্যাশ যোগ করুন ∧	/—/
বাকাংশের শেষে উহ্য চিহ্ন যোগ করুন ∧	..../
গবেষণা ∧ পত্র শব্দ দুটির মধ্যে হাইফেন যোগ করুন।	।- ।/

শব্দটি প্রথম বন্ধনীবদ্ধ করুন	(/)/
উদ্ধার চিহ্ন যোগ করুন	“ ”
শব্দটি উর্দ্ধকমাবদ্ধ করুন	‘ ’
হরফের নিচে হস্ চিহ্ন	ˎ
[অনুচ্ছেদ ছাড় দিন	/❑❑
অনুচ্ছেদ এখানে শেষ।	
নতুন অনুচ্ছেদ	n.p
আরম্ভ করুন	
অনুচ্ছেদ শেষ হয়নি।	
পূর্ব অনুচ্ছেদের সঙ্গে যোগ করুন	run on
বাক্য লোপ শব্দ দুটি যুক্ত করে একটি শব্দ করুন	
∧ প্রথম বন্ধনী ∧ বাতিল করুন	*d/ d/*
হরফ বা শব্দ বাতিল করে ফাঁক বুজিয়ে দিন	*d*
হরফ বাতিল না করে যেমন ছিল রেখে দিন	Stet
শব্দটি আন্ডারলাইন করুন	under line
শব্দ বা লাইন বাদ গেছে; কপি দেখুন	out-sec copy
বইটির ৫ম সংস্করণ প্রকাশিত হলো	/spell out
রেখাবদ্ধ শব্দগুলি স্থান করে পরিবর্তন বসান	trs

তথ্যসূত্র
REFERENCE

Aaronson, S. 1977. Style in scientific writing. Current Contents, No. 2, 10 January: p. 6-15.

American Natural Standards Institute. Inc. 1969. American national standard for the abbreviation of titles of periodicals. ANSI Z 39. 5-1969. American National Standards Institute. Inc. New York.

American National Standards Institute. Inc. 1971. American national standard for writing absteracts. ANSI Z 39. 14-1971. American National Standards Instituds. In. New York.

merican National Standards Institute. Inc. 1971. American national standard for the preparation of scientific papers for written or oral presentation. ANSI Z 39. 16-1972. Amearican National Standards Institute. Inc. New York.

merican National Standards Institute. Inc. 1971. American national standard for synoptics. ANSI Z 39. 34-1977. Amarican National Standards Instiute. Inc. New York.

Anderson, J. A. and Thistle, M.W. 1974. On writing scientific papers. Bull. Can. J. Res. 31 December 1947, N. R. C. No. 1691.

Basseley, 1979. Is the British Phd system obsolete?" Bulletin of the British Psychology Society. 32. 129-131.

Bernstein, T. M. 1965. The careful writer. A modern guide of English usage. Atheneum. New York.

Booth, V. 1978. Writing a scientific paper, 4th ed. The Biochemical Society. London.

Bruch, G. E. 1954. Of publishing scientific paper, Grune & Stratton, New York.

Bruch, J. 1972. The relevance of education. London, Allen and Unwin.

Be Bono, E, 1973. Children sovle problems. London Penguin Education.

Council of Biology Editors, 1968. Proposed definition of a primary publication. News letter. Council of Biology Editors, November 1962. p. 1-2.

Cohen, D. 1977. Psychologists of phychlogy. London Routledge and Kegan Paul.

CVCp (Committee of Vice Chancellors and Principals). (1958; revised edn. 1986). Code of practice on post-graduate training & Research.

Day, R. A. 1973. Economics of printing, p. 45-56. In R. A. Day et al. (ed), Economics of scientific publications. Council of Biology Editors. Washinton, D.C.

Day, R.A. 1975. How To write a scientific paper. ASM News 41: 486-494.

Day, R.A. 1976. The Scientific journal : an edangered species. ASM News 42: 288-291.

De Bakey, L. 1976. The scieblific journal. Editorial policies and practices. Guidelines for editors, reviewers, and authors. The C. V. Mosby Co. St. Louis.

Dickson, A. 1982. A woman in your own right; Assertivess and you. London, Quarter.

Francis, J. R. D. 1976. 'Supervision and examination of higher degree students.' Bulletin of the University of London, 31, 3-6.

Garfield, E. 1977. Essays of an information scientist, 2 vol. ISI Press, Philadelphia.

Houghton, B. 1975. Scientific periodicals; their historical developement, characteristics and control Linner Books, Hamden, Conn.

Halstead, B. 1987. "The Phd system, Bulletin of the British Psychological Society, 40, 99-100.

Hudson, L. 1960. 'Hegree class and attinment in scientific research. British Journal of Psychology, 51. 67-73.

Hudson, L. 1977a. `Picking winners: a case study study in the recruitment of research students. New University Quarterly, winter, 32, 1, 88-107.

Hudson, L. 1977b. Interview in Cohen (1977) op. cit.

Kuhn, T. S. 1970. The structure of scientific revolutions, Chicago, University of Chicago press.

Levey, P.S. 1982. `Surving I a predominately white male institution, In Vartuli, S. (Ed) The Phd Experience; A Women's Point of View New York Praeger.

Lowenthal, D. and Vason, P. C. 1977. Academic and Their writing Times Literary Supplement, 24 June, 781. Reprinted in Leonardo (1980), 14-57.

McGirr, C. J. 1978. Cuidelines for abstracting. Teach. Commun, 25 (2): 2-5.

Meyer, R. E. 1977. Reports full of "gobbledygook." J. Irreproducible Res. 22(4): 12.

Mitchell, nJ. H. 1968. Writing for professional and technical journals. John Wiley & Sons. Inc. New York.

Medawar, P. B. 1964. Is the scientific paper a fraud? In Edge. D. (Ed.) Experiment. London. BBC Publications.

Miller, G. W. 1970. Success, failure and wastage in higher education. London Universitly of London, Institute of Education/Harrap.

O'Connor, M, and Woodform F. P. 1975. Writing scientific papers in English. Associated Scientific publishers. Amsterdam.

Olson, D. 1975. The languages of experience: On natural language and formal education. Bulletin of the British Psychological society, 28, 363-373.

Peterson, M. S. 1961. Scientific thinking and scientific writing. Reinhold publishing Corp. New York.

Pllock. G. 1977. Handbook for ASM editors. American Society for Microbiology. Washington D. C.

paul, N. 1983. The right to by you. Bromley Chartwell- Bratt.

Phillips, E. M. 1979. The Phd: Learning to do research. Bulletin of the British Psychological society. 32. 413-414.

Phillips, E. M. 1980. Education for research: The changing constructs of the post-graduate, International Journal of Man-Machine Studies, 13. 1, 39-48. Reprinted in Shaw, M. L. G. (Ed.) Recent Aduances in Personal Construct Technology (1981). London Academic Press.

Phillip, E. M. 1984. `Learning to do research. `Graduate Management Research, 2, 1 (Autumn), Cranfield School of Management.

Phillips, E. M. 1987. `What research students expect of their superivsors.' Hypothesis, 15, 5-10, University of Bradford Management Centre.

Proper, K. 1972 [Reid, W. M. 1978.] Will the furture generations of biologists write a disseration? BioScience 28;651-654.

Rosten, L. 1968. The joys of Yiddish. McGraw-Hill Book Co. New York.

Siegenthaler, W. and Luthy R. (ed). 1978. currenty chemotherpay. Proceedings of the 10th Interational Congress of Chemotherpay. American Society for Microbiology, Washington, D. C. 2 Vol.

Snow, C, P. 1986. The Search . (Newed.) London, Macmillan.

Synder, B. 1967. "Creative " students in science and engineering setting. Paper presented at the British Psychological Society Conference, City University, London.

Skillin, M. E. and R. M. Gay. et. al. 1974. Worlds into type, 3rd ed. Prentics-Hall, Inc. Englewood Cliffs. N. J.

Trelease, S. F. 1958. How to write scientifc and technical. The Wilkings Co. Baltimare.

Vartuli, S. (Ed.), 1986. Thje PhD experience; A woman's point of view. New York, Prager.

Woodford, F. P. (ed.), 1986. Scientific to eliminate hypothesis students. A Council of Biology-Manual. The Rockefeller University Press, New York.

Wason, P. C. 1960. 'On the failure to eliminate hypothesises in a conceptual task. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 12, 129-40.

Wason, P. C. 1968. 'Reasoning about a rule. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 20, 273-81.

Wason, P. C. 1974. 'Notes on the supervision of PhDs. Bulletin of British Pshchological Society, 27, 25-29.

Waston, J. D. 1968. The Double Helix. London, Weidenfled & Nicolson.

Whitehand, J. W. R. 1966. The selection of research students. Universites Quarterly, December, 21, 1, 44-48.

Zinsser, W. 1976. On Writing well. An informal guide to writing nonfiction. Harper & Row, Publication New York.

Anderson, J., Durston. B.H. and Poole, MI, Thesis and Assignment Writing, New Delhi: Willey Eastern Limited, 1977, 135 pp.

Best, John W, Research in Education, New Delhi: Prentice Hall, Inc., 1977, 403pp.

Campbell, W.G. Form and Style in Thesis Writing, Boston: Houghton Mifflinco., 1954, 114pp.

Patel A.S. and Lulla, B.P., A Handbook of Thesis Writing, Baroda: Acharya Book Depot, 1968, 92pp.

Sidhu, K.S., Methodology of Research in Education, New Delhi" Sterling Publishers Private Limited, 1985, 308 pp.

Travers, Robert M. W., An Introduction to Educational Research, New York: Macmillan Co., 1963, 466pp.

Turabian, Kate L., A Manual of Writers, Chicago: The University of Chicago Press, 1961, 110pp.

Wilkinson, T.S. and Bhandarkar, P.L., Methodology and Techniques of Social Research, Bombay: Himalaya Publishing House, 1986, 447pp.

Ac- ২৬৯৫০

Library
Gono Bishwabidyalay Library
Nolam, Savar, Dhaka-1344.

“

বর্তমান বিশ্বে, এমনকি আমাদের সমাজেও গবেষণা একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। ‘গবেষণা’ এর আর একটি বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ‘অনুসন্ধান’ কে গ্রহণ করা যায়। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Investigation। ইংরেজিতে গবেষণাকে research, investigation বা study বলা হয়। তবে বাংলায় অনুসন্ধানের চেয়ে গবেষণা শব্দটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা গবেষণা শব্দটি অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, গবেষণা বলতে কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেই বুঝায় না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অন্যান্য ধরনের গবেষণার মধ্যে অবশ্যই সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন, আমরা জানি বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা এক রকম নয়। আবার জীব বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণার রয়েছে প্রচুর পার্থক্য। এছাড়া সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা এবং আচরণ বিজ্ঞানের গবেষণার মধ্যেও রয়েছে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য। তবে, এসব পার্থক্য মূলত গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের ধরন ও বৈচিত্রের উপর নির্ভরশীল। এভাবে দেখা যায় যে, গবেষণা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। বিষয় ও কলাকৌশলের পার্থক্যের জন্য এদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। ”

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির... বাহন

978-984-9211-7-7